৪

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

৪র্থ খন্ড

pdf By Syed Mostafa Sakib

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

চতুর্থ খণ্ড

(অদৃশ্য বিজ্ঞান)

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বি. এস-সি, বি. সি. এস,
(Engg-Telecom), এ. বি. কে. (টোকিও), এ. ও. টি. এস. (জাপান)
প্রেসিডেন্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত, বিজ্ঞান না কোরআন, পৃথিবী নয় সূর্য
ঘোরে, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ সিরিজ (১ম-৪র্থ খণ্ড), জগদ্গুরু
মুহাম্মদ (দঃ), রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ্, সর্ব ধর্মে
বেহেশ্ত দোজখ, মানব জাতির মুক্তির পথ
প্রভৃতি আলোড়নকারী গ্রন্থ প্রণেতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মম প্রকাশ

তৃতীয় মুদ্রণ : ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০০৪
প্রকাশ কাল : ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ রফিক উল্যাহ

মম প্রকাশ ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে এ. জেড. এম. তৌহিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। অক্ষরবিন্যাস জীবন কম্পিউটার, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ১৫০ টাকা

ISBN : 984-8418-35-0

pdf By Syed Mostafa Sakib

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়, কামেল ওলি,
আমার নানাজী হযরত মওলানা
ছমির উদ্দিন সাহেবের পবিত্র নামে

সূচিপত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্ব সৃষ্টির মূলে	৯
বাইবেল	১২
বেদ	১৩
কোরআন	১৫
বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা	২০
অদৃশ্য ভুবনের রহস্যময় তত্ত্ব	২৫
সৃষ্টির প্রারম্ভ	২৬
রসুলের বাণী-'আল্লাহ্ ছিলেন অন্য কোন কিছু	
ছিল না তিনি লিখিলেন সবকিছু সুরক্ষিত গ্রন্থে'	
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি	
কোরআন / বাইবেল	
মানব সৃষ্টির রহস্য	৩৬
আদম (আঃ)/ ইব্রাহিম (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের	
সৃষ্টি, মানব সৃষ্টির উপাদান, মাটির গুণাগুণ	
কোরআন / বাইবেল (মানব জাতির পাপে পতন) আদি পুস্তক	৪৬
জন্ম ও মৃত্যু রহস্য	৪৯
হাদিস	
TEST TUBE-এ শিশু জন্মের কাহিনী	
FIRST TEST TUBE BABY BORN	
মানব জন্ম প্রক্রিয়া- কোরআন / বাইবেল	
মৃত্যুর রূপ	৬০
মৃত্যু সৃষ্টি রহস্য	৬১
মৃত্যুকালীন অবস্থা	৬২
মৃত্যু যন্ত্রণা কি সবার সমান?	৬৬
হাদিস, কোরআন ও বাইবেলের মতে	
কবরের মাঝে	৬৯
হাদিস/বাইবেল কবরে বিভিন্ন ঘটনা	
পাপী ও পুণ্যবানদের অবস্থা	
মানুষ কি সত্যি মরে যায়?	৭৮
পার্থিব জড়দেহের মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু নেই	
কোরআন-হাদিস-বাইবেল ও শ্রীমদ্ভগবতগীতার উদ্ধৃতি	
মৃত ব্যক্তি দেখতে ও শুনতে পায়	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত ব্যক্তির বিলাপ	৮২
কবরে মৃত ব্যক্তি কথা বলে	৮৫
মৃত ব্যক্তির স্বহস্তে তার কর্মলিপি লেখা	৮৬
মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে রসুলুল্লাহর (দঃ) কথা	৮৭
কবরে লেখাপড়া	৯০
মুমেন ও শহিদদের দেহ পচে না	৯২
১৫ বছর পরেও কবরে লাশ অবিকৃত।	৯৪
একটি চমকপ্রদ ঘটনা। চোদ্দশ-বছরের লাশ অবিকৃত	৯৫
ইসলামের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	৯৬
আত্মার শান্তি ও অশান্তি	১০০
পাপীদের আত্মা কিভাবে নিস্তার পায়	১০১
শহিদরা মরে না, কবরে খাদ্য পায়	১০৪
উত্থান দিবস	১০৬
পুনরুত্থানের একটি বাস্তব ঘটনা	১০৯
কি অবস্থায় মানুষ উত্থিত হবে?	১১৩
কে সর্বপ্রথম উত্থিত হবে?	১১৪
উত্থান দিবসের অবস্থা ঃ কোরআন / বাইবেল	১১৫
বিচার দিবস	১২০
কোরআনের মতে	১২০
বাইবেলের মতে	১২৪
বিচার দিবসে নবীদের প্রার্থনা	
হযরত ইব্রাহিম (আঃ)	
হযরত আদম (আঃ)	১২৮
হযরত মুসা (আঃ)	
হযরত ঈসা (আঃ)	১২৯
বাইবেলের মতে (ইঞ্জিল)	১৩০
বিচার দিনে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)	১৩৫
হযরতের মোজেজা	১৪৩
(এক হতে চল্লিশ)	
পরিশিষ্ট	১৫৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচনা

'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'-পুস্তকের চতুর্থ খণ্ড লিখতে হাত বাড়ালাম। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের বিষয়বস্তু হতে এ খণ্ডের বিষয়বস্তু হবে স্বতন্ত্র, গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সম্পূর্ণ বইটিতে আলোচিত হবে 'অদৃশ্য বিজ্ঞান'। ১ম হতে ৩য় খণ্ডে অতি সামান্য জ্ঞানের পরিসরে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি- সমাজবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ডে), 'যৌনবিজ্ঞান' (২য় খণ্ডে), আকাশবিজ্ঞান, মেরাজ, পদার্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞান (৩য় খণ্ডে)। পাঠকবৃন্দ এতে কতটুকু আনন্দ পেয়েছেন জানি না। তবুও দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণী, ওলি-গাউস, কবি-সাহিত্যিক ও উদারপ্রাণ ভাইবোনদের প্রেরণা ও উপহারবাণী আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, উৎসাহিত করেছে ও ধন্য করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন চরিত্র আলোচনা করা, স্বজাতি-বিজাতি, জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের সম্মুখে তাঁর অমর ও অক্ষয় বাণী যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলবে- তা ব্যক্ত করার মত ভাষা ও জ্ঞান আমার নেই। তবু চেষ্টা করেছি সামান্য কিছু আলোচনা করতে। তাঁর মহাবাণী পার্থিব জীবনে বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই করে আমরা সত্য বলে প্রমাণ করেছি। কথা নষ্ট হয় না, কার্যবিধি রেকর্ড হচ্ছে, দূর-দূরান্তের ছবি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে এগুলো আজ আর পুরাতন নয় নতুন। রসুল (দঃ) যা বলেছেন তা সত্য বলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছি। পদার্থে নিহিত শক্তি, জড় দেহে প্রাণ, সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাগুণের সমানুপাতিক হার যা তিনি তাঁর মহাবাণীর মধ্যে ব্যক্ত করে আমাদের গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছেন তার তুলনা নেই। একজন মানুষের পক্ষে সমস্ত সৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা মোটেই সম্ভব নয়। তবুও আমরা একমাত্র তাঁরই জীবনে এ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে দেখলাম। আগুন, বাতাস, পানি ও মাটির সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণেই তাঁর হৃদয়-মন হয়েছিল আলোকিত, উদ্ভাসিত জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। তিনি নিজেও একথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর পবিত্র বাণীতেঃ "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে এর সব তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম।" এ গুরুত্বপূর্ণ বাণী শুধু পার্থিব জগতের জন্যই নয়, অপার্থিব জগতের জন্যও প্রযোজ্য। চতুর্থ খণ্ডে এ অপার্থিব জগতের রহস্যই কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করব। প্রত্যেকটা মানুষের মনে সে বিশ্বাসী হোক অথবা অবিশ্বাসী হোক কতকগুলো প্রশ্ন জাগে, যার সমাধান কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন- এ মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছে? তাঁর অবস্থান কোথায়? এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা কি ছিল? কিভাবে সৃষ্টি শুরু হয়েছে? মানব সৃষ্টির রহস্য কি? মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হয়? ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বেদ-বাইবেল-কোরআন-জিন্দাবেস্তা-ত্রিপিটক প্রভৃতিতে ডুব দিয়ে কুড়িয়ে আনতে চেষ্টা করেছি এসব প্রশ্নের সমাধান। অবশেষে সাহায্য নিয়েছি আমারই প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট। তিনি আমাকে পথ দেখালেন এই বলে ঃ

"আল্লাহ্ ছিলেন এবং অন্য কোন কিছু ছিল না তিনি ভিন্ন। তাঁহার আরশ ছিল পানির উপরে এবং তিনি লিখিলেন সবকিছু সুরক্ষিত গ্রন্থে এবং সৃষ্টি করিলেন আসমান ও জমিন।"

"যখন আল্লাহ্ সমাপ্ত করিলেন সৃষ্টি নিজ নিজ গ্রন্থে যাহা রহিয়াছে তাহারই নিকটে আরশের উপরে লিখিলেন, আমার দয়া বলবৎ হইল আমার ক্রোধের উপর।"

যে দ্বন্দ্ব বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে চিরকাল ধরে চলে আসছে তার অবসান ঘটালো এ বাণী। অবিশ্বাসীদের ধারণা এ বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা নেই এমনিতেই চলে আসছে। কোন সৃষ্টিকর্তা এর পিছনে কাজ করে নি। বিশ্বাসীদের ধারণা ঠিক এর উল্টো। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। পরিকল্পনা ছাড়া আরম্ভ ও শেষ হয় না। আরম্ভ প্রকল্প থাকতেই হবে।

'আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপরে'- এ তাৎপর্য ও মহামূল্যবান বাণীটি আমাকে যেমন অবাক করে দিল- চিন্তাশীল মনীষী, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কেও বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করল। স্রষ্টা আছেন। তাঁর অবস্থিতি আছে সৃষ্টির পূর্বেও ছিল। তাঁর এ অবস্থিতির আসন ছিল পানির উপরে। তাহলে দেখা যায় যখন সৃষ্টিই হয় নি- কোন পরিকল্পনাও ছিল না তখন একটি পদার্থ বিদ্যমান ছিল- সেটা **'পানি বা জল'**। হযরত আমাদের শেখালেন- 'আল্লাহ্ পানি হতেই সৃষ্টি করলেন শুরু। ৩য় খণ্ডে রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদ-এর ওপর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। জলই জীবন সৃষ্টির আদিমূলে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ছিল, মানব সৃষ্টির রহস্য কি- এসব জটিল চিন্তাধারার অবসান ঘটিয়েছেন আমাদের বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এর ওপর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। মানুষ কোথা হতে এসেছে, কোথায় ফিরে যাবে, কার কাছে যাবে- সেখানকার পরিণতি কি- এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। বিজ্ঞানের প্রমাণাগার এখানে ব্যর্থ। তাই রসুলের বাণী ও কোরআন থেকে প্রকৃত তত্ত্ব তুলে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করব।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশেই এ বিশ্ব সৃষ্টি। আর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই তাঁকে আল্লাহ্-পাক সৃষ্টি করে গোপন রেখেছিলেন। এরপর হযরত আদম (আঃ)-কে মানবরূপে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়। সর্বশেষে আসেন এ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আদম গন্ধম ফল খাবার অপরাধে এ পৃথিবীতে এসেছেন সেটা আমরা সঠিক বলতে পারি না। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যই ছিল মানব সৃষ্টি ও তার সম্প্রসারণ। তাই বলতে হয় 'ভুল' একটি অছিলা। এ রহস্যের মূলে কি ছিল এ বইটিতে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

কোরআন, হাদিস এবং বাইবেল হতে যেসব তত্ত্ব আমি সংগ্রহ করেছি সেখান হতে উদ্ধৃতি দিয়ে এবং রসুলের বাণীকে সম্বল করে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি 'মানুষ মরে না'। জানি এ-বিষয়ে বিরাট একটি বিতর্কের সৃষ্টি হবে। অল্পশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত ও কিছু গোড়াপন্থী এর বিরুদ্ধাচরণ করবে জানি। তবুও নিগূঢ় সত্য কথাটা বলতে ভয় পাই নি। কারণ রসুলের বাণীই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে- **'মৃত ব্যক্তিকে সকাল সন্ধ্যায় বেহেশত দোজখ দেখানো হয়।'** কবরে ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তিনি দাঁড়িয়ে মুনাজাত করেছেন তাদের মুক্তির জন্য। বদর যুদ্ধের পরদিন যে কূপে চব্বিশজন কাফেরকে নিহত অবস্থায় রাখা হয়েছিল- তাদের সঙ্গে পরদিন রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর কথা শুধু হযরত ওমরকেই নয়, সবাইকে হতবাক করেছে যখন তাদের প্রশ্নে বলেছেন- **'ওরা আমাদের চাইতেও বেশি শুনতে পায় ও দেখতে পায় কিন্তু জবাব দেবার ক্ষমতা নেই।'**

হযরতের এ ঘটনা আমাকে অবাক করেছে। গভীর তত্ত্বে নিমজ্জিত করেছে। আল্লাহর এ মহাবাণী বিশ্লেষণ করবার সুযোগ দিয়েছে।

"ওয়া লা তাকুলু মাইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহে আম্‌ওয়াতান বাল্ আহ্‌য়িয়াউন।"

অর্থাৎ- 'তোমরা তাদের মৃত বলিও না যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে। বরং তাহারা জীবিত।'

প্রায় পনেরো বছর পূর্বে বদর যুদ্ধের এক শহিদের লাশ ১৯৩০ সনে অবিকৃত অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাওয়া গেছে। রসুলের (দঃ) কথা কোরআনের কথা কেমন সত্য সেটা প্রমাণ করেছি এ পরিচ্ছেদে। সারা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে এ লাশ প্রমাণ করেছে- 'আমি মরি নাই'। এরূপ ঘটনা প্রায় যুগেই ঘটে থাকে। কবরে লেখাপড়া করা, কবরে কোরআন পাঠ, কবরে মৃত ব্যক্তিদের কথাবার্তা বলার ঘটনা এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। তাই অনেকে আমার আলোচনাকে প্রাধান্য না দিলেও ওলি-গাউস ও আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষগণ সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

মৃত্যুর পর আত্মাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাই মৃত আর মৃত থাকে না। কঠিন শাস্তি ভোগ করে অথবা বাসর ঘরের দুলা হয়ে ঘুমিয়ে থাকে অথবা আল্লাহরই আরাধনা করে। আত্মা অমর, অক্ষয়। এর মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই। যার নির্দেশে জড়-দেহে প্রবেশ করে তাঁর নির্দেশেই জড়দেহ ত্যাগ করে। আবার ফিরে আসে। অদৃশ্য বিজ্ঞানের এ খেলা বোঝবার সাধ্য কারো নেই। আত্মা পরিচ্ছেদে এ খেলা দেখাবার চেষ্টা করব সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর বাণী ধরে। পয়গম্বরদের উদ্ধৃতি হতে। শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে থাকবে উত্থান দিবস ও বিচার দিবস। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অতি মনোযোগ সহকারে পুনরুত্থানের এ ভয়াবহ অবস্থার কথা পড়ুন। বিশ্বাস করলে মুক্তি পাবেন। বিচারের কাঠগড়ায় সুপারিশ পাবেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে পুরস্কার পাবেন। ঐ সঙ্কটময় দিন আসবেই। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই হবে স্বার্থপর। পৃথিবী পরিমাণ উপঢৌকনের বিনিময়েও মুক্তির আশা নেই। একমাত্রই আশা ও ভরসা ঐ বিপদের কাণ্ডারী, দুঃখীর ব্যথা অনুভবকারী, মানব দরদী নেতা, আল্লাহর দরবারে সেজদাকারী- শাফেয়ীল মুজানাবীন, রহমতুল্লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। কোন্ ব্যথা হৃদয়ে নিয়ে, কোন্ কৌশল অবলম্বন করে তিনি আল্লাহর কাছে নিবেদন করবেন তা দেখুন।

সর্বশেষে রসুলের (দঃ) 'মোজেজা' পরিচ্ছেদ থাকবে। অদৃশ্য বিজ্ঞানের আর একটি আলোচ্য বিষয়। এখান থেকে চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দ অনুভব করতে পারবেন কতটুকু ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ্ -পাক তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

আমার লেখার মাঝে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য আমি সবার কাছেই ক্ষমা চাই।

সর্বশেষে মহান আল্লাহর কাছে জীবন-মন সঁপে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর অফুরন্ত দয়া ও রহমতের জন্য। আর প্রার্থনা করছি উত্থান দিবস, বিচার দিবস ও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে আমাকে, আমার পিতামাতা ও বংশধরকে, আমার শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহভাজন পাঠকবৃন্দকে এবং তোমার ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়কে। আমিন-আমিন- আমিন।

Address :
MD. NURAL ISLAM, B.Sc.
Sub-Divisional Engineer (Retd)
LATIFPUR COLONY
PO. & Dt—BOGRA
BANGLADESH

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদদের মস্তিষ্কে বারবার আলোড়ন সৃষ্টি করে একটি প্রশ্ন- **'এ সুন্দর বিশ্ব কে সৃষ্টি করেছে? এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে কি অবস্থা ছিল?'** - এসব জটিল প্রশ্নের সমাধান বিজ্ঞানের কোন গবেষণাগারে খুঁজে পাই না। নির্ভর করতে হয় নবী, পয়গম্বর ও রসুলদের পবিত্র বাণীর উপর। যুগ যুগের দার্শনিকগণ যদিও এসব বিষয়ের উপর গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অন্ধদের ধ্যান-ধারণার উপকরণ যুগিয়েছেন তবুও সমাধান দিতে পারেন নি।। কেননা এক দার্শনিক যে মতবাদ দিয়েছেন অন্য দার্শনিকরা তাঁর মতবাদকে ভ্রান্ত, অলীক ও যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সাধারণ চিন্তাবিদরা হাবুডুবু খেয়েছেন। শেষে নিরাশ্রয়ের মত যে যেটাকে পেয়েছে সেটাকেই আঁকড়িয়ে ধরেছে। এ জন্যই যুগে যুগে দ্বন্দ্ব, কোলাহল, বিশ্বাস, অবিশ্বাস লেগেই আছে। চলুন, আমরা এ দ্বন্দ্বের অবসান করি মহান নবীদের বাণী ধরে।

একটি প্রশ্ন অবশ্য তবু থেকে যায়- নবীরা সবাই তো এক সময়ে জন্মলাভ করেন নি। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন যুগে, ভিন্ন শতাব্দীতে তাঁদের আগমন ঘটেছিল। তাঁদের সবার মতবাদ এক ছিল কিনা- একই ধ্যান-ধারণা দিয়ে গেছেন কিনা। যদি একই হবে তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় কেন? মতের পার্থক্য কেন? উপাসনা ও চালচলনের ভঙ্গি পৃথক কেন? একই সৃষ্ট জীব মানুষের মাঝে হানাহানি কেন? এক মতে আসতে পারছে না কেন?

নবীরা মানুষ হয়েই জন্মলাভ করেছিলেন। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে। এ সত্যটাকে বুঝতে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দরকার নেই। যুগ-যুগের জন্য এটা সত্য ; চিরন্তন সত্য। এ সত্যকে নিতান্ত মূর্খ ও অবিশ্বাসীকেও মেনে নিতে হয়। মৃত্যু আছে বলেই জন্ম আছে। আর জন্ম আছে বলেই মৃত্যু আছে।

এ পৃথিবী নশ্বর হলেও দীর্ঘস্থায়ী। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এর বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর। আরও কতদিন টিকে থাকবে সে কথা কেউ আজ পর্যন্ত তাঁর ধ্যান-ধারণা বা গবেষণাগারে খুঁজে পান নি। এমনকি মহানবীরা যাঁদের বাণী ধরে এ পরিচ্ছেদ শুরু করতে যাচ্ছি তাঁরাও বলে যেতে পারেন নি। জন্ম-মৃত্যু যেখানে চিরন্তন নীতি, সেখানে একজন নবী বেঁচে থাকবেন এবং একই বাণী কোটি কোটি বছর ধরে দিয়ে যাবেন তা কল্পনা করাও নির্বুদ্ধিতা। তাই একই সঙ্গে তাঁদের আগমনের প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয়ত ঃ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মানুষের স্বভাব গড়ে ওঠে। একই পৃথিবীর একই উপাদানে সৃষ্ট মানুষ ও জীবজন্তুর স্বভাব ও আচরণের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। রং-চেহারা, ভাষা, চিন্তাধারা, আকৃতি, প্রকৃতিতে ভিন্ন। তাই যুগের উপযোগী করে, দেশ ও জলবায়ুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর সে মহাপুরুষগণ সে দেশের ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও জলবায়ুতে নিজেকে গড়ে তুলেই সে দেশের মানুষকে দিয়েছিলেন ধ্যান-ধারণা, সহজ সুন্দর এক পথ। যে পথ ছিল তাদের প্রয়োজন। হাল ধরে যেমন নৌকার গতিকে ঠিক রাখা হয়; আসল গন্তব্য স্থানে পৌছানো যায় তেমনি মহাপুরুষগণ মানুষের বিক্ষিপ্ত মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ধারাকে কেন্দ্রীভূত করে এক সৃষ্টিকর্তার কাছেই পৌছিয়ে দেন। লক্ষ্যবস্তু এক হলে পৌছানোর পন্থা ভিন্ন হলেও ক্ষতি নেই। দেশের রাজধানীতে পৌছবার জন্য যেমন হাজার হাজার পথ রয়েছে- হাজার হাজার যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে পৌছবারও হাজার হাজার পথ

pdf By Syed Mostafa Sakib

রয়েছে। মত ও কৌশল রয়েছে। এ মত, পথ ও কৌশল ধরেছেন মহাকালের মহামনীষীরা। সবার মুখের একই বাণী ঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

অর্থাৎ ঃ- 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।'

প্রতিটি নবী ও রসুল এই একই বাণী তাঁর যুগের মানুষকে শোনাতেন আর নিজ নাম সংযুক্ত করে আল্লাহর প্রেরিত নবী বলে ঘোষণা করতেন।

যেমন ঃ

(১) সর্বপ্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ)-এর মুখ-নিঃসৃত বাণী ঃ
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদম শফিউল্লাহ্।'

(২) হযরত দাউদ (আঃ)-এর বাণী ঃ-
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু দাউদ খলিফাতুল্লাহ্।'

(৩) হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর বাণী ঃ
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্।'

(৪) হযরত মুসা (আঃ)-এর বাণী ঃ
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসা কালিমুল্লাহ্।'

(৫) হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী ঃ
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লুল্লাহ্।'

(৬) শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী ঃ
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্।'

তাহলে দেখা যায়- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-বাণীটি Common অর্থ্যাৎ এক। এর মধ্যে কোন কাটছাঁট নেই। উদ্দেশ্যেরও ভেদাভেদ নেই। বচন ভঙ্গিরও তারতম্য নেই। লক্ষ্যবস্তু এক আর সেটা হল 'আল্লাহ'- অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। উপাস্য তিনিই যাঁর মহাশক্তিতে এ বিশ্বের সৃষ্টি।

এই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ মেনে নিতে বাধ্য। কেননা যেদিকেই তাঁদের চোখ পড়ে সেদিকেই দেখতে পান অরূপ এক কৌশল যে কৌশল কারোই জানা নেই। এ কৌশলের আবিষ্কারক কে? চিন্তায় আসে না। খুঁজে পায় না। বুদ্ধিবৃত্তির সীমাতেও পড়ে না। একটি অতি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রজনন শক্তি দিয়ে বংশবৃদ্ধি করা ও দৌড়াদৌড়ি করে খাদ্য সংগ্রহ করার সামান্যতম শক্তি দেবার- যেখানে কম্পিউটার আবিষ্কারের মতো বৈজ্ঞানিকেরও নেই- সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার না করে উপায় কি? যাঁরা সত্যিকারের চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিক তাঁরা দূর বস্তু দিয়ে নয়, নিজ দেহের একটি পরমানুকে নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই হতবাক হয়ে বলতে বাধ্য হয়- 'আমি নিজকে চিনি না- জানি না। আমার শক্তি নেই। আমার কৌশল নেই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। আমি মূর্খ। আমার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক স্রষ্টা। যাঁর মহাবৈজ্ঞানিক কৌশলে চলছে আমার দেহ- এ পৃথিবী- এ মহাবিশ্ব।'

অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাবিদরাই বা যাবেন কোথায়? নিজ দেহকে ধরে রাখতে পারবেন না। নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না আপনার হৃদ-যন্ত্রকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ধারক অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডও আপনার সৃষ্টির বাইরে। যে আমিষ খাদ্য আপনার দেহকে সবল ও সুস্থ রাখে সে আমিষের পরমাণু সংযোগও আপনি করতে পারবেন না।

এতে প্রাণ দিয়ে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত করতে ব্যর্থ হবেন। বাতাসের নাইট্রোজেন ফুরিয়ে গেলে আপনি তা সংগ্রহ করে পুনরায় তা দিয়ে তরুলতাকে সজীব রাখতে পারছেন না। মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে পৃথিবীকে তপ্ত ও হিমশীতলের হাত থেকে বাঁচাতে পারছেন না। মহাকাশে মহাজ্যোতিঃ নিক্ষেপ করে দিবারাত্রি ঘটাতে পারছেন না। কি পারবেন? কোন্ বিদ্যার আপনি খেলা দেখাবেন? মাথার মগজ যদি শূন্য হয়ে যায়, স্নায়ুমণ্ডলী যদি বিকল হয়ে যায়, শরীরের রক্তপ্রবাহের যদি ভাটা পড়ে- হাত পা, কান-চোখ যদি নিষ্ক্রিয় হয় আপনি কি তা পারবেন সবগুলোর সংযোগ এনে আপনার সৃষ্টি কৌশল দেখাতে? একই মাটির উপাদান থেকে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট তরুলতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে টক-মিষ্টি-ঝাল দিয়ে ফল-মূল তৈরি করতে পারবেন? হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই অথচ তারা চলতে পারে, দেখতে পারে, দৌড়াতে পারে, এরূপ প্রাণী সৃষ্টি করে আপনার কৌশল ও বৈজ্ঞানিক কারিগরির নিদর্শন দেখাতে পারেন? বার্ধক্যের অবসান করতে, মৃত্যুকে লাঠির আঘাতে দূরে ঠেলে দিতে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গকে শক্তিহীন করতে, জড় -পদার্থের ইলেকট্রন ও প্রোটনকে বিপরীত প্রাণশক্তি দিয়ে নব-চেতনার রূপ দিতে পারবেন? পারবেন না। .... এজন্য আপনি কেন, বৈজ্ঞানিকদের জনক আলবার্ট আইনস্টাইন যিনি সারা জীবন অবিশ্বাস করে শেষ জীবনে মহাজগতের মহাতত্ত্ব মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ ও ছায়াপথের গাণিতিক হিসাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ-

"নিশ্চয়ই-এর পিছনে রয়েছে এক অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্তার এক রহস্যময় অভিপ্রায়। বিজ্ঞানীর দূরভিসারী জিজ্ঞাসা যেখানে বিমূঢ় হয়ে যায়- বিজ্ঞানের সমাগত চূড়ান্ত অগ্রগতিও সেখান থেকে স্তব্ধ হয়ে ফিরে আসে- সেই অনন্ত মহাজাগতিক রহস্যের প্রতিভা আমাদের মনকে এই সুদৃঢ় সত্যে উদ্বেল করে তুলেছে যে এই মহাবিশ্বের নিশ্চয়ই একজন নিয়ন্তা রয়েছেন; তিনি অলৌকিক জ্ঞানময়; তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করা যায় কিন্তু কল্পনা করা যায় না।"[১]

এ মহাবিশ্বের রূপ, এর অপরূপ সৌন্দর্য, এর সৃষ্টি-কৌশল দেখে যে কোন জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ মনীষীরাই হতবাক হতে বাধ্য। সবার চিন্তাতেই আসে এক বিপ্লব। সবার ধ্যান-ধারণা একত্রিত করে খুঁজে বেড়ায়- এ রহস্যের উদ্‌ঘাটককে। সঁপে দিতে চায় দেহ মন উজাড় করে সেই সৃষ্টির মূলে যে মহাশক্তি বিরাজমান তাঁরই হাতে। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোও (Plato) বলেছেন ঃ

"ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক চরম সত্তা যা থেকে পৃথিবীর সব কিছুর উদ্ভব, অথচ তিনি নিজে কোন কিছু থেকে উদ্ভব নন; তিনি স্বনির্ভর।"[২]

বিশ্বের যত মহামনীষী তাঁদের সবারই একই ধারণা একই চিন্তা ও একই রূপ প্রকাশভঙ্গি। প্লেটোর কথাগুলো নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ধর্মগ্রন্থের সারবস্তা নিয়েই তিনি একথাগুলো বলেছেন, স্রষ্টা নিজেই যেন তাঁকে এ কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এবারে আসুন, মহানবীদের ওপর অর্পিত মহাবাণী হতে এ মূল বা আদি সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা নিই।

[১] টীকা-১। একমেবাদ্বিতীয়ম- মোঃ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ., বি. টি।
[২]। গ্রীক দর্শন- মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। প্রজ্ঞা ও প্রসার পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১০৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ন অষ্টমো ন নবম দশমো না প্যুচ্যতে
য এতং দেবমেক বৃতং বেদ।"[২]

অর্থাৎ ঃ–

"পরমাত্মা এক। তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম বলিয়া অভিহিত আর কেহ নাই। যিনি তাঁহাকে এক বলিয়া জানেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।"

এবারে দেখি 'শ্রীমদ্ভগবদ গীতায়[১]–' কি বলা হয়েছে–

(ক) "পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য
তমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন তৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লোকত্রয়েহস্য প্রতিমপ্রভাব্।"৪৩

অর্থাৎ ঃ–

"তোমার মহিমার তুলনা নাই, তুমি সমস্ত জগতের পিতা, তুমি সকলের পূজ্য, সকলের গুরু, সবার চেয়েই তুমি বড়। এই তিন ভুবনে তোমার সমান কেহ নাই, তোমার চেয়ে বড় থাকিবে কিরূপে?"

(খ) 'নমো পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমো হস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্তং
সর্ব্ব সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্ব।"৪০

অর্থাৎ ঃ– "তুমি সব—তাই তোমাকে সামনে, পিছনে, সকল দিকেই প্রণাম করিতেছি। তোমার শক্তির সীমা নাই; তোমার বীরত্বের পার নাই, তুমি সারা জগৎ ব্যাপিয়া আছ। তাই তোমাকে সর্ব বলিয়া বলিতেছি (সকলের আত্মা)।"

(গ) "কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন
গরীয়সে ব্রহ্মাণোহপ্যাদিকত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদস্য তৎ পরং যৎ।"৩৭

অর্থাৎ :– "হে মহাত্মন! তুমি ব্রহ্মার চেয়েও বড়, তুমি সৃষ্টিকর্তা তাই তোমাকে তাহারা সকলে প্রণাম করিবে না কেন? হে শ্রেষ্ঠ দেবতা, হে অনন্ত, হে জগতের আশ্রয়! তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত যে পরম ব্রহ্ম তাহাও তুমি।"

(ঘ) "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্"
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেযু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।[২]

অর্থাৎ ঃ–

আমার আদি নাই, জন্মও নাই; আমি সকল জগতের প্রভু; এই আমার স্বরূপ যিনি জানেন, তিনিই এই জগতের সকল মোহ, সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

---

[২]। অথর্ব বেদ। ১৩/৪/২– সংগৃহীত একমেবাদ্বিতীয়ম পৃঃ নং–৩ কৃত– মোহাম্মদ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ. (ভারত)।

[১] টীকা ঃ–১। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। একাদশ অধ্যায়। শ্লোক নং ৪৩/৪০ ও ৩৭ (ক, খ, গ, ঘ) সংগৃহীত–একমেবাদ্বিতীয়ম পৃঃ নং– ৩। কৃত-মোহাম্মদ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ. (ভারত)।

সাহেব

শিখ ধর্মগ্রন্থ 'সাহেবে' বলা হয়েছে–

"ওঁ সত্য নাম কর্তা পুরুষ নৈর্ভ্যে নিবৈর্ব্বর
অকালমূর্ত অজোনী সহভং গুরু প্রসাদ জপাদি সচ,
জুগাদি সচ, হৈভী সচ, নানক হোমীভী সচ।" (জপজী–গোড়ী–১)

অর্থাৎ ঃ–

"ওম তাঁহার সত্য নাম। তিনি কর্তা, নির্ভয়, নৈর্বব কালাতীত। তাঁহার কোন মূর্তি নাই। কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই। তিনি সর্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। গুরুর কৃপায় তাঁহাকে জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন, তিন যুগে সত্য ছিলেন, বর্তমানে সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন।"[১]

কোরআন

কোরআন ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যা অর্পিত হয়েছিল নবী সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর। অলৌকিক এ ঐশী বাণীর কোন তুলনা নেই। যার মধ্যে কোন ভুল নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই– এ চ্যালেঞ্জ নিয়েই অর্পিত হয়েছে বিশ্বমানবের সম্মুখে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, কবিতায়, ছন্দে ও রূপের অপরূপ আলোকমালায় সুশোভিত হয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করছে অতুলনীয় গ্রন্থ- কোরআন।

এ গ্রন্থে শুধু ইহজগতের অমূল্য তত্ত্বই পরিবেশিত হয় নি, হয়েছে অদৃশ্য জগতের অক্ষয়, চিরস্থায়ী সুখ-সম্পদ ও কঠিন শাস্তির বর্ণনা। ইহ-পারলৌকিক জগতের মূল সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণের নির্দেশ। এ সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম ক্ষমতা, কৌশল, সৃষ্টিলীলা, দয়া, মায়া, শাস্তি, সৃষ্টি, ধ্বংস, বিচার ব্যবস্থা, বেহেশত, দোজখ প্রভৃতির সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে তাঁরই মহাবাণীতে, যার প্রতিফলন ঘটেছে এই কোরআনে– শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মাধ্যমে এইরূপ বাণীতে ঃ–

(ক) "আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন।
আর রাহমানির রহিম। মালেকে ইয়াওমেদ্দিন।
ইয়াকা না' বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্ তাইন।
ইহদিনা সিরাতাল্ মুসাতাকিম; সিরাতাল্লাজিনা
আন্-আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদূবে
আলায়হিম ওলাদ্দুয়াল্লিন।"[১] (১ ঃ ১–৭)

অর্থাৎ

"আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সর্বপ্রদাতা করুণাময়; প্রতিফল দিবসের প্রভু। আমরা তোমারই আরাধনা করিতেছি এবং আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর– তাহাদের পথ যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ; যাহাদের প্রতি কোপ প্রদর্শন করা হয় নাই এবং যাহারা পথভ্রান্ত নহে।"

---

[১]। 'সাহেব' গুরুনানক (জপজী–গোড়ী–১) সংগৃহীত–একমেবাদ্বিতীয়ম, পৃঃ ৩। কৃত–মোহাম্মদ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ. (ভারত।)

[১]। সূরা ফাতেহা। আয়াত ১ হতে ৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) "ইন্না হাজা লা হুয়াল কাছাছুল হাক্ব: ওয়া মা মিন এলাহী ইল্লাল্লাহ: ওয়া ইন্নাল্লাহাল আজিজুল হাকিম।"[2] (৩ ঃ ৬২)

অর্থাৎ,

"নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। নিশ্চয় সেই আল্লাহই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"

(গ) "ইন্নাল্লাহা লা ইয়াখফা আলায়হে শাইয়ুন ফিল আরদে ওয়ালা ফি সামায়ে। হুয়াল্লাজি ইউছাব্বিরুকুম ফিল আরহামে কায়ফা ইয়াশাও। লা-ইলাহা-ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম।"[3] (৩ ঃ ৫)

অর্থাৎ,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহার নিকট ভূমণ্ডলের মধ্যে ও নভোমণ্ডলের মধ্যে কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন। সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই।"

(ঘ) "আল্লাহু লা-ইলাহা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম।"[4] (৩ ঃ ২)

অর্থাৎ,

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। তিনি চিরজীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান।"

(ঙ) "কুলহু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কোফআন আহাদ।"[1] (১১২ ঃ ১-৪)

অর্থাৎ,

"বল, আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ আত্মনির্ভরশীল। সর্বনির্ভরস্থল। তিনি জন্মদান করেন না এবং জন্মগ্রহণ করেন নাই: এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।"

(চ) "ফা ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহেদুন ফালাহু
আসলিমো ওয়া বাশ্‌শিরিল মুখবেতিন।"[2]

অর্থাৎ,

"বস্তুত সেই একমাত্র আল্লাহ্ তোমাদের উপাস্য। অতএব তাঁহারই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ কর এবং সেই বিনীতদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর।"

(ছ) হুয়াল্লাহু ল্লাজি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আলিমুল গাইয়েবে
ওয়া শাহাদাতে হুয়ার-রহমানির রহিম। হুয়াল্লাহুল্লাজি
লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আল্ মালেকেল কুদ্দুছোছ-সালামোল
মুমিনুল্ মহাইমেনুল আজিজুল জাব্বারোল মুতাকাব্বির।
সুবাহানাল্লাহে আম্মা ইউশরেকুন। হুয়াল্লাহুল খালেকুল
বারিউল মুছাব্বেরুলাহুল আছমা-উল হুসনা। ইউছাব্বিহুলাহু
মা ফি সামাওয়াতে ওয়াল আর্দ। ওয়া হুয়াল আজিজুল
হাকিম।"[3] (৫৯ ঃ ২২)

---

[2]। সূরা আল ইমরা। আয়াত ৬২।
[3]। সূরা আল ঐ। আয়াত ৫।
[4]। সূরা আল ঐ। আয়াত ২।
[1]। সূরা আল এখলাস। আয়া ১-৪।
[2]। সূরা হজ্জ। আয়াত ৩৪।
[3]। কোরআন। সূরা হাশর। আয়াত ২২।

অর্থাৎ,

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই: তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি সর্বদাতা করুণাময়: তিনিই আল্লাহ্– যিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই: তিনি পবিত্রতম রাজ্যাধিপতি, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী অভিভাবক, মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, মহিমাময়: তাহারা যে অংশ স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্রতম। তিনিই আল্লাহ্– যিনি সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকারক, আকৃতিদাতা: তাঁহার জন্যই অত্যুত্তম নামসমূহ: নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"

এমন নির্ভুল, পবিত্র ও মহাসত্যের বাণী স্রষ্টা সম্বন্ধে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার সামান্য জ্ঞানের পরিধিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের যেসব মূল্যবান বাণী সীমাবদ্ধ তার ভিতর এমন উজ্জ্বল, পরিষ্কার, ভাবগম্ভীর স্রষ্টার পরিচয় অন্য কোথাও দেখি নি।

উপরে বর্ণিত বাণীতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে প্রচুর খোরাক। এ বাণীতে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্বই শুধু বোঝানো হয় নি তাঁর বাস্তব পরিচয়, অসীম ক্ষমতা, সৃষ্টিসমূহের মূল বিধাতা, মহাবৈজ্ঞানিক, কৌশলকারী ও মহান শিল্পীর পরিচয় দানে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও জড়বাদীদের পর্যন্ত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছে। এরপরেও যদি কেউ বলে সৃষ্টিকর্তা নেই– তাদের বলতে হবে পাগল, উন্মাদ, বুদ্ধিহীন, চিন্তাহীন, অবাস্তববাদী, গোঁড়া, নাস্তিক ও পশু।

সৃষ্টি আছে স্রষ্টা নেই, শিল্প আছে শিল্পী নেই, ফ্যাক্টরি আছে মালিক নেই, বিজ্ঞান আছে বৈজ্ঞানিক নেই, নাটক আছে নাট্যকার নেই, রাজ্য আছে রাজা নেই, ধ্যান আছে ধ্যানী নেই, ছাত্র আছে শিক্ষক নেই, এরূপ যারা মনে করে সমাজের কাছে তারা কি আদরণীয়? বরণীয়? না, ঘৃণ্যা ও নিন্দনীয়? কোন বুদ্ধিমান কি এদের বুদ্ধির ও যুক্তির পিছনে দৌড়াবে? না ভণ্ড বলে জুতোর মালা গলায় দিয়ে রাস্তার মোড়ে ঘোরাবে? হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি ও জৈন সব ধর্মের মানুষের জন্যই যখন একই বাণী **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** ঃ– অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোন উপাস্য নেই– তখন চলুন সবাই এই মহামন্ত্রকে কেন্দ্র করেই আমরা পরবর্তী আলোচনায় অংশ নিই।

"নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া"
(লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)

এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ধ্বংসকর্তা এক ও অদ্বিতীয় 'আল্লাহ্'। তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। এ অদ্বিতীয় নামটি কোরআনে বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে গণনা করে দেখা গেছে মোট ২৬৯৮ বার। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে– গড়, ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা, খোদা, ডিউক, ডিট্টো ইত্যাদি শব্দে এ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। একমাত্র বেদে 'অল্ল' শব্দটি দেখা যায়। আর এ 'অল্ল'–শব্দটির শক্তি, মহিমা, গুণ, রূপ, বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে ঃ-

"হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
'অল্ল'[1] জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মনং অল্লাম" ।।২।।
অল্লহ রসল্ল মহমদরঃ কং বরস্য অল্ল অল্লাম
আদল্লাং বুক মেকং অল্লাবুকং নির্খাত কম।।৩।।

---

[1]। অর্থব বেদ-উপনিষদ।
অল্লোপনিষদ পরিচ্ছেদ। 'আল্লাহ' শব্দটি সংস্কৃতে 'অল্লো' বলা হয়।
[2]। 'মুহাম্মদ'–শব্দকে সংস্কৃতে 'মহমদ' বা 'মহামত' বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ,

"আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহাইন্দ্রের ইন্দ্র। আমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, পরমপূর্ণ ব্রহ্ম। আমি আল্লাহ্। **আল্লাহর রসুল মুহাম্মদের তুল্য আর কে আছে?** আমি আল্লাহ্। আল্লাহ্ সহায়, অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু।"

'একমেবাদ্বিতীয়ম'-অর্থ ঃ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নয়। বেদে এ শব্দটিই উচ্চারিত হয়েছে। এই পরমপূর্ণ উপাস্যই সমগ্র মানবজাতির উপাস্য,- একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-'আল্লাহ্' যার সর্বগুণ সর্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু একটি মাত্র কথা বলবার আছে যে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন মহামনীষীরা যে নামে তাঁকে চিনেছেন, বুঝেছেন ও তাঁর সত্তায় লীন হতে আদেশ দিয়েছেন- তিনি যদি ভিন্নতর নামের ভিন্ন শক্তি হতেন অর্থাৎ মুসলমানদের আল্লাহ্, হিন্দুর ভগবান, খ্রিষ্টানদের গড ইত্যাদি এক না হয়ে পৃথক হতেন তাহলে বিশ্বের অংশ নিয়ে এদের মধ্যে হতো দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা ও বিদ্বেষ। ফলে কারো উপাস্যই শান্তিতে ও নিরাপদে শাসন করতে পারত না। কারো হাতে থাকত সূর্য, কারো হাতে চন্দ্র, কারো হাতে পৃথিবী, কারো হাতে বায়ু, কারো হাতে মেঘমালা, কারো হাতে সমুদ্র, কারো হাতে মরুভূমি, কারো দখলে জীবজন্তু, কারো দখলে পাহাড় ও তরুরাজি। ভারতের শাসক নদীর জলপ্রাবাহ বন্ধ করে বাংলাদেশকে যেমন মরুভূমি করে দিচ্ছে, আরবের বাদশা তেল বন্ধ করে যেমন আমেরিকার বাহাদুরী খর্ব করেছে, ইরানের খোমেইনি যেমন সীমানা বৃদ্ধি করতে ইরাকের ধন-সম্পদ বোম্বিং করে ওড়াচ্ছে- তেমনি এক ভগবান আর এক গড় এর ওপর ঈর্ষা করে চাঁদের ওপর বোম্বিং করত।

এক আল্লাহ্ আর এক খোদার ওপর এক হাত দেখাতে সূর্যকে আটকিয়ে রাখত সেনানিবাসের এক রুদ্ধ কক্ষে। 'ডিউক'- তার ক্ষমতাবলে ঈশ্বরের মেঘমালা কামান দিয়ে তছনছ করে দিত। খোদায়- ভগবানে মিল থাকত না। ঈশ্বরে-আল্লায় হতো লাঠালাঠি। ভগবান ও খোদায় হত হরদম বকাবকি। জল নিয়ে হতো মারামারি। খাদ্য নিয়ে হত কাড়াকাড়ি। কার ভগবান যে মরত, কার গড যে হাসপাতালে থাক, আর কার ঈশ্বর যে প্রাণ নিয়ে পালাত তার ঠিক থাকত না। কি মজার কাণ্ডই না ঘটত!

নিতান্ত মূর্খ ও অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ একথা বলবে না যে আমার 'গড' তোমার 'আল্লাহর' চেয়ে শক্তিশালী। আমরাই শুধু আল্লাহর ভক্ত। ইহুদি, নাসারা, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু সব অন্য খোদার সৃষ্টি। আমার ব্রহ্ম ও তোমার সৃষ্টিকর্তাতে প্রভেদ আছে। তাই ব্রহ্ম উপাসনা ছাড়া আল্লাহর উপাসনাতে মুক্তি নাই। স্বর্গ শুধু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের জন্য আর বেহেশত ও দোজখ মুসলমানের জন্য। স্বর্গের সুখ বেহেশতের শান্তি ও সুখ হতে পৃথক। দোজখের শাস্তি Hell বা নরক হতে অনেক বেশি- এমন কথা শুধু নিকৃষ্টতম, জ্ঞানহীন, বিবেকহীন, বুদ্ধিহীন ও সৃষ্টি তত্ত্বে বেখেয়ালী চিন্তাহীন সৃষ্টজীব বনমানুষের জন্যই খাটে। বুদ্ধিসেরা মানুষের জন্য নয়।

বিশ্বের মানবগোষ্ঠী একই সম্প্রদায়ভুক্ত। একই মানব সন্তান হতে আগত। একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট। তাই সৃষ্টির পদ্ধতিতে এক। শারীরিক উপাদান এক। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক, রক্ত উপাদানে এক। আত্মা, মন, বল, শক্তি, প্রেম ভালবাসার উৎসেও এক। একজন খ্রিষ্টানের দেহ বিশ্লেষণ করে যা কিছু মেলে একজন হিন্দু অথবা মুসলিমের দেহ বিশ্লেষণ করলেও তাই মেলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকত। উপাদান ও পরিমাণে ভিন্নতর হতো। কিন্তু তাই কি দেখা যায়? যদি এটাই সত্য হয় তবে ঐ এক আল্লাহ বা ঈশ্বর বা গড় সবারই। সবারই তিনি উপাস্য। সবারই আরাধ্য।

সবারই মালিক। তাঁরই পবিত্র হাতে সৃষ্ট সবাই। তাঁরই হাতে ধ্বংস। তাঁরই হাতে এ বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত। তিনি ছাড়া সৃষ্টি-ধ্বংসের এ নিয়ন্ত্রনের কোনই অধিপতি নাই। তাই সবাইকে মানতে হবে ও বলতে হবে— **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**। অর্থাৎ **'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া'**।

এই একটি জপেই শক্তি। এই একটি জপেই মুক্তি। এ জপ ছাড়া নিস্তার নেই। এ জপ ছাড়া কাঠগড়ায় বিচারে দাঁড়াবার বুদ্ধি নেই। এ জপ ছাড়া স্বর্গে যাবার কোন পন্থা নেই। পূর্বের উদ্ধৃত ধর্মগ্রন্থ সমূহে (বেদ-বাইবেল-কোরআন-শ্রীমদ্ভগবদগীতা-সাহেবা) এ কথারই সাক্ষি দেয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সমগ্র জাতির, সমগ্র মানুষের জন্য রেখে গেলেন ত্রাণের এক অমর বাণী। এ বাণী পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সারমর্ম। যারা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ অলৌকিক বাণীর প্রতি ভক্তি রেখে হৃদয়-মন দিয়ে জপ করবে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** তাঁরাই হবে আল্লাহ্র প্রিয়। পাবে চির মুক্তি।

দেখুন তিনি কি বলেছেন ঃ (আবু যর হতে বর্ণিত)

"যে কেহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"- বলে এবং তারপর মারা যায় সে বেহেশতে যাইবে। আমি (আবুযর) বলিলাম,

'যদিও সে যেনা ও চুরি করিয়া থাকে?'-তিনি বলিলেন,

'যদিও সে যেনা ও চুরি করিয়া থাকে?'-আমি বলিলাম,

'যদিও সে যেনা ও চুরি করিয়া থাকে?' তিনি বলিলেন,

'যদিও সে যেনা ও চুরি করিয়া থাকে?' তিনি বলিলেন,

'যদিও সে যেনা ও চুরি করিয়া থাকে?'-যাইবে আবুযরের নাক রগড়াইয়া।

আবুযর যখনই এই হাদিস বর্ণনা করিতেন বলিতেন, "যদিও ইহাতে রগড়ান হয় আবুযরের নাক।"[১]

পৃথিবী সৃষ্টির পর বহু জাতির আগমন ঘটেছে। বহু জাতির পতন হয়েছে। এদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দু'টো শ্রেণীই ছিল। কেউ আজ টিকে নেই। অবিশ্বাস করে যদি বেঁচে থাকা যেত তা হলে ফেরাউন নিজ ঘোষণা বলে- **'আনা রাব্বুকুমুল আলা'**- অর্থাৎ 'আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'- এ দম্ভভরেই টিকে থাকত। এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করত। সামান্য জলের চাপে একথা বলে প্রাণ হারাতো না ঃ-

"আমি বিশ্বাস করিলাম সেই আল্লাহকে যাঁহাকে বনি ইস্রাইল বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত হইলাম।" [১০ ঃ ৯০]

মৃত্যুর পূর্বে ফেরাউন যদি বুঝত যে মায়ের পেটে তাঁর জন্ম হয়েছে, মায়ের পেটেই প্রতিপালিত হয়েছে সুদীর্ঘ দশটি মাস, রক্ষিত হয়েছে ঝড়-বাদল, শীতল, উষ্ণ, আর্দ্রতা, জরা, ব্যাধি, সাপ, সিংহ ও বিষাক্ত প্রাণীর ছোবল হতে। যদি সে বুঝত যে জন্ম-মৃত্যু তার হাতের মুঠোয় নয়, তরুলতা, বৃক্ষরাজি, ফলমূল সে সৃষ্টি করতে জানে না, বিভিন্ন স্বাদে-গন্ধে, আকৃতিতে সে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করতে পারে না, এক বিন্দু বীর্যের সৃষ্টি করে মানুষ তৈরির কারখানা গড়তে জানে না, পানিকে বাষ্পে পরিণত করে মেঘমালায় সুশোভিত করবার কৌশল জানে না- কোন্দিন কোন্ সময় সাগরের নির্মল জল তাঁকে বেষ্টন করে প্রাণবায়ু সংহার করবে জানে না, চন্দ্র-সূর্যের গতিরোধ করে সৃষ্ট জীবের পতন ঘটাতে জানে না তা

১। তজরীদুল বুখারী। হাঃ নং ৪/৮০০ পৃঃ নং ৩৮৭।
অনুবাদ- আলহাজ্ব আঃ রহমান খাঁন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হলে কিছুতেই বলত না– 'আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'। মৃত্যুর সময় যে কথা স্বীকার করেছে সে উপাস্যের আরাধনা করেই হযরত মুসার (আঃ) মত খ্যাতি অর্জন করত। তাঁর দেহ জন্ম-জন্মান্তরের মানবজাতির শিক্ষার জন্য সৃষ্টিকর্তা তাকে নিদর্শন করে রাখতেন না।[২] (১০ ঃ ৯০-৯১)

নমরুদ– 'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া'–বিশ্বাস না করে বলে ফেলল 'আমি একজন খোদা'। খোদার অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী হতে গিয়ে কি বিপদই না তার ঘট্‌ল। আমি পূর্বে লিখেছি বেশি খোদা হলে মারামারি হবে– যুদ্ধ হবে, হিংসা হবে। এক খোদা আর এক খোদার বাহাদুরী মান্‌বে না। নমরুদের অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিল। নিজেকে 'খোদা' বলে জাহির করে পড়ল এক মহাবিপদে। আসল খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করল না– করল হিংসা আর বিদ্বেষ। তাই যুদ্ধ করে হারাতে গেল তাঁকে। কি লজ্জাস্কর পরিণতি হলো নকল খোদা নমরুদের। সৈন্য, সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, রসদপত্রও বিচূর্ণ হলো বিষাক্ত কীটের দংশনে, –তার মস্তিকেও ঢুকে পড়ল অতি ক্ষুদ্র এক কীট। এ কীটের কামড়ে নমরুদ হয়ে পড়ল বেসামাল।

এ কীট তাকে সম্রাট বলে মানে না। খোদা বলে স্বীকার করে না। এর স্বভাব সুলভ আচরণ অনুযায়ী মস্তিকের মণিকোঠায় হানতে লাগল আঘাত। দংশন করতে লাগল তার শিরায়-উপশিরায়। বিষের যন্ত্রণায় অহঙ্কারের শিরাগুলোতে আসল অবসাদ। অন্ত্রে-তন্ত্রে শুরু হলো আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবলীলা। চোখে-মুখে ভেসে উঠল লজ্জা ও অপমানের কালো ছায়া। যে খোদা কয়েক ঘণ্টা আগে বাহাদুরী করে তাঁরই সৃষ্টিকর্তাকে মারতে তীর ছুঁড়ল– সেই খোদা এখন ভীত, সন্ত্রস্ত, বুদ্ধিহীন, শক্তিহীন এক পাপী। এ অপমান ও তীব্র জ্বালার হাত থেকে রেহাই পেতে তাই নিজের মাথায় লাঠি মেরে নিজের প্রাণ হারালো। ইতিহাস এর সাক্ষি। বেদ-বাইবেল কোরআন ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সমূহ এর সাক্ষি। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্ট জীব ও মানবসন্তান এর সাক্ষি। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'– না মানার ফল এ পৃথিবীতেই দাঁড়াল এই। আর পরজগতে– মহাবিচারের দিনে কি হবে কে জানে?

বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা কি ছিল এটা জানবার কৌতুহল প্রতিটি জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরই আছে। কিন্তু কে এ তত্ত্ব দেবে? কার মুখে এ গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যময় বাণী শুনব? বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ। দার্শনিকদের চিন্তাধারা এর ধারে-কাছেও যেতে পারে না। কবি ও ওলি-গাউসরা আর্শের তত্ত্ব কিছু টেনে আনলেও রহস্য উন্মোচনের প্রান্তেও পৌছতে পারেন না। একমাত্র সেই মহাবিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব যিনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, পরেও ছিলেন এবং ধ্বংসের পরেও থাকবেন। তিনি কে?– এ জটিল প্রশ্নের সমাধান পাওয়া কঠিন। তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক মহান সৃষ্টি তাঁর নিজ পরিচয় এইভাবে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের হতবাক করে দিয়েছেন।

(১) "আউয়ালো মা খালাকাল্লাহু নূরী। খালাকাল বায়াদা মে নূরী।"[১]

[২]। কোরআনে এ কথার উল্লেখ আছে। সূরা ইউনুস। আমার রচিত 'বিজ্ঞান না কোরআন?' পুস্তকে ফেরাউনের ঘোষণা পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

[১-২] হাদিস। সংগৃহীত–বিশ্বনবী কৃত–গোলাম মোস্তফা।

অর্থাৎ

"সর্বপ্রথম আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা আমার নূর। পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি আমার নূর হতেই উৎপন্ন।"

(২) "আলেমতু মা-ফি সামাওয়াতে ওয়াল আরদে মিন কাব্‌লে আদামা খাম্‌ছিনা ছানা।"[২]

অর্থাৎ ঃ–

"আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাহা কিছু আসমান ও জমিনসমূহে আছে আদম সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে।"

(৩) "পূর্বদ্বয় ও পশ্চিমদ্বয় আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল এবং আমি এর সব তত্ত্ব অবগত হইলাম।"[৩]

(৪) "আল্লাহ্-পাক আমার অন্তরে এক অনুগ্রহের জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিলেন। আর আমি ইহাতে অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে এর সব তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম।"[৪]

উপর্যুক্ত বাণীসমূহ কার? কে জলদগম্ভীর স্বরে এমন চ্যালেঞ্জের বাণী দিয়েছেন? কে সে মহাবৈজ্ঞানিক যিনি এ বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিলেন? সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাঁকে বিশ্ব জগতের সব তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় সৃষ্টি, এর রূপ-মাহাত্ম্য, সৃষ্টি পদ্ধতির রহস্য অলৌকিকভাবে তাঁকে দেখানো হয়েছিল যার জন্য এমন চ্যালেঞ্জের বাণী দিয়ে সারা বিশ্বের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের হতবাক করে দিয়েছেন?

ত্রিভুবনের মুহাম্মদ (দঃ)– বাংলার মাটিতে আশীর্বাদস্বরূপ এক কবির জন্ম হয়েছিল যাকে সবাই **'বিদ্রোহী কবি নজরুল'**– বলে জান্‌ত। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, আধ্যাত্মিক দর্শনে যা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়, গানে ও লেখনিতে। সে তত্ত্বের সন্ধান আজও অনেকে করতে পারেন নি। শৈশবে তাঁর রচিত একটি গান শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে। গানটি ছিল এই ঃ–

"ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ
এলরে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ-বাতাস
দেখবি যদি আয়।"

গানটি মুখস্থ করেছি এবং এর সুর আয়ত্ব করে নিজে গান গেয়ে আত্মতৃপ্তি পেয়েছি। এরপর বেশ কয়েকটি যুগ পার হয়ে গেছে কিন্তু কোনদিন চিন্তা করি নি– 'ত্রিভুবনের মুহাম্মদ (দঃ)' কেন বলা হলো? 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)– ৩টি খণ্ড লিখলাম, 'জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'– লিখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলাম কিন্তু কোথাও 'ত্রিভুবনের মুহাম্মদ (দঃ)' বলে ব্যাখ্যা দেই নি। কিছুদিন পূর্ব থেকে এ চিন্তা মাথায় আসল কেন জানি না। অদৃশ্য বিজ্ঞান পরিচ্ছদে হাত দিয়ে এ চিন্তা জটিল আকার ধারণ করল। প্রথম ভুবন কোন্‌টি? দ্বিতীয় ভুবন কোন্‌টি? আর তৃতীয় ভুবনই বা কোন্‌টি? এই তিন ভুবনের অধীশ্বর কে? আর এই তিনটি ভুবনের মর্যাদাশীল মহামানবই বা কে?

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব অবস্থাকে প্রথম ভুবন বলা যায়। এর পরবর্তী অবস্থাকে দ্বিতীয়

[৩-৪] হাদিস। সংগৃহীত– কোরআনের তর্জমা কৃত–আলি হাসান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভুবন। আর বিশ্ব ধ্বংস-লীলার পরবর্তী অবস্থাকে তৃতীয় ভুবন ধরা যায়। এই তিনটি ভুবনের একমাত্র অধীশ্বর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্– যিনি নিজেই সে কথা আমাদের শিখিয়েছেন এই বলে ঃ–

"হুয়াল আউয়ালো ওয়াল আখেরো। ওয়া জাহিরো ওয়া বাতিনো। ওয়া হুয়া বে-কুল্লি-শাইয়েন কাদির।" (কোরআন- সূরা হাদিদ)

অর্থাৎ ঃ–

"তিনিই আদি ও অন্ত। গুপ্ত ও ব্যক্ত। তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।"

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বেদ-বাইবেল-জেন্দাবেস্তাতেও একই কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।

শেষ প্রশ্ন ঃ এই তিন ভুবনের মর্যাদাশীল মহাপুরুষেরই বা সৃষ্টি কে?

অতি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। ধর্মগ্রন্থ আলোচনার মাধ্যমে দেখব কে সে মহাপুরুষ বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেই অর্থাৎ প্রথম ভুবনেই মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। হৃদয়ে দ্বন্দ্ব লাগে। অবিশ্বাসের বেড়াজাল ঘিরে ফেলে। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এ পৃথিবীর অস্তিত্ব যখন ছিল না তখন আবার মহাপুরুষের জন্ম হয় কি করে? জন্মের প্রশ্ন যেখানে আসে না সেখানে মর্যাদার প্রশ্নও অবান্তর। দেখি আমাদের চিন্তাধারা ঠিক না বেঠিক।

সৃষ্টিকর্তা বলেছেন ঃ–

"এবং আল্লাহ্ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে দান করিবার পর তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে– তাহার সত্যতা প্রতিপাদনকারী একজন রসুল আগমন করিবে, তখন তোমরা অবশ্য তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহার সাহায্যকারী হইবে; তিনি আরও বলিয়াছিলেন– তোমরা কি ইহাতে স্বীকৃত হইলে এবং আমার শর্ত গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিয়াছিল– 'আমরা স্বীকার করিলাম; তিনি বলিলেন তবে তোমরা সাক্ষি থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষিগণের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।"[১]

কোরআনের উপর্যুক্ত বাণী অর্পিত হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এ বাণী। অন্য কারো নয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার– যাঁর প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ প্রতিটি জাতির, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ এ প্রতিশ্রুতি নিচ্ছেন সমবেত নবীদের নিকট হতে এবং তাদের অঙ্গীকার করাচ্ছেন এই বলে যে পরবর্তীকালে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর তাঁদের সবাইকে জ্ঞান-বিজ্ঞান হাতে দিয়ে প্রেরণ করা হবে মনুষ্য জাতির জন্য। সর্বশেষে একজন রসুলকে প্রেরণ করা হবে যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর সাহায্যকারী হতে হবে প্রতিটি নবীর। এই শর্ত তাঁরা গ্রহণ করলেন কিনা আল্লাহ্ প্রশ্ন করলে সমস্ত নবী একযোগে সমস্বরে বললেন, 'আমরা স্বীকার করলাম সেই প্রতিশ্রুত নবীকে। আল্লাহ্-পাক নবীদের এ অঙ্গীকারে খুশি হয়ে বললেন– তোমরা সাক্ষি থাক। আমি নিজেও এ সাক্ষিগণের মধ্যে রইলাম।'

হযরত মুহাম্মদই (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লম) সেই প্রতিশ্রুত নবী, সেই রসুল যিনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই 'নবী সম্রাট'–অর্থাৎ সাইয়েদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লেল আলামিন রূপে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। অঙ্গীকারাবদ্ধ কোন নবীই এ প্রতিশ্রুতিতে অস্বীকার করেন নি বা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি। বরং সানন্দে তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে ধন্য হয়েছেন। প্রতিটি নবীই তাই প্রস্থানের পূর্বে বার বার হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নাম ঘোষণা করেছেন,

[১]। কোরআন। ৩ ঃ ৮১। সূরা আল্-ইমরা। আয়তা- ৮১

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আগমন বার্তা ঘোষণা করেছেন। এর সাক্ষি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। আমার রচিত 'জগদগুরু মুহাম্মদ (দঃ)'–পুস্তকে এর ওপর অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছে। তবু পাঠকবৃন্দের অবগতি ও বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ হতে মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত মুহাম্মদের পরিচয় দিচ্ছি।

(১) কোরআন ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাহাদিগ হইতে তাহাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করিও– যিনি তাহাদের সমক্ষে তোমাদের নিদর্শনাবলী পাঠ করিবেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (সূরা বকর। ২ ঃ ১২৯)

(২) বেদ ঃ

"লা-ইলাহা হরতি পাপম ইল্ল-ইল্হা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠপর অপ ইনতিত জপি নাম মোহাম্মদম।"

(উত্তরায়ণ বেদ। অন্-কাহি পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ ঃ–

"লা ইলহা বললে সমস্ত পাপ মাফ হয়। ইল্লাল্লাহ বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হয়। যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মুহাম্মদের নাম জপ কর।"

(৩) বাইবেল ঃ

"পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন: কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না কিন্তু যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

(যোহন– জগৎ ও সত্যের আত্মাশীর্ষক পরিচ্ছেদ) ১৬/৭

উপরে বর্ণিত মহাবাণীগুলোর নিরিখে আমরা বাস্তব একটি ধারণায় আসলাম যে এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই এ মহান পয়গম্বর তাঁর শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেছিলেন। এ জন্যই তিনি চ্যালেঞ্জের বাণীসমূহ দিয়েছিলেন– যা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ্র নূর হতে সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদের নূর সৃষ্টি হয়। আর মুহাম্মদের নূর থেকেই পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদিত।

প্রথম ভুবনের এ সৃষ্টি রহস্যের একটি সুন্দর বর্ণনা পাচ্ছি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তাপস, মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (রাঃ) লেখনি হতে। তিনি লিখেছেন ঃ–

"আল্লাহ্ সমস্ত নবীদের নূর– নূরে মোহাম্মদী হইতে সৃজন করেন এবং আল্লাহ্ তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র নবীদের আত্মা পয়দা হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল ঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্"

অর্থাৎ–

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই– যাঁর প্রেরিত রসুল মুহাম্মদ (দঃ)।"

'অতঃপর আল্লাহ্ রসুলুল্লাহকে (দঃ) নামাযরত অবস্থায়– 'লাল আর্কিক'– পাথরে তৈরি একটি লণ্ঠনের মধ্যে বসাইয়া রাখেন। নবীদের আত্মাসমূহ নূরে মুহাম্মদীকে এক লক্ষ বৎসর কাল তওয়াফ (চতুর্দিকে ঘোরা) করিয়া আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।"[১]

[১]। মানব বংশধারা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন– "তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তোমরা মানবরূপে সমপ্রসারিত হইতেছ।"

(সূরা রু। ০ ঃ ২০। আয়াত-২০)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৃষ্টি তত্ত্বটি বড়ই রহস্যপূর্ণ। আমাদের ধারনা ছিল যে একটিমাত্র ভুবন। এ ভুবনেই সৃষ্টির যত খেলা এখানেই শুরু। এখানেই শেষ। এখন দেখছি তা নয়। এক ভুবন থেকে অন্য ভুবনে শুধু স্থানান্তর। নদীর জলপ্রবাহ যেখান থেকে শুরু হয় সেখানেই আবার গিয়ে মিলিত হয়।

প্রথম ভুবনের আর একটি রহস্যের কথা আমি ব্যক্ত করতে বাধ্য হলাম। এটা আমার নিজস্ব মতবাদ। নিজস্ব চিন্তাধারা।

আমরা আলেম, ওলামা, কবি, লেখক, সাহিত্যিক এতদিন বলে এসেছি যে আদম-হাওয়া নিষিদ্ধ গন্ধম ফল খাবার ফলে স্বর্গ হতে বিচ্যুত হয়ে এ পাপ পঙ্কিল পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁরা এ ভুল না করলে আমাদের এ পৃথিবীতে আসতে হতো না। সূরা বাকারা এবং অন্যান্য সূরা হতেও আমরা দেখতে পাই যে হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর নিষেধ অমান্য করেছিলেন। তাই আল্লাহর নির্দেশ হলো- 'তোমরা নিচে নামিয়া যাও।' আমার মনে হয় আদমেরও ভুল নয়। হাওয়ারও লোভ নয়। আল্লাহর নির্দেশ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই কেবল সাধিত হয়েছে এ ভুলের অছিলায়। আদম সৃষ্টির পূর্বেই এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এ সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সুশোভিত বৃক্ষলতা ও তরুরাজির সৃষ্টি। পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী সব কিছুর সমবায়ে যখন এ পৃথিবী বাসের উপযোগী হয়েছে ঠিক তখনি আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীর দুই প্রান্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হযরত আদমকে সন্দীপ এবং হাওয়াকে জেদ্দায়। যখন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না- ট্রেন-বাস-এরোপ্লেন তৈরি হয় নি, তখন কিভাবে কার সাহায্যে তাঁরা দু'জন একত্রে মিললেন এ তত্ত্ব কোন ধর্মগ্রন্থেই দেখতে পাই না। কোন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল না যে টেলিফোনে কথা বলে দু'জন মিলিত হবার আশায়, ইলেকট্রন-প্রটোনের মত আকর্ষণের বলে বিপরীতমুখী পথ ধরেছিল। শেষে একত্রিত হয়ে পরম উল্লাসে আবার বেহেশতের মত জীবন শুরু করলেন। কে অলক্ষ্যে থেকে এ খেলা খেলেছিল? কে তাদের রক্ষা করেছিল? কে তাদের দৈনন্দিন খাবার দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল? বিচ্ছেদ ও মিলনের এমন জীবন্ত নাটক কে দেখিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল? আছেন কি কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক, কোন তর্ক শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত যিনি এ ঘটনার তদন্ত করে এর কারণ, রহস্য ও প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেন?

আদমকে যদি শাস্তির জন্য স্বর্গচ্যুত করা হত তা হলে মহাশূন্যের মাঝে তিনি ঝুলে থাকতেন ফাঁসীর কঠিন কাঠগড়ায়। আল্লাহ-পাক তা করেন নি বরং তাঁর সুমহান ইচ্ছা পূরণ করতে আদমকে পাঠালেন এ পৃথিবীতে তাঁর সহধর্মীণীসহ যেন উত্তরকালে বংশ পরম্পরায় তাঁদের বীর্যে কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটে। এ মানুষের আত্মাসমূহ পৃথিবীতে আসার পর তৈরি হয় নি। হয়েছিল কোটি কোটি বছর পূর্বে প্রথম ভুবনে। আর রক্ষিত হয়েছিল সযত্নে প্রথম ভুবনের এক নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে।

হযরত আদমকে (আঃ) যদি এ পৃথিবীতে প্রেরণের ইচ্ছা আল্লাহর না থাকত তা হলে শয়তানের এ কুপ্ররোচনায় তিনি পড়তেন না। শয়তানেরও এ পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন ছিল না। এ পৃথিবী, এ আকাশ, এ বাতাস, এ চন্দ্র-সূর্য, কোন কিছুই তা হলে সৃষ্টি হত না। আল্লাহ্ এ কথা নিজেই বলেছেনঃ-[১]

(১) "হে মুহাম্মদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে কস্মিন কালেও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না।"

(২) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে এই পৃথিবীকেও সৃষ্টি করতাম না।

টীকা ঃ ১ । হাদিসে কদসী।

(৩) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে হে আদম, তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

(৪) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে আমি নিজে পালন কর্তারূপে প্রকাশ হতাম না।

(৫) আমি গুপ্ত ছিলাম। যখন চাইলাম নিজকে প্রকাশ করতে তখন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলাম তোমাকে।

হযরত আদম (আঃ) নবী হয়েও ভুল করবেন আর ভুল করেও দয়াময় আল্লাহর কাছে শত শত বছর কেঁদেও মাফ পাবেন না এটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। কেননা (৩) নং বাণী হতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি। আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হয়েছে বলেই এ বিশ্ব সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি জীবজন্তু ও তরুলতার সৃষ্টি আকাশ-নদী-সাগর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মূলে সেই পয়গম্বর শিরোমণি নবীকুল সম্রাট মানব ও জেন জাতির পথ প্রদর্শক, সৃষ্টির গৌরব, রহস্যের মূল নায়ক, প্রথম ভুবন, দ্বিতীয় ভুবন ও তৃতীয় ভুবনের নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

অদৃশ্য ভুবনের রহস্যময় তত্ত্ব ঃ

বিশ্বের খ্যাতি, সৃষ্ট বস্তুসমূহের আসল জ্যোতিঃ ও আর্শের গৌরব কেন হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) বলা হয় তার একটি নিগুঢ় তত্ত্ব দেখুন।

মানব আত্মাসমূহ সৃষ্টি করে আল্লাহ্-পাক তাদের প্রতি নির্দেশ দান করেন মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর দৃষ্টিপাত করতে।

'যে আত্মাসমূহ তাঁর পবিত্র মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল-তাঁরা রাজা, বাদশা। যাঁরা মুখমণ্ডলের দিকে তাঁরা ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সাধক। যাঁরা কর্ণদ্বয়ের দিকে তাঁরা সত্যের অনুসারী। যাঁরা নেত্রদ্বয়ের দিকে তাঁরা কোরআনের হাফেজ এবং ভ্রূদ্বয় দর্শনকারী ভাগ্যবান হন। গুণ্ডদ্বয় দর্শনকারী বুদ্ধিমান ও চরিত্রবা,-নাসিকা দর্শনকারী চিকিৎসক ও সুগন্ধি বিক্রেতাকারী,-ওষ্ঠদ্বয় দর্শনকারী রূপবান ও মন্ত্রী, মুখ-গহ্বর দর্শনকারী রোজাদার- দাঁত দর্শনকারী সুন্দর নরনারী- জিহ্বা দর্শনকারী রাজদূত,-গলা মুয়াজ্জিন, বক্তা ও পরামর্শদাতা হন।"

দাড়ি মুবারক দর্শনকারী মুজাহিদ, গ্রীবাদর্শক ব্যবসায়ী-বাহু দর্শক তীর ও তরবারী পরিচালক-ডান বাহুদর্শক নর সুন্দর, -বাম বাহু দর্শনকারী বীর ও জল্লাদ। ডান হাত দর্শক শিল্পী, বাম হাত দর্শক কয়াল, -উভয় হাত দর্শনকারী দানবীর ও বৈজ্ঞানিক, হাতের পিঠ দর্শক কৃপণ ও অসৎ, ডান হাতের পিঠ দর্শক ধোপা-বাম হাতের পিঠ দর্শক কাঠুরিয়া -ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ দর্শক দরজী-বাম হাতের আঙ্গুলের পিঠ দর্শক কর্মকার, -বক্ষদেশ দর্শনকারী আলেম, চিন্তাবিদ এবং কৃতজ্ঞ; পিঠ দর্শক ধর্মানুরাগী ও কপাল দর্শক গাজীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হাটুদ্বয় দর্শক রুকু সেজদাকারী, -পদদ্বয় দর্শক শিকারী, পদতল দর্শক পর্যটক-ছায়া দর্শক গায়করূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'[১]

রহস্যপূর্ণ এ তত্ত্ব হতে নিশ্চয়ই চিন্তাশীল পাঠক বুঝতে পারবেন কেন আমি বলেছি যে আদম (আঃ) ভুল করে স্বর্গচ্যুত হয়নি-বিবি হাওয়াও ভুল করেনি -এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পুর্বে যখন এমন সব ঘটনা ঘটেছিল তখন কিভাবে বলব আদমের ভুলে আমাদের এ পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। এ সব চিন্তার অবসান ঘটে সৃষ্টিকর্তার একটি মাত্র বাণীতেঃ-"ইন্নি আলামুনা মা লা তায়ালামুন" (কোরআন)।

অর্থাৎঃ- 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

এবারে আসুন এই মূল সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী ধরে আরও কিছু মূল্যবন তত্ত্ব সংগ্রহ করি।

টীকা ঃ ১ । সংগৃহীত-দাকায়েকুল আখবার -By ইমাম গাজ্জালী। তর্জমা-আবদুল জলিল। পৃ নং ২

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৃষ্টির প্রারম্ভ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ-

"কানাল্লাহু ওয়া লাম ইয়াকুন শাইয়ুন গাইরুহু ওয়া কানা আরশুহু আলাল মায়ে ওয়া কাতারা, ফি জেক্‌রে কুল্লু শাইয়েন ওয়া খালাকা সামাওয়াতে ওয়াল আরদা।"[১]

অর্থাৎ,

"আল্লাহ ছিলেন অন্য কিছুই ছিল না তিনি ভিন্ন এবং তাঁহার আরশ ছিল জলের ওপরে এবং তিনি লিখিলেন সব কিছু সুরক্ষিত গ্রন্থে এবং সৃষ্টি করিলেন আকাশ সমূহ ও পৃথিবী।"

রসুল (দঃ) - এর বাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ছিলেন এবং অন্য কোন বস্তু বা প্রাণীই ছিল না জল ভিন্ন। এই জলের ওপরই ভাসমান ছিল আল্লাহর আরশ বা পবিত্র আসন।

জল কিভাবে তৈরি হলো, এর ওপর আরশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বইবা কিরূপে স্থান লাভ করল এর কোন সমাধা এ বাণীতে নেই। তাই এর ওপর চিন্তা করা নিরর্থক। কেননা যে মহান বৈজ্ঞানিক অদৃশ্য বিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে আমাদের নিয়ে পৌছালেন তিনি নিশ্চয়ই এ জ্ঞানলাভ করেন নি। অথবা করে থাকলেও ব্যক্ত করেন নি এই অর্থে যে সামান্য সৃষ্ট জীবের মস্তিষ্কে এ কঠিন চিন্তাধারা সহনশীল হবে না। বিকৃত করে নিজ অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাবে।[২] শুধু এটুকুই জানা দরকার যে সৃষ্টি সমূহের আদিমূলে রয়েছেন এক মহান স্রষ্টা যিনি 'আল্লাহ'-একমাত্র উপাস্য।

যখন কোন বস্তুই ছিল না তখন একমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব ছিল জল। এ জল থেকেই সৃষ্টি শুরু। এ জন্যই জলকে বলা হয় জীবন। যে বস্তুর মাঝে জলের কোন অস্তিত্ব নেই সে বস্তু নির্জীব বা প্রাণহীন। প্রকৃতির বিস্ময় এ জল। এর ওপর আমি বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের তৃতীয় অংশে রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এ আলোচনা করেছি।

এ মহবিশ্ব সৃষ্টির একটি পরিকল্পনা আল্লাহর ছিল। এটা বুঝা যায়-উপরে বর্ণিত বাণীর মধ্যাংশ হতে যেখানে বলা হয়েছে-**'তিনি লিখিলেন সব কিছু সুরক্ষিত গ্রন্থে।'**

সুরক্ষিত গ্রন্থ বলতে আমরা কোন্‌টাকে ধরে নেব? আল্-কোরআন? জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল (বাইবেল), জেন্দাবেস্তান না অন্য কোন্ গ্রন্থ? মুসলমানগণ এক বাক্যে বলবে-'কোরআন'। এর যুক্তিযুক্ত প্রমাণও রয়েছে। কেননা কোরআনকে গ্রন্থসমূহের জননী বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ- এটাই একমাত্র গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্যদান করে। তৃতীয়তঃ- এটা আর্শে যেমন সুরক্ষিত ছিল[১] (বাল্‌হুয়া কোরআনও মাজিজ্জন-দি লাওহে

টীকা ঃ ১ সহীহ বুখারী। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। তর্জমাঃ- আবদুর রহমান। হাঃ নং ২/১৭৩।

২ । রসুল বলেছেনঃ- "আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর কিন্তু অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিও না।" -(সগীর)

টীকা ঃ ১ । আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ- 'বরং উহা মহিমান্বিত কোরআন যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে।' (সূরা বোরুজ আঃ -৮৫)

এত সুরক্ষিত গ্রন্থ যে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই লিখিত হয়েছিল তার প্রমাণ রসুলের নিম্নোক্ত বাণী। তিনি বলেছেনঃ-

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির হাজার বছর আগে সূরা তা হা এবং ইয়াসিন পাঠ করেছিলেন। যখন ফেরেস্তারা উহা শ্রদবণ করেলেন তখন বললেন-"সেই জাতিই সুখী যাদের জন্য উহা নাজেল হবে। সেই হৃদয়গুলিই সুখী যাহা উহা ধারণ করবে এই সেই জিহ্বাগুলিই সুখী যাহা তদানুসারে কথা বলবে।"

(সংগৃহীত-হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড)

মাহফুজ) কোটি কোটি বছর পরে আজও তাই আছে। সৃষ্টি যতদিন থাকবে এ কোরআন ততদিনই থাকবে। পরেও থাকবে। এর নকল আজও বের হয় নি। যারা কাটছাঁট করে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে তারাই ব্যর্থ হয়েছে এবং মানব সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আজই আল্-মদিনা পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি হতে জানতে পারলাম রোমের রাষ্ট্রদূতকে ইহুদিদের অর্থে মুদ্রিত বহু সংখ্যক কোরান উপহার দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৬৮টি আয়াত সম্পূর্ণই তিরোহিত করা হয়েছে আর অনুরূপ আয়াত সন্নিবেশিত করেছে। ইহুদিদের এ জঘন্যতম স্বভাব আজকের নয়। রসুলের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই ছিল। আজও আছে এবং চিরদিনই থাকবে। কোনদিনই এরা কৃতকার্য হতে পারে নি। এবারও ধরা পড়েছে। দুনিয়ার মানব জাতির কাছে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত হয়েছে।

কোরআন সুরক্ষিত গ্রন্থ নামেই পরিচিত। এর রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ্ স্বয়ং নিজেই করেছেন এবং করবেন। এটা তাঁরই ঘোষণা। এটার অলৌকিকত্ব এখানেই যে এটা আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। রসুলুল্লাহর (দঃ) সময় থেকেই শুরু হয় এক শ্রেণীর মুসলমান যারা এ কোরআনকে সম্পূর্ণ রূপেই মুখস্থ করতে পেরেছিলেন। তারপর কত কোটি কোটি হাফেজ জন্মলাভ করেছেন তার হিসাব নেই। অথচ কারো সঙ্গে কারো কোন গরমিল একটি শব্দেও দেখা যায় নি। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সংযোজন করে নি বা কাটছাঁট করেও মুখস্থ করে নি। এ ধারা আজও চলে আসছে এবং চলবে। লক্ষ লক্ষ হাফেজখানায় কোটি কোটি কোরআন আবৃত্তিকারী তৈরি হচ্ছে। এখান থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ নিজেই এর সংরক্ষক বা হেফাজতকারী। কার সাধ্য তা বিকৃত করে? ইহুদিদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি সজাগ প্রবৃত্তির আঘাতেই এ ধরা হতে বিলীন হয়ে যাবে।

এই কোরআনকে বিকৃত করা বা এতে নতুন শব্দ যোজনা করে অনুপ্রবেশের জঘন্যতম প্রচেষ্টা যে কোন কালেও ফলবতী হবে না তার কারণ এর প্রত্যেকটি সূরা, আয়াত ও শব্দগুলো এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে এর মধ্য হতে একটি শব্দ বাদ পড়লে বা এতে নতুন শব্দ সংযোজনা করলে ভাষা, ভাব, অর্থ সব কিছুই গরমিল হবে। প্রকৃত উদ্দেশ্যও চাপা পড়বে। এককথায় বলতে হয় এর চেইন ছিঁড়ে যাবে। আর তখনি তা ধরা পড়বে। আল্লাহর বাণী আর মানুষের সাজানো কথা এক হতে পারে না। প্লাস্টিকের তৈরি ফুল ও আসল সৃষ্টি ফুলে যে পার্থক্য তদোনুরূপই হবে। গন্ধ বিকিরন করবে না। ভ্রমরও এতে আসবে না। মৌমাছিও মধু সংগ্রহ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ- জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা কোরআনকে বিকৃত করার হাত থেকে রক্ষা করতে Mathemetical procedure adopt করেছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমনঃ- কোরআনে মোট ১১৪ টি সূরা বা শ্লোক। ৩০পারা বা অধ্যায়। ৬৬৬৬ টি বাক্য বা আয়াত। ৭৬৪৩০টি শব্দ এবং অক্ষর সংখ্যা ৩,২৩,৬২১।

আল্লাহর কোরআন যে সুরক্ষিত -আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যামান এ কথা শুধু মুসলমান হিসাবেই আমি বলছি না অমুসলমানদের মধ্যেও বিশ্বের নাম করা ঐতিহাসিক, 'Muir'-সাহেব তাঁর লিখিত Life of Mahammad-পুস্তকের Preface -এ লিখেছেনঃ-

"There is probably in the world no other book which has remained twelve centuries with so pure at test."

অর্থাৎ-"পৃথিবীতে সম্ভবত আর একখানা গ্রন্থও এরূপ নেই (কোরআনের মত)-যা বিশুদ্ধরূপে বার-শ বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।"

এই সুরক্ষিত মহাগ্রন্থ 'আল-কোরআন'-যে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই লিখিত হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ মেলে হযরতের নিম্নে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বাণীতেঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির হাজার বছর আগে সূরা 'তা-হা' এবং সূরা 'ইয়াসিন'-পাঠ করেছিলেন। যখন ফেরেশতারা উহা শ্রবণ করলেন তখন বললেন –সেই জাতিই সুখী যাদের জন্য উহা নাজিল হবে–সেই হৃদয়গুলিই সুখী যাহা উহা ধারণ করবে। এই সেই জিহ্বাগুলিই সুখী যাহা তদানুসারে কথা বলবে।"[১]

এই ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা শুধু মুসলমানের জন্যই নয় সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বসম্প্রদায়ের মানব গোষ্ঠীর জন্যই। তাই পূর্বে প্রেরিত সমগ্র ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাই রয়েছে আল-কোরআনে। এজন্যই মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ইহা সংযোজিত সংরক্ষিত ও সহজলভ্য।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। যেগুলো বর্তমানে আছে সেগুলোও আমাদের কাছে মূল্যবান সম্পদ। এগুলোও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট আদৃত ও পবিত্র। কিন্তু কতদিন সুরক্ষিত থাকবে এবং অবিকৃত অবস্থায় আমাদের জ্ঞানদান করবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা আমরা ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যে বাইবেলের মত অতি পবিত্র গ্রন্থও রোমান ও ক্যাথলিকদের দ্বন্দ্বে অনেক স্থলে রূপ পরিবর্তন করেছে। অনেক পুরোহিত নিজের বাহাদুরী দেখাতে তাঁর নিজস্ব কথাও সংযোজন করেছে। নিম্নের উদ্ধৃতি এর প্রমাণ।[২]

"বিশপ Fuscbious লিখেছেনঃ-

I have related whatever might be rebounded to the glory and have suppressed all that could tend to the disgrace of our religion."

অর্থাৎ

"যা কিছু আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে সে সকল আমি বাইবেলে সন্নিবেশিত করেছি এবং যা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব হানি হতে পারে সে সকলকে আমি গোপন করেছি।"

St. Paul বলেছেনঃ-[৩]

"কিন্তু আমার মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের সত্যের গৌরব যদি বৃদ্ধি পায়-, তবে আমিও বা পাপী বলে বিচারিত হব কেন?"

Casaubon (ক্যাসাউবন) লিখেছেন ঃ-[১]

"এবং যখনই দেখা যেত যে নতুন নিয়ম বা বাইবেল পুরোহিতদের স্বার্থ বা তাদের দলের রাজনৈতিক শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হচ্ছে না তখনই তা আবশ্যক মত পরিবর্তন করা হতো এবং শুধু যে-সকল প্রকার সাধুতার জুয়াচুরি বা জালিয়াতি করাই সাধারণ হয়ে পড়েছিল তা নয়, বরং অনেক পুরোহিত কর্তৃক তা ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণও করা হয়েছিল।"

তবুও ভাগ্য ভাল যে এখনও যা আছে তা অমূল্য রত্নস্বরূপ। কতদিন থাকবে–কে জানে? কেননা এ পবিত্র মহাগ্রন্থের হাফেজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবৃত্তিকারী কোন পুরোহিত, যাজক বা ইহুদি -খ্রীষ্টান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি একটিও আছেন কিনা আমি জানি না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অবস্থাও ঠিক তাই। ভগবত গীতা, পুরান হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ একটিও নির্ভেজাল নয়। হিন্দু লেখক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের **'পাগলা ঝোরা'** গ্রন্থে

টীকা ঃ ১ । হাদিস। সংগৃহীত তাদিসের আলো। ১ম খণ্ড কৃত আজহার উদ্দিন।

২ । একমেবাদ্বিতীয়ম পুস্তক হতে। কৃত মোঃ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ. বি. টি. (ভারত)

৩ । ইঞ্জিল। নতুন বাইবেল–রোমীয়–পাপাধীনতায় সর্বাধিক দুরাবস্থা পরিচ্ছেদ

১ । সংগৃহীত। একমেবাদ্বিতীয়ম পুস্তক হতে।

কৃত-মোঃ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ.বি. টি. (ভারত)

'গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ' পরিচ্ছদ এবং সত্য-সাধক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়াণ ঘোষাল-এর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ **'আলোক তীর্থ'** ও **'আলোক বন্দনা'** এর প্রমাণ।

যুগে-যুগে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীর হাতে পড়ে এ ধর্মগ্রন্থগুলিতে ইচ্ছামত সংযোজন হয়েছে। এ ছাড়া কদর্য ও বিকৃত কাহিনীর পরিবেশনা করে ধর্মকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ আছে ধার্মিক নাই। ধার্মিক আছে আবৃত্তিকারী নাই। যে যতটুকু আবৃত্তি করে ততোটুকু তাঁর সম্বল। এর বেশি নয়। কোন দৈব দুর্বিপাকে যদি একবার ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের মত লক্ষ লক্ষ হাফেজের সামাবেশে যেমন কোরআন আবার তৈরি হবে তেমনি অন্য কোন গ্রন্থ নিয়ে আশা করতে পারি না।

যা হোক ধরলাম যবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেল, বেদ, জিন্দাবেস্তা এবং কোরআন যেগুলো আজও আছে সে সব গ্রন্থগুলো কর্তৃক এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই লিখিত হয়। কলমকে এ নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছিলেন–বিশ্ব সৃষ্টির আদি–অন্তের যাবতীয় তত্ত্ব গ্রন্থসমূহে লিখতে। এ জন্যই কলমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। আদি, অন্ত, দৃশ্য, অদৃশ্য, জানা-অজানা, চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রেম, মায়া, দয়া, ভালোবাসা, ঘৃণা, হিংসা এমন কিছু নেই যে কলম লিখতে পারে না। কলম জ্ঞানের ভাণ্ডার একত্রিত করে, মানুষে-মানুষে পরিচয় ঘটায়, ভবিষ্যতের রূপরেখা, পরিকল্পনা ছবির ন্যায় ভাসিয়ে তোলে। কলমের মাহাত্ম্য কতটুকু এ কথা সারা জীবন লিখেও কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। এ শক্তি কারো নেই। মহাসাগরের প্লাবন যা না ঘটাতে পারে, ঘূর্ণীঝড়ের তাণ্ডবলীলা যা না করতে পারে,–অমৃতসুধা যে যৌবন দানে ব্যর্থ হয়,–কামান -বন্দুক-জেটবিমান যে দুর্ঘটনা না ঘটাতে পারে–কলম তা পারে। এ জন্যই কলমকে মানুষ এত ভয় করে। এত শ্রদ্ধা করে। কলম না থাকলে দুনিয়া হতো নিশ্চুপ। জ্ঞান থাকত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চির নিদ্রায়। এ জন্যই কলম লিখেছে সুরক্ষিত গ্রন্থে ঃ

"এক্‌রা বে-ইস্‌মে রাব্বেকাল্লাজি খালাক। খালাকাল এনসানা
মেন্ আলাক। এক্‌রা ওয়া রাব্বুকাল এক্‌রামাল্লাজি আল্লামা বেল
'কালাম'। আল্লামান এনসাা **মা-লাম ইয়ালাম**।"[১] (৯৬ ঃ ১-৪)

অর্থাৎ

"পাঠ কর সেই মহাপ্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর সেই মহা মহিমান্বিত প্রভুর নামে যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যা মানুষ জানিত না।"

উপরের বাণীটি স্বয়ং আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর প্রিয়তম রসুলকে (দঃ) শিক্ষা দিচ্ছেন ঐ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের মাধ্যমে যেন চিরদিন তা স্মৃতিপটে জাগরুক থাকে। শুধু তাই নয় মুখ দ্বারা উচ্চারণ করে নিচ্ছেন যেন হযরতের ইন্দ্রিয়সমূহ তা শুনতে, বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে তাঁর সৃষ্টিকর্তা একজন–যিনি বীর্য হতে এমন সুন্দর আকৃতি -প্রকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করতে জানেন। এ মানুষ শিক্ষা লাভ করে কলমের মাধ্যমে–যা সে কোনদিনই জানত না।

কলম এ মহাগ্রন্থ লেখবার পর তা সংরক্ষিত হলো এক নিরাপদ স্থানে (লাউহে-মাহফুজ)। এরপর আল্লাহ্ হাত দিলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে। গ্রন্থ লেখবার কতদিন পর সৃষ্টি শুরু হলো। এ তত্ত্ব কেউ জানে না আল্লাহ্ ভিন্ন। তাই এর ওপর আলোচনা না করে সৃষ্টি প্রারম্ভের কিছুটা আলোচনা করছি। কেননা হযরতের যে বাণী নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করছি তার শেষোক্ত লাইনটি ছিল এই ঃ

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা আলাক। আয়াত ১-৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং সৃষ্টি করিলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী"

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ঃ

আমার রচিত 'বিজ্ঞান না কোরআন?'–পুস্তকে সৃষ্টিতত্ত্ব পরিচ্ছেদে এর ওপর কিছুটা আলোচনা করেছি। সেখানে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে আকাশমণ্ডলীর অস্তিত্ব রয়েছে। শূন্য–মহাশূন্য নয়। স্তরে স্তরে আমাদের মাথার ওপর বিদ্যমান। এ স্তর শুধু গ্যাসীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়–কঠিন স্তরেও বিদ্যমান। প্রতিটি স্তরেরই একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরের মধ্যে যে মহাশূন্য বিরাজমান তারও একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা আছে। প্রথম স্তরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সুনির্দিষ্ট কক্ষসমূহের ওপর সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তন করছে এবং দিবা-রাত্রির বিকাশ ঘটাচ্ছে। প্রথম স্তর ভিন্ন অন্য কোন স্তরে যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র নেই তার প্রমাণ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন তাঁর মহাবাণীতে এই বলেঃ-

"ইন্না যাইয়েন্না সামায়া-দুনিয়া বেজিনাতে নেল কাওয়াকেব।"[১] (৩৭ ঃ ৬)

অর্থাৎ,

নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর আকাশকেই গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"

আকাশের যে সীমা রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা রয়েছে তারও তত্ত্ব দিয়েছে কোরআন। সেখানে বলা হয়েছেঃ-

(১) **"ওয়া সামা'য়া রাফায়াহা শয়া ওয়াদালা মিজান।"**[২] (৫৫ঃ ৭)

অর্থাৎ,

"এবং নভোমণ্ডল তিনি উহাকে সমুচ্চ করিয়াছেন এবং তিনি তুলাদণ্ড প্রচলিত করিয়াছেন।"

(২) **"আফালা ইয়ানজুরুনা এলাল এবেলে কায়ফা খুলিফাত ওয়া এলা সামায়ে কায়ফা রুফিয়াত।**[৩] (৮৮ ঃ ১৭-১৮)

অর্থাৎ,

"তবে কি তাহারা উষ্ট্রপালের দিকে লক্ষ্য করে না যে কিরূপে উহা সৃষ্টি হইয়াছে? এবং আকাশের দিকে কিরূপে উহা সমুচ্চ করা হইয়াছে?"

(৩) **"খালাকা সাবয়া সামাওয়াতিন তিবাকান।"**[৪] (৬৭ ঃ ৩)

অর্থাৎ,

"তিনিই স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ নির্মাণ করিয়াছেন।"

(৪) **"ওয়া জায়ালনা সামা'য়া ছাক্‌ফাম মাহাফুজান।"**[৫] (২১ ঃ ৩২)

অর্থাৎ,

"এবং আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি।"

উপরে উদ্ধৃত বাণীসমূহ হতে আমরা স্পষ্ট একটা ধারণা করতে পারি যে, আকাশ শুধু মহাশূন্যই নয়–এর সাতটি স্তর রয়েছে। এই স্তরগুলো কঠিন স্তর। সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ। ছাদ থাকার অর্থই দূরত্বের পরিমাপ। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) -এর নভোভ্রমণ এর বাস্তব প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)–তৃতীয় খণ্ডে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা সাফ্‌ফাতায়াত ৬
২ । ঐ " রহমান। " –৭
৩ । ঐ " গাশিয়া। " –১৭-১৮
৪ । ঐ " মুলক। " –৩
৫ । ঐ " আম্বিয়া। " ৩২

এখন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে আর দু'টি জটিল প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসেঃ-

প্রথমঃ- আকাশ ও পৃথিবীর কোনটি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে?

দ্বিতীয়ঃ-এ সৃষ্টিতে মোট কতদিন সময় অতিবাহিত হয়েছে?

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর অর্পিত পবিত্র মহাবাণী আল্-কোরআনে বলা হয়েছেঃ-

"হুয়াল্লাজি খালাকা-লাকুম মা-ফিল্ আরদে জামিয়ান। সুম্মাছ-তাওয়া এলা সামায়ে ফাসাউহুন্না সাবয়া-সামাওয়াতিন। ওয়া হুয়া বে কুল্লে শাইয়েন আলিম।" (২ ঃ ২৯)

অর্থাৎ,

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপরে তিনি আকাশের প্রতি অভিনিবেশ করিলেন–অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করিলেন।"

আমরা অন্য কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা আল্লাহ্‌র বাণীর ওপর আর কোন বাণী নেই। তবুও যদি কেউ মনে করেন যে এর অর্থ অন্যরূপ হতে পারে তবে সেটা পরিষ্কার করার জন্য বাইবেলের সাহায্য নিতে পারি। কেননা এটাও পবিত্র মহাগ্রন্থ–আল্লাহ্‌র বাণী। এর পূর্বে আমরা কোরআন থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বাইবেলের বাণী পেশ করব।

"কুল আয়েন্নাকুম লা-তাকফুরুনা বেল্লাজি খালাকাল আরদা ফি-ইয়াও-মাইনে ওয়া তাজালুনা লা-হু আনদাদান। জালেকা রাব্বিল আলামিন। ওয়া জায়ালা ফিহা রাওয়াসিয়া মিন ফাওকিহা ওয়া বারাকা ফিহা ওয়া কাদ্দারাৎ ফিহা আক্‌ওয়াতাহা ফি-আরবায়াতে আইয়ামেন। সাওয়ায়া লেল্ সায়েলীন। সুম্মাছ-তাওয়া এলা সামায়ে ওয়া হুয়া দুখানুন। ফা-কালা-লাহা ওয়া লেল আরদে তিয়া তাওয়ান আওকারহান। কালাতা আতায়না ত্বায়েয়িন। ফাকাদাহুন্না ছাবয়া সামাওয়াতিন ফি ইয়াওমাইনে ওয়া আওহা ফি কুল্লে সামায় আমরাহা। ওয়া জাইয়েন্না সামায়াদ্দুনিয়া বে-মাসাবিহা ওয়া হেফজান। জালেকা তাকদিরুল আজিজুল আলিম।"[১]

অর্থাৎ,

"তুমি বল–তোমরা কি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ–যিনি **দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন** এবং তোমরা কি তাঁহার সাদৃশ্য স্থির করিতেছ? এইত বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। এবং তিনি তন্মধ্যে উহা হইতে সমুচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চারি দিবসে তন্মধ্যে উহার উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারিত করিয়াছেন; জিজ্ঞাসুগণের জন্য ইহা সমতুল্য। তৎরপ তিনি আকাশের দিকে মন সংযোগ করিলেন এবং উহা ধূমাকৃতি; অতঃপর তিনি উহার জন্য ও পৃথিবীর জন্য বলিয়াছেন–তোমরা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সহিত উপস্থিত হও; তদুভয় বলিয়াছিলেন–আমরা সানন্দে উপস্থিত হইতেছি। অনন্তর তিনি **দুই দিবসের মধ্যে সপ্ত আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন** এবং প্রত্যেক আকাশে উহার কার্য সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করিয়া দিলেন; এবং আমি **পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ পুঞ্জদ্বারা সুশোভিত** ও সুরক্ষিত করিয়াছি। ইহাই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ।"

উপরে উদ্ধৃত বাণীসমূহ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে **পৃথিবীকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে**। এরপর সপ্ত আকাশ নির্মাণ করা হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টিতে মোট ৪ (চার) দিন সময় অতিবাহিত হয়েছে। আর সপ্ত আকাশ সৃষ্টিতে মোট ২ (দুই) দিন এই সর্বমোট ৬ (ছয়) দিন সময় লেগেছে। কিছু একটু খট্‌কা

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা হা-মিম। আয়াত ৯-১২ (৪১ ঃ ৯-১২)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবুও মনে বিরাজ করছে হা-মিম সূরার প্রথম কয়েকটি লাইনে। পৃথিবী সৃষ্টিতে প্রথমে ২ দিন বলা হয়েছে। পরে আবার ৪ দিনের উল্লেখ আছে। যদি দুটোই ধরে যোগ করা যায় তাহলে পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ৬ দিন সময় লাগে। কিন্তু তা নয়। শেষোক্ত চার দিনই সর্বমোট পৃথিবী সৃষ্টির সময়। প্রথম ২ দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ আর পরবর্তী ২ দিনে পাহাড়-পর্বত সংস্থাপন, বৃক্ষলতা, তরুরাজি, জীব-জন্তু, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি সৃষ্টিতে সময় লেগেছে। এই মোট ৪ (চার) দিন তাহলে দেখা যায়, আকাশ-পৃথিবী অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মোট সময় 'ছয় দিন'।

আমার এ ব্যাখ্যা অনেকেই হয়ত মানতে রাজি হবেন না। আল্লাহ্ আমাদের জ্ঞানদান করার জন্য তাঁর মহাবাণী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেই শিখিয়েছেন। শেষ ধর্মগ্রন্থ কোরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল সব প্রশ্নেরই সমাধান দিয়েছে। যেগুলো আমাদের নিকট অস্পষ্ট বলে মনে হয়। সেগুলোর ব্যাখ্যা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মুখ-নিঃসৃত বাণীতে মেলে। এ ছাড়া পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহেও উল্লেখ রয়েছে সুন্দর বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এগুলো আমরা পরে আলোচনা করছি। এর পূর্বে দেখি কোরআনে **'ছয় দিবসে'** বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলেছে কিনা। সূরা সেজদায় ৪নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ-

"আল্লাহ্-ল্লাজি খালাকা সামাওয়াতা ওয়াল্ আরদা ওয়া মা-বায়নাহুমা ফি ছিত্তাতে আইয়ামেন। সুম্মাস্-তাওয়া আলাল আরশে।"[১]

অর্থাৎ,

"তিনিই আল্লাহ্ -যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা **'ছয় দিবসে'** *^ –সৃষ্টি করিয়াছেন; তৎপর আর্শ-উপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।"

এমন কিছু নেই যার সমাধান কোরআনে পাওয়া যায় না। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এর আয়াত বা শ্লোকগুলো একই সূরাতে নেই। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন সূরার মাঝে সন্নিবেশিত। তাই অনেক সময় সংগ্রহ করে নিতে হয়। মৌমাছি যেমন বিভিন্ন ফুলে বসে মধু সংগ্রহ করে মৌচাক ভর্তি করে, বিরক্তবোধ করে না পরিশ্রম করতে–তেমনি জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা জ্ঞান সংগ্রহ করতে ক্লান্ত হয় না। পথে-ঘাটে, মাঠে, পাহাড়ে, সাগরে যেখানেই যা পায় সেখান থেকেই তাঁর পিপাসা দূর করে হয়ত এ অর্থেই আল্লাহ্ -পাক তাঁর বিশ্লেষণ-যোগ্য বাণীগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ের মাঝে অতি কৌশলে। পরিশ্রমলব্ধ অর্থ যেমন মূল্যবান, পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানও তেমনি মূল্যবান। কোরআন থেকে এমন সব সম্পদ সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা আজ পরম উল্লাসে নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার ভর্তি করছেন। আর আনন্দে তা কাঙ্গালীদের বিলিয়ে দিচ্ছেন। এ জন্য আমরাও ধন্য। তাঁদের কাছে ঋণীও।

সৃষ্টির আদিতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সংঘবদ্ধ ছিল। এদেরকে আল্লাহ্ বিচ্ছিন্ন করে বিশ্বসৃষ্টিতে হাত দেন। এই তত্ত্বটি মেলে তাঁরই বাণী হতে যা নিম্নরূপ ঃ

"আওয়ালাম ইয়ারাল্লাজিনা কাফারু-আন্না সামাওয়াতে ওয়াল আরদা কানাতা রাফাতান ফাফাতাকনাহুমা ওয়া জায়ালনা মিনাল মা'য়ে কুল্লা শাইয়েন হাইয়েন। আফালা ইউমেনুন। ওয়া জায়ালনা ফিল আরদে রাওয়াসিয়া আন্ তামিদাবেহিম।"[১]

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা সেজদা। আয়াত ৪ (৩২ ঃ ৪)

*^ স্বর্গীয় ১ দিন= পৃথিবীর ১ হাজার বছর। স্বর্গীয় ৬ দিন=পৃথিবীর ৬ হাজার বছর

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা আম্বিয়া। আয়াত ৩০-৩১।

অর্থাৎ,

'তবে কি অত্যাচারকারীরা লক্ষ্য করিতেছে না যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সংঘবদ্ধ ছিল। তৎপর আমি উভয়কেই প্রযুক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক চেতন পদার্থকে সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তবুও কি তাহারা বিশ্বাস করিবে না? এবং আমি এজন্য ভূতলে পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহা তৎসহ আন্দোলিত না হয় (নড়চড় না করে)।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বাণী। এর ওপর আমি **'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'** পুস্তকের প্রথম খণ্ডের রসায়নবিজ্ঞান পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। জর্জ গ্যামো এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের আকাশ সৃষ্টির ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি।

পৃথিবীর বক্ষে পর্বতসমূহ সংস্থাপন করে কিভাবে মহাশূন্যের মধ্যে আল্লাহ্-পাক দোলন বা ঘূর্ণনের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের জন্য আরামপ্রদ ও স্থির বাসস্থানরূপে তৈরি করেছেন তা বিশ্লেষণ করার মত বুদ্ধি আমাদের নেই তবুও বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় আমরা আলোচনায় রত হয়েছি। আমার রচিত **'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'** পুস্তকে এর ওপর ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে। এর বিষয়বস্তু শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন খবরের কাগজে, রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে। ১৯৭৮ সনের ডিসেম্বর মাসে বিবিসি থেকেও অন্যান্য ৩ জন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এ লেখকের নামটিও প্রচার করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের বাণীগুলো ভুল হতে পারে না। চিরকালের জন্যই তা সত্য। আর এ সত্যই আজ ধরা পড়েছে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে। এদের কোন হিংসা নেই। জাত-বিজাতের প্রশ্ন নেই। যেখানে বিজ্ঞান সেখানেই বৈজ্ঞানিক। যেখানে দর্শন সেখানেই দার্শনিক। যেখানে জ্ঞান সেখানেই জ্ঞানী।

মহান ব্যক্তিরা আসুন, –কোরআন ও বাইবেল পাশাপাশি নিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের আদি রূপ দেখে আদি সৃষ্টিকর্তার কাছে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে প্রার্থনা করি আমাদের জ্ঞানদান করতে।

পবিত্র বাইবেল

(আদি পুস্তক-পরিচ্ছেদ। ১ম অংশ)

জগৎ সৃষ্টির বিবরণঃ

১। ১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

২ পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে অবস্থিতি করিতেছিল।

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

৪ পরে ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

৫ আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস আর অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইল প্রতম দিবস।

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুইভাগে পৃথক করুক।

৭ ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল।

৮ পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **'দ্বিতীয় দিবস হইল'**।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

১০ তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে —তাহা উত্তম।

১১ পরে ঈশ্বর কহিলেন–তৃণবীজ উৎপাদক ঔষধি ও সবীজ স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির ওপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

১২ ফলতঃ ভূমি, তৃণ, স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী বীজ উৎপাদক ঔষধি, স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে–সে সকল উত্তম।

১৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **তৃতীয় দিবস হইল।**

১৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক;

১৫ এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

১৬ ফলতঃ ঈশ্বর দিনের ওপরে কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির ওপর কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এক **জ্যোতিঃ–এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন।**

১৭ আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির ওপর কর্তৃত্ব করণার্থে এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে।

১৮ ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃ সমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।

১৯ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **চতুর্থ দিবস হইল।**

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হউক এবং ভূমির উর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষীগণ উড়ুক।

২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানাজাতীয় জঙ্গমে প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।

২২ আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হউক।

২৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে **পঞ্চম দিবস হইল।**

২৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন ভূমি নানাজাতীয় প্রাণীবর্গ, অর্থাৎ স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

২৫ ফলতঃ ঈশ্বর স্ব-স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেনঃ আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের ওপরে, পশুগণের ওপরে, সমস্ত পৃথিবীর ওপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের ওপরে কর্তৃত্ব করুক।

২৭ **পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন।**

২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর।

২৯ ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজ, উৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।

৩০ আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমণশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।

৩১ পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন আর দেখ সে সকলই উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রতঃকাল হইলে **ষষ্ঠ দিবস হইল।**

২। ১ এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তু ব্যূহ সমাপ্ত হইল।

২ পরে ঈশ্বর **সপ্তম দিনে**–আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন- কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

বাইবেলে বর্ণিত প্রথম পরিচ্ছেদের মাঝে **'ছয় দিবসের'** ধারাবাহিক সৃষ্টির একটা রূপ পেলাম। এখান থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। কোরআনের বাণীর সঙ্গে বাইবেলের বাণীগুলোর মিল রয়েছে। ছয় দিবসে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। সপ্তম দিবসে সৃষ্টিকর্তা বিশ্রাম নিয়েছেন। কোরআনের ভাষায় –'সুম্মাস্ তাওয়া আলাল্ আরশে'–অর্থাৎ তৎপর তিনি 'আরশে'– সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কোরআন ও বাইবেল থেকে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জানতে পারলাম যে আকাশ ও পৃথিবী সংঘবদ্ধ ছিল। পৃথিবী জলের ওপর ভাসমান ছিল। আর আকাশ ছিল ধূমাকৃতিতে। জল থেকেই সমগ্র চেতন প্রাণীর এককথায় দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাবতীয় বস্তু যাদের প্রাণ আছে তারা জল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভায় সুশোভিত করা হয়েছে। অন্য কোন আকাশে চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ নেই। অনেক তত্ত্ব যা বিজ্ঞানীরা দিতে জানে না তা মিলল। এর সবগুলো কথাই কোরআনে রয়েছে। সূরা নূর, সুরা হাশর, সূরা লোকমান, সূরা বকর, সূরা ইয়াসিন, সূরা নহল, সূরা রুম ইত্যাদিতে মেলে। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা আরও অজানা গভীর তত্ত্ব খুঁজে পাই। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের ১ম খণ্ডে (পরবর্তীতে ৩য় খণ্ডে) 'রসায়ন বিজ্ঞান'– পরিচ্ছেদে **'বিশ্ব প্রারম্ভ'** ও **'বিশ্ব ধ্বংস'** প্রকল্পে দেখিয়েছি। আগ্রহশীল ও চিন্তাশীল পাঠকরা এ পরিচ্ছেদ মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

এ নিয়ে আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এখানে শুধু একটি কথা বলেই শেষ করছি যে–স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির প্রথম উপকরণ জল। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই স্রষ্টা সব কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন যা সৃষ্টির শুরু হতেই কার্যকরী হচ্ছে এবং সৃষ্টি লয় পর্যন্ত চলবে। এ পরকল্পনাকে কাটছাঁট করবার শক্তি কারো নেই। এটাই বুঝিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর পবিত্র বাণীসমূহে। নিম্নে তাঁর আর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা যুগ যুগের বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার উপকরণ যোগাবে এবং তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ ভরে তুলবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি, কার্যাবলী ও জীবিকা নির্ধারণ করিয়াছেন।"[১]

কোন্ বৈজ্ঞানিকের মহাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ভাই এরা এবার বিচার করুন। কোরআন-বাইবেল-বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করলে-আমরা এ মহাবাণীর সারবত্তা খুঁজে পাই। কোথা থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করলেন? কোন্ অদৃশ্য শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে একটি একটি করে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর দান করলেন যার ফলে দৃশ্য অদৃশ্য তত্ত্বাবলী নির্ভুল হিসাবে তিনি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে সর্বযুগের জন্য রেখে গেলেন? চলুন আমরা চিন্তা করি ও তাঁর এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বাণী নিয়ে আলোচনা করি।

মানব সৃষ্টির রহস্য

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

"সমগ্র মানবজাতি এক আদমেরই সন্তান এবং আদমের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই যে তাঁহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।"[১]

পূর্ব পরিচ্ছেদে হযরতের বাণী ধরে আমি আলোচনা করেছি এবং এ কথাই বলেছি যে সৃষ্টির এক মহান উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্তার ছিল। আর সে উদ্দেশ্যের জন্যই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সব কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরক্ষিত গ্রন্থে যে গ্রন্থে সৃষ্টি সমূহের যাবতীয় তত্ত্বই নিহিত রয়েছে। এ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো মানব সৃষ্টি। এজন্যই আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুই পরিমিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মানুষের প্রয়োজনে এ মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিকারী? জ্ঞানের পরিসীমায় ধরা পড়ে না? বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতেও এর হদিস মেলে না। দৌড়ে আসতে হয় ঐ সুরক্ষিত গ্রন্থে। আসতে হয় অদৃশ্য বিজ্ঞানের ধারক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কাছে যার ওপর এ গ্রন্থ অর্পিত হয়েছে। দেখি সে মহাগ্রন্থ হতে তিনি কি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গ্রন্থে বলে ঃ

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আমি এই পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। তাহরা বলিয়াছিল-তুমি কি ইহাতে এমন সৃষ্টি করিবে যে তাহারা তন্মধ্যে অশান্তি উৎপাদন করিবে ও শোণিতপাত করিবে? এবং আমরাই তো তোমার প্রশংসা কীর্তন করিতেছি এবং তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি; তিনি বলিয়াছিলেন তোমরা যাহা অবগত নও নিশ্চয়ই আমি তাহা পরিজ্ঞাত আছি।"[২] (২ঃ৩০)

উপরে বর্ণিত আল্লাহর বাণী হতে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত বস্তুসমূহের ওপর প্রতিনিধিত্ব করতে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এ বিশিষ্ট সৃষ্টিই মানব সন্তান যার নাম 'আদম'। তিনিই হলেন প্রথম উৎস যে উৎস হতে কোটি কোটি মানব সন্তান এ পৃথিবীতে আগমন করেছে এবং করবে।

টীকা ঃ ১ । মসীর। সংগৃহীত হাদিসের আলো। ১ম খণ্ড হঃ নং ৬৬৯।

টীকা ঃ ১ । বিদায় হজ্ব।

২ । কোরআন । সূরা বকর। আয়াত-৩০

আদম সন্তানের পূর্বে আর একটি জাতির আগমন ঘটেছিল যারা 'জ্বেন' নামে অভিহিত। আজও তারা এ পৃথিবীর বক্ষে আছে। তাদের বাসস্থান কোথায়, কি অবস্থায় থাকে এ তত্ত্ব বিজ্ঞান দিতে অসমর্থ। মহাকাশের ছবি নিয়ে বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাই। মহাসমুদ্রের তলদেশে আলোক রশ্মি পাঠিয়ে অনেক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করি। মানব শরীরে এক্স-রে প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রাংশের কার্যকলাপ দেখতে পাই। কম্পিউটার দিয়ে অজানা রহস্য খুঁজে বের করি। অথচ জ্বেন পরীর সন্ধান জানতে পারি না। এ রহস্যের মূলে কোন্ রহস্য বিরাজিত? অস্তিত্ব খুঁজে পাই না তাই বলে কি এ বাণী মিথ্যা?

"আমি মানবকে বিশুদ্ধ মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি এবং জ্বেনকে অগ্নিশিখা হতে সৃষ্টি করেছি।"[১]

জ্বেন সৃষ্টির পৃথক হলেও, স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি, প্রকৃতি, ঠিক মানুষেরই মত। এদের স্নেহ আছে, ভালোবাসা আছে, মায়া আছে, দয়া আছে, শিক্ষা আছে, জ্ঞান-গরিমা আছে, রাগ-অভিমান আছে। অনেক বিজ্ঞানীদেরই প্রশ্ন হতে পারে যার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না -তাকে কি করে বিশ্বাস করা যায়? এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবুও এ চিন্তার অবসান ঘটায় দৃশ্য বস্তুর মাঝে অদৃশ্য বস্তুর লীলাখেলায়। মানব দেহ সবাই দেখতে পায়। এর রূপে চক্ষুর তৃপ্তি আছে। **মন ভরে যায়। আত্মার শান্তি হয়। প্রেম উথলিয়া উঠে। ভালবাসায়-হৃদয় গলে যায়।** আপনারই দেহের মাঝে অতি নিকটে এই সব অদৃশ্য বস্তু রয়েছে। (মোটা অক্ষরে মার্ক করা শব্দগুলো) বিজ্ঞানের কোন কৌশল আছে? মাপকাঠি আছে? দেখবার কোন যন্ত্র আছে? উত্তরে বলবেন-না। তবুও কি বিশ্বাস হয় না! এদের কি ক্রিয়া নেই? অস্তিত্ব নেই? রূপ নেই? গুণাগুণ নেই? শক্তি নেই? যদি বলেন-আছে। তাহলে **'জ্বেন পরীর'** নাম শুনে মুখ ফেরাবেন কেন? অবিশ্বাস করবেন কেন? পারবেন না। যদি এদের খপ্পরে পড়েন তাহলে আমার অবস্থাই হবে। আমার জীবনে এ ঘটনা ঘটেছিল। একদিন -দুদিনের জন্য নয়। সুদীর্ঘ আটটি মাস। অদৃশ্যভাবে অলৌকিক পদ্ধতিতে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন তা শুধু আমাকেই ব্যতিব্যস্ত করে নি; আমার সমগ্র পরিবার, চাকর-চাকরাণী, বন্ধু-বান্ধব-সবাইকে করেছে বিব্রত, হতবাক। চোখের পলকে জিনিসপত্র উধাও হোত। দু-চার দিন পর হঠাৎ করেই আবার দেখা যেত ও সব জিনিস দিয়ে গেছে। অলক্ষে থেকে পরীর কথা শুরু হলো ছোট ভাগ্নী খুকীর সাথে। কি আনন্দ! কি মজা! কি রহস্য! ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, প্রতিবেশী, নর-নারীর ভীড় জমল বাড়িতে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করত পরীকে খুকীর মাধ্যমে। তৎক্ষণাৎ জবাব। কেউ সরে যেতে চায় না। সম্মানিত ব্যক্তিদের পরীর উপহার বিস্কুট-কলা -চা ইত্যাদি। আর মেয়েদের জন্য এনে দিত তৈরি পান। পাশে ঘরের কোণে ধপ্ করে ফেলে দিত এ সব জিনিস। অবাক হয়ে সাংবাদিকরা এবং আগন্তুকরা ফিরে যেত ঘরে। বিভিন্ন খবরের কাগজে এসব অলৌকিক ঘটনা ছাপা হতে লাগল। অবাক করে দিল অবিশ্বাসী, দাম্ভিক ও অহংকারী মানব সমাজকে। আর আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে এলো বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানব সমাজ। আট মাস ধরে চলল এ রহস্যজনক খেলা আমার বাড়িতে। এ চাঞ্চল্যকর আনন্দ রহস্যের ও ব্যথা-বেদনার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে আমার রচিত-**'পরী কথা বলে'** পুস্তকে। আগ্রহশীল ও চিন্তাবিদদের অনুরোধ করব এ বইটি পড়তে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পশ্চিম বাংলাতেও ঝড় উঠেছে। কবি-লেখক-

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা রহমান । আয়াত- ৩০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারাতেও আলোড়ন এসেছে। আল্লাহ্‌র মহাবাণীতে ভুল নেই। এ বিশ্বাস আজ নাস্তিকদের মস্তিষ্কেও দোলা দিচ্ছে। বিভ্রান্ত চিন্তাধারা শোধন করে ফিরিয়ে নিচ্ছে ঐ সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক সৃষ্টিমহিমার সান্নিধ্যে।

জ্বেন-পরীর খেলা অস্তিত্ব শুধু এ যুগেই নয়। সৃষ্টির পর থেকেই চল্‌ছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) এদের নিয়ে অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করতেন। চোখের পলকে রাণী বিলকিসকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন। জ্বেন-পরীদের ওপর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। আমার এ পুস্তকে এর কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনা তুলে ধরেছি। হযরত ঈসা (আঃ) অসংখ্য জ্বেন-ব্যাধিগ্রস্থ, বোবা, বিকলাঙ্গ রোগীদের আরোগ্য করেছেন। বাইবেল থেকে এর ওপর অনেক ঘটনা দেখিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) -এর পর যখন কোরআন অর্পিত হয় তখন এই জ্বেন জাতি কোরআনের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়। রসুলুল্লাহ্‌কে (দঃ) আল্লাহ্‌র প্রিয়তম এবং শেষ নবী বলে স্বীকার করে। শুধু তাই নয়, তাঁর ওপর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজেদেরকে ধন্য করে।

আমরা অতীত ও বর্তমানে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাসমূহ বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি জ্বেন ও মানব বলে দু'টি সম্প্রদায় আছে। আল্লাহ্‌র বাণীতে এদের যা বলা হয়েছে তা সত্য। জ্বেনকে অগ্নিশিখা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে মৃত্তিকা হতে।

জ্বেন জাতির কি কার্য ছিল কতটুকু আধিপত্য জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্টির ওপর বিস্তার করেছিল এ তত্ত্ব কেউ দিতে পারে নি। তবুও এরা ক্ষমতাশীল কিন্তু বস্তুসমূহের ওপর প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতা এদের ছিল না। আজও নেই। থাকলে আল্লাহ স্বয়ং মানব সন্তানকে সৃষ্টি সমূহের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করতেন না।

আজ আমরা বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি যে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির এক মানবসন্তান বৃহৎ আকৃতির পশুদের পর্যন্ত বশে আন্‌ছে এবং তাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বাঘ-ভল্লুক, হাতি-ঘোড়া, গণ্ডার, সর্প, হিংস্র জন্তুদের পর্যন্ত আয়ত্বে এনে ব্যবহার করছে। বৃক্ষলতা, তরুরাজি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, মেঘ-বায়ু সবকিছু এ মানুষের জন্যই সৃষ্টি। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। সবাই মানুষের সেবায় ব্যস্ত। মানুষের জন্যই তাদের কার্য সীমাবদ্ধ। মাটি উৎপাদন করছে। বৃক্ষ ফলদান করছে। চন্দ্র-সূর্য কিরণ দিচ্ছে। বায়ু মেঘমালা পরিচালিত করছে। অক্সিজেন,হাইড্রোজেন শ্বাস-প্রশ্বাসের উপকরণ যোগাচ্ছে। কার্বন-নাইট্রোজেন জীবজন্তু ও তরুলতাকে বাঁচিয়ে রাখছে। আগুন উত্তাপ দিচ্ছে। জল জীবজন্তুর প্রাণ রক্ষা করছে। পশু-পক্ষী, মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণী নিত্যদিনের খাদ্য দিচ্ছে–কোন্‌টি মানুষের সেবায় রত নয়? দ্যুলোক -ভূলোকে যা কিছু আছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানুষের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র বাণীতেও তাই আমরা দেখতে পচ্ছি–

"আলামতারা আন্নাল্লাহা সাখ্‌-খারা লাকুম মা-ফি সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়াস বাগা আলায়কুম নিয়ামাহু জাহিরাতান ওয়া বাতিনাতান।"[১] (৩১ঃ২০)

অর্থাৎ,

"তোমরা কি দেখিতেছ না যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাহা আছে তাহা **আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য আয়ত্বাধীন করিয়াছেন**। এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ ও গুপ্ত অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন।"

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সুরা লোকমান। আয়াত–২০

উপর্যুক্ত মহাবাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এ বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। গভীর চিন্তাশীল, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে মানুষকে আল্লাহ্‌ কতটুকু জ্ঞান, মর্যাদা ও শক্তি দিয়ে এ পৃথিবীর বক্ষে পাঠিয়েছেন। সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু মাত্রই এ মানুষের অধীন ও তার মঙ্গলেই নিবেদিত। প্রতিটি বস্তুকেই মানুষ তার আয়ত্বে এনে কাজে লাগাচ্ছে। যাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারছে না বা যাদের নিয়ন্ত্রণে এনে বশীভূত হতে ব্যর্থ হচ্ছে তারাও প্রকারান্তরে মানুষের কাজেই রত। যে নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্‌ তাদের সৃষ্টি করেছেন সে নির্দেশ তারা ভঙ্গ করে নি এবং করবেও না। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘ-বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবুও চাঁদের সুশীতল ছায়া উপভোগ করছে। সূর্যের কিরণ নিয়ে বেঁচে রয়েছে। বৃষ্টির জলে পৃথিবী শস্য-শ্যামল হয়ে উঠ্‌ছে যার ফলে মানুষ পাচ্ছে প্রচুর খাবার। এদের কার্যকারিতায় যদি বিন্দুমাত্র শিথিলতা আস্‌ত, হিংসা-বিদ্বেষের বশে যদি ঘনিষ্ঠতার অভাব ঘট্‌ত তাহলে এ মানুষ জড়ের রূপ ধারণ করত। বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে Air Conditioner, Air cooler, Fridge তৈরি করে নিজেদের বিলাসিতা বাড়াচ্ছে। সূর্যের আলো নিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করছে, চুলা জ্বালাচ্ছে। বৃষ্টির বিশুদ্ধ পানি নিয়ে ঔষধ তৈরি করছে, বীজকণার গর্ভ ঘটাচ্ছে। গুপ্ত ও প্রকাশ্যে সব বিষয়েই মানুষ সেই পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ লাভ করে ধরার বুকে বিজয় নিশান ওড়াচ্ছে।

বস্তুজগৎ ও জীবজগতের প্রতিনিধি এ মানব সন্তানকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মাটিই ছিল মূল উপাদান। এ জন্যই প্রথম মানব সন্তানের নাম রাখা হয়েছে **'আদম'**। আদম–অর্থ ধুলি বা মাটি। **মাটির গড়া এ পৃথিবী যেমন শান্ত ও স্থির, নড়চড় করে না, অটল, অচল ও শান্ত হয়ে বিরাজ করে কোটি কোটি জীবজন্তুর পদাঘাত খেয়েও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে না, রাগ-অভিমানে শূন্য মার্গে অথবা সমুদ্রের অতল গহ্বরে লুকায় না তেমনি এ আদম সন্তান মাটির স্বভাব গুণে শান্ত হয়ে আপন কর্তব্যে বিভোর থাকে।** গ্যাসের মত শূন্য মার্গে উড়ে যায় না। চন্দ্র-সূর্যের মত স্বাভাবিক গতি নিয়ে দৌড়ায় না। বায়ুর মত চঞ্চল হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে না। মেঘের মত গর্জন করেও বিদ্যুৎ চমকায় না। অথচ আশ্চর্য সব উপাদানই তার দেহে বিদ্যমান। বায়ুর নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন, জলের অক্সিজেন-হাইড্রোজেন, মাটির লোহা-তামা-সিসা-দস্তা, সোনা-রূপা যত রকম ধাতু আছে সব কিছুই বিদ্যমান এ মানবদেহে। এ দেহের অনু-পরমাণুর এমন শক্তি, এমন প্রকৃতি যে মানুষ সব কিছুই তার ইন্দ্রিয় শক্তি বলে শুনতে পারে, বুঝতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অয়্যারলেসের ট্রান্সমিটার রিসিভারের মত আত্মার অফুরন্ত শক্তিবলে বহু দূর-দূরান্তে তার ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রেরণ করতে পারে। আবার সেখান থেকে গ্রহণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা তাদের বুদ্ধিবলে যন্ত্রের মাধ্যমে কোটি কোটি মাইল দূরের বস্তুকে দেখতে পায়। তাদের কার্যবিধি অনুধাবন করতে পারে। যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। চেষ্টা দ্বারা, সাধনা দ্বারা, ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, আত্মার উৎকর্ষের দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে। এ ক্ষমতা শুধু মাটির মানুষ আদম সন্তানকেই দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে নয়। মানুষের এ ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি মেলে স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণীতেইঃ-

"আল্‌ -লায়সা লেল্‌ ইনসানে ইল্লা মা-সায়া।"

অর্থাৎ ঃ- "এতদ্ব্যতীত এমন কোন কিছুই নাই যাহার জন্য মানুষ চেষ্টা করে না।"

মানবদেহের মূল উপাদান যে মাটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি আমার 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)' পুস্তকের ১ম খণ্ডে শরীর বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে এবং 'বিজ্ঞান না

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন?' পুস্তকের পূর্ণজীবন পরিচ্ছেদে। তাই এর ওপর আর আলোচনা করতে চাই না। শুধু আগ্রহশীল পাঠকবৃন্দের জন্য একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ- দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়ায়ে সা-আদত' পুস্তক হতে। মাটি হতে মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা বিশ্বাস করলেও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে যে, কোন্ ধরণের মাটি দ্বারা এ মানবকুল সৃষ্টি? কাঁকর মিশ্রিত মাটি, বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, ধুলিযুক্ত মাটি না মরুভূমির বিশুদ্ধ ধুলি মাটি–না ধাতব মিশ্রিত লাল মাটি? কোন দেশের পবিত্র এ মাটি?

আল্লাহ্র বাণী কোরআনের কোথাও আছে[১] **'মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মাটি হতে মানবের সৃষ্টি হয়েছে।'** আবার কোথাও আছে মানুষকে **'কর্দমাক্ত মাটি হতে'** সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোরআনে বর্ণিত বিপরীতমুখী ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাটির উল্লেখ দেখে স্বভাবতই মনে একটি Confusion জাগে। এ প্রশ্নের জবাব আলেম-ওলামা, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ দ্বন্দ্ব এড়াতে তাই চলুন নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এর সমাধান করতে চেষ্টা করি।

হযরত আদম (আঃ) -এর সৃষ্টি কথা[২]

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছেঃ-

"হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ বিভিন্ন দেশের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। পবিত্র কাবার মাটি দ্বারা মাথা, দোহানার মাটি দ্বারা বক্ষদেশ, ভারতের মাটি হইতে পিঠ ও পেট, প্রাচ্যের মাটি দ্বারা হাত এবং পাশ্চাত্যের মাটি দ্বারা পা সৃষ্টি করেন।"

(২) হযরত ওহাব ইবনে মাম্বা বলেনঃ-

"হযরত আদম (আঃ)-এর সপ্তাঙ্গ সপ্তস্তরের মাটি হতে তৈরি। যেমন, প্রথম স্তরের মাটি হতে মাথা, –দ্বিতীয় স্তরের মাটি হতে গর্দান, –তৃতীয় স্তরের মাটি হতে বক্ষদেশ,–চতুর্থ স্তরের মাটি দ্বারা হাত, –পঞ্চম স্তরের মাটি দ্বারা পেট ও পিঠ, –ষষ্ঠ স্তরের মাটি দ্বারা নিতম্ব এবং উরুদেশ, সপ্তম স্তরের মাটি দ্বারা পদদ্বয়।"

(৩) অন্য এক বর্ণনা হতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেনঃ-

"প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) -এর মস্তক বায়তুল মুকাদ্দাস, মুখমণ্ডল বেহেশত, দন্তরাশি হাউজে কওসর, ডান হাত কাবার, বামহাত পারস্যের, হাড় পাহাড়ের. পার্শ্বদেশ ইরাকের, অন্তঃকরণ ফেরদৌসের, চক্ষু হাউজে কাউসার এবং জিহ্বা তায়েফের মাটি দ্বার সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর (১) ও (৩) নং দু'টি বর্ণনার কোন মিল নেই বরং বিভ্রান্তিমূলক। কেননা (১) নং এ বলেছেন–কাবার মাটি দ্বারা মাথা আবার (৩) নং বলা হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাটি হতে মাথা। (১) নং দোহানার মাটি হতে বক্ষঃদেশ। (২) নং -এ বক্ষদেশে মাটির উল্লেখ নেই। এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই গরমিল। এটি রসুলের হাদিস নয়। কোরআনের কথাও নয়। তাই নির্ভরশীল নয়। এ জন্যই হযরত মৌলানা আকরাম খাঁ তাঁর বর্ণনার গুরুত্ব দেন নি। (২) নং বর্ণনায় হযরত ওহাব ইবনে মাম্বা হযরত আদম (আঃ) -এর সৃষ্টি নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে পৃথিবীর যে সাতটি স্তর রয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

---

টীকা : ১ । কোরআন। সূরা রহমান ও সূরা সাফফাত।
২ । সংগৃহীত-দাকায়েতুল আখবার কৃত ইমাম গাজ্জালী।

(১) এক–বায়ুমণ্ডলীয় স্তর। (Air stone)
(২) দুই–বালুকা স্তর। (Sand stone)
(৩) তিন–চূর্ণ প্রস্তর। (Lime stone)
(৪) চার–কর্দম প্রস্তর। (Clay stone)
(৫) পাঁচ–শ্লেট শিলাস্তর। (Slate stone)
(৬) মাইকা স্তর। (Mica stone)
(৭) পাথুরিয়া কয়লার স্তর। (Coal stone)

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন কার্যকারিতা। এক দেহে হাজার হাজার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকলেও কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই। অথচ বিরাট সমন্বয় রয়েছে। হাতের দ্বারা পায়ের কাজ চলে না। চোখের দ্বারা কর্ণের সাহায্য হয় না। পাকস্থলী দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ঘটে না। নাসিকা দ্বারা হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। পায়ের দ্বারা দাঁতের কাজ চলে না। জিহ্বা দ্বারা হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন হয় না। যে কোন একটির অভাব ঘটলে অন্যটির দ্বারা বিন্দুমাত্র সাহায্য হয় না। অথচ একই দেহে সজ্জিত। আশ্চর্য যে হিংসা-বিদ্বেষেও কেউ কারো ক্ষতি করে না, বরং একটি অঙ্গ আঘাত পেলে অন্য সব অঙ্গই বিচলিত হয়। সহানুভূতি দেখাতে সবাই পরামর্শ করে। মনে হয় Combined Military Force। যুদ্ধ বাধলে এয়ার ফোর্স, নেভাল ফোর্স, ল্যাণ্ডফোর্স সবাই একসঙ্গে একই স্বার্থে যেমন কাজ করে তেমনি মানব দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যদিও এদের চরিত্র ভিন্ন। দেহের যে Ready force-এর কথা বললাম বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছে **'এনজাইম'** (Enzyme)। আঘাতে অথবা অভাবে যে সাহায্য প্রয়োজন এই 'এনজাইম' নিজ স্টক থেকে সেই বস্তু দান করে। প্রতিটি অঙ্গকে সজীব রাখে ক্রিয়াশীল করে।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের উপাদান বিভিন্ন। যে বস্তুতে চোখ সৃষ্টি সে বস্তু কানে নেই। কানের উপাদান মস্তিষ্কে নেই। মস্কিষ্কের উপাদানও অস্থি মজ্জায় ও মাংসে নেই। পায়ের তলার চামড়া ও পয়ের উপরি চামড়ার উপাদানে কত যে পার্থক্য যার ফলে হাজার বছর হাঁটলেও পায়ের তলা ক্ষয় হয় না। অথচ একটু আঘাত পেলেই উপরিভাগের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অচল হয়ে পড়ে।

এখান থেকে বুঝা যায় মটির দেহে আদম (আঃ) সৃষ্টি হলেও একই প্রকার বৈশিষ্ট্যের মাটি হতে নয়। ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য মাটির সমন্বয়েই এ দেহ গঠিত।

একটি ইমারত তৈরির জন্য শুধু ইট বা পাকা মাটি দিয়ে হয় না। বালি, কাঁকর, সিমেন্ট, লোহা, পানি, চুন, কাঠ সব ধরণের জিনিস প্রয়োজন। এদের সমন্বয়ে যে ইমরাত গঠিত হবে–তা মাথা উঁচু করে স্থির থাকবে। বাসপোযোগী হবে। সুন্দর হবে। তদোনুরূপ মানব দেহের যে উপাদান মাটি তা বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন গুণের সমাবেশেই রয়েছে। তাই কোরআনে বর্ণিত কাদা-মাটি, পোড়া মাটির মত শক্ত মাটি অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থার মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টি বিজ্ঞাসম্মত –বিজ্ঞানভিত্তিক। এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিরূপ চিন্তার স্থান নেই।

কোন স্থানের কোন্ ধরণের মাটি হতে হযরত আদম (আঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে এ তত্ত্ব রসুলুল্লাহ (দঃ) দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তবে তার একটি বাণী হতে[১] জানতে পারি যে **'কাবার মসজিদ'**–এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে। এর পর

টীকা : ১ । সহীহ বুখারী (তজরীদ)। হাদিস নং ৬৮/২৩৯। আবুযর বলেনঃ- আমি বলিলামঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

'বায়তুল মুকাদ্দাস'। হযরত আদম (আঃ) –প্রথম এ মসজিদের ভিত্তি দেন এবং এখানেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা দেন। কালক্রমে তা বিলীন হয়ে যায়। এর পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল-সহ কাবার ভিত্তি স্থাপন করেন।

মাথা মাটিতে স্পর্শ করেই সেজদা দেওয়া হয়। এ সেজদাই পছন্দ করেন মহান প্রভু **'আল্লাহ'** তাঁর সৃষ্ট মানব সন্তান থেকে। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলি সন্তান এ কাবার গৃহে এসে আজও আত্মা-মন উৎসর্গ করে মাথা ঠুকে সেজদা দিয়ে ধন্য হয়।

মস্তিষ্ক দেহের রাজা। বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান কেন্দ্র। এ কেন্দ্র থেকেই আসে নির্দেশ যা পালন করে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ কেন্দ্র বিকল হলে সব কিছুই হয় বিকল। তাই এর গুরুত্ব অসাধারণ।

যে মাটিতে প্রথম সেজদা দিয়ে এ মস্তিষ্ক আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে সে মাটি যে কত পবিত্র তা বলবার প্রয়োজন পড়ে না। তাই আমরা বিশ্বাসীরা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এক বাক্যেই বলতে পারি যে **মাথার মাটি–কাবার মাটি**। বায়তুল মোকাদ্দেসের নয়। কেননা মূল উৎসের দিকে বস্তুর গতি থাকে।

সমগ্র মানবদেহে মোট ৯টি প্রবেশ ও নির্গমনের পথ রয়েছে। এর সাতটি পথই রয়েছে মুখমণ্ডলে। যেমনঃ- ২ কান, ২ চোখ, ২ নাকের ছিদ্র ও একটি মুখ গহ্বর। নাসিকার ছিদ্রপথেই আল্লাহ্ স্বীয় আত্মা আদমের দেহে ফুৎকারঃ করেন। মহাত্মাদের মতে এই রূহ মস্তিষ্কে দু-শ বছর অবস্থান করার পর চক্ষুতে আসে। তখনি আদম (আঃ) স্বীয় দেহ দেখতে পান। এরপর কর্ণে আসলে ফেরেশতাদের জেকের 'আল্লাহ্' এবং **'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'**–শব্দ শুনতে পান। যখন রূহ হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে তখন আদম (আঃ) তাড়াহুড়া করে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। এরপর সৃষ্টিকর্তাকে দেখে সেজদায় পড়েন।

মাটির গুণাগুণঃ- (১) মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। এর ওপর বিশ্লেষণ অনেক স্থানেই করেছি। এবার শুধু মাটির স্বরূপ নিয়ে একটু আলোচনা করছি।

মাটিকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এতে বিদ্যমান। ধাতব, গ্যাসীয়, জলীয়, জৈব, অজৈব সব কিছুতে মিলেই এ মাটি। এর যেমন রয়েছে সহনশীলতা, তেমনি রয়েছে উৎপাদন শক্তি। মাটিকে যত জোরেই আঘাত করা যাক না কেন তা প্রতিঘাত করে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। নীরবেই সহ্য করে যায়। অন্ধ-আতুর, ধনী-গরিব, কাল-ফর্সা, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, দাতা- কৃপণ, জীব-জন্তু, তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ সবাইকে আপন করে বুকে স্থান দেয়। কারো ওপর কোন অভিমান নেই। এ মাটির চোখে সবাই সমান। সাম্য ও সহিষ্ণুতার এমন দৃষ্টান্ত এ মহাবিশ্বের বুকে আর একটিও নেই। সর্বকালের, সর্বজাতির, সর্বশ্রেণীর জন্যই এ মাট যেন আদরের মা।

(২) উৎপাদন ক্ষমতা ঃএ বিষয়ের ওপর গভীর চিন্তা করলে শুধু আমাদের মত লেখক

"হে রসুলুল্লাহ! কোন মসজিদ প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে এ পৃথিবীতে? তিনি বলিলেন 'পবিত্র মসজিদ'। আবুযর বলেন–'আমি বিললাম, তারপর কোনটি?' তিনি বলিলেন–দূরবর্তী মসজিদ(বায়তুল মুকাদ্দেস)

২ । (ক) ওয়া নাফাখতো ফিহি মে রুহী [কোরআন]।

অর্থাৎ 'এবং আমি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিলাম'

(খ) আর সাদাপ্রভু মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।

কেন যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের চক্ষুও স্থির হয়ে যায়। প্রতি মিলি সেকেন্ডে যে কত জীব-জড়, প্রাণী, তরুলতা, জানা-অজানা বস্তুসমূহকে এর উদর হতে জন্মলাভ করছে তার হিসাব দিতে পারে? স্বভাব-চরিত্র, রূপ-গুণ, ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যে বস্তুসমূহের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও কেউ কারো গুণ হারায় না। অম্ল-তিক্ত, টক-মিষ্টি, লবণ -ঝাল, শক্ত-নরম, ঠাণ্ডা-গরম,লাল-নীল, সবুজ-সাদা, কালো-হলুদ সবাই এ মাটির সৃষ্টি। সবাই এক সমাজে বাস করে। এক সঙ্গেই হেলে দুলে খেলে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ মাটি মায়ের স্নেহ দিয়ে সবাইকে তার বক্ষে জড়িয়ে রাখে। সূর্যের প্রখর তেজ থেকে, হিম-শীতলের করাল গ্রাস থেকে, ঘূর্ণীঝড়ের প্রলয় কাণ্ড থেকে এদের লুকিয়ে রাখে। দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, বলশক্তি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের রূপেই রয়েছে এ মাটি। এ মাটি তার যৌবন হারায় না। এর বার্ধক্যও আসে না। এ মাটিতেই তৈরি আদমের দেহ।

নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

"খোদা আদমকে সৃষ্টি করিলেন এমন অবস্থায় যে তাঁহার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। তারপর তাহাকে বলিলেন-যাও সালাম কর ঐ ফেরেশতাদের এবং শোন তাহারা কি জবাব দেয়। কেননা উহাই হইবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি বলিলেন–'আস্-সালামো আলায়কুম' (শান্তি বর্ষিত হউক তোমাদের ওপর)। জবাবে তাহারা বলিল, -ওয়া আলায়কাস্ সালাম ও রহমাতুল্লাহ্।[১]

এখানে আদমের আর একটি রূপ আমরা দেখতে পেলাম তাঁহার দেহের উচ্চতা ছিল ৬০ হাত অর্থাৎ ৯০ ফুট। এত দীর্ঘ দেহ ছিল এটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। তবু সত্য কেননা আল-আমিন রসুলের বাণী। ইতিহাস খুঁজলে এ সত্যতা মেলে।

নিরস বিষয় পাঠ করতে করতে পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। এবার একটু রসের সঞ্চার করছি। শ্রেষ্ঠ লেখক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের এ লেখা। আমার রচিত নয়। আমি শুধু তাঁদর কথাগুলো তুলে ধরছি।

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায়–জনাব মোহাম্মদ **'কে চাঁদ সৃষ্টি করেছে?'**– প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

'যে অতিকায় মানুষের কথা পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে পাঠ করা যায় তাহাও নিতান্ত অমূলক নহে। কারণ কিছুদিন পূর্বে দৈনিক বসুমতিতে পাঠ করিয়াছিলাম যে-জব্বলপুর অঞ্চলে একটি নরকঙ্কাল বাহির হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট। ইহা হয়ত কেহই বিশ্বাস না করিতে পারেন কিন্তু সম্প্রতি অনেকেই অবগত হইয়াছেন যে অল্পদিন হইল একটি সজীব মানব আকৃতি বৈশিষ্ট্য জীব দৃষ্ট হইয়াছিল যাহার পদতলের মাপ ২২" ইঞ্চি বলিয়া সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল।[২]

এক সময় ৩২ ফুট দীর্ঘাকৃতি মানুষ থাকা সম্ভব কিনা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি হামদুল্লাহ্ মস্তওফির ভৌগোলিক গ্রন্থ হইতে দেখাইব যে এইরূপ দীর্ঘকায় মানুষ এই ভারতবর্ষেই ছিল।

ইবনে খোর্দাদবি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের এক রাজা খলিফা আল-মামুনকে বহু রত্নরাজি সম্বলিত বিবিধ উপহার দ্রব্য প্রেরন করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে পরমাসুন্দরী

টীকা ঃ ১ । সহীহ বুখারী। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৫২/২২৩

২ । সংগৃহীত মাসিক মোহাম্মদ–১১শ বর্ষ–৪র্থ সংখ্যা। মাঘ ১৩৪৪ সাল।

English Translation of Hamd-Allah Mustafis 'NUZILAT-AL-QUTUB' By G. Le Strange. Page No.286.

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং লাবণ্যময়ী একটি কুমারীকেও পাঠান। এই মেয়েটির দেহের উচ্চতা ছিল ৭ এল অর্থাৎ ২৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। এবং ঠিক এইরূপ অনুপাতেই ছিল তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠিত।[১]

কজভিনী তাঁহার 'আজায়ের -অল-মুখলুকাত'-এ এরূপ লিখিয়াছেন যে বুলগারে আদ-বংশীয় অসুরাকৃতি লোকদের কঙ্কালের ন্যায় অস্থিসমূহ (দেহাবশেষ) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নরকঙ্কালের একটি মাথার খুলী আয়তনে একটি গম্বুজের সমান। দাঁতগুলি আড়াআড়িভাবে এক বিঘত অর্থাৎ আধহাত এবং দৈর্ঘ্য চার বিঘত অর্থাৎ ১ গজ। এবং এই অস্থিসমূহ হস্তি দন্তের চাইতে আরও বেশি শক্ত। ঐ গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং বুলগারে একজন লোককে দেখিয়াছিলেন যে নিশ্চিতই আদ-বংশীয় অসুর মানুষেরই জাতিভুক্ত হইবে। তাহার দেহের উচ্চতা ৭ এল-এর ওপর অর্থাৎ ২৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। এবং তাহার শক্তি ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সমানুপাতেই ছিল। বুলগারাধিপতি তাহাকে তাঁহার সৈন্যদলের নায়ক করিয়াছিলেন এবং দেহের পরিমাণ অনুযায়ী তাহার শক্তি ছিল।[২]

ইতিহাসে এরূপ চমকপ্রদ ও অপূর্ব কাহিনী রয়েছে। আদ-সমূহের দেহের আকৃতি কতটুকু ছিল আমি এখনও কোথা হতে সংগ্রহ করতে পারি নি। কোরআনে আল্লাহ্ এদের সম্বন্ধে অনেক সূরাতেই বর্ণনা করেছেন।[৩] তারা যে অসুর প্রকৃতির ও অসাধারণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ছিল এতে কোন ভুল নেই। পরবর্তী সময়ে বাদশাহ ফেরাউনের জীবন কাহিনী হতেও দেখতে পাই যে তাঁর দেহ প্রায় ৭০ ফুট লম্বা ছিল। এটা অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। ফেরাউনের অনেক পূর্বে হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাব। তাঁর দেহের উচ্চতা কেমন ছিল ইতিহাস থেকে জানতে না পারলেও হযরতের নিম্নোক্ত বাণী হতে বুঝা যায়।

তিনি বলেছেন ঃ

"আজ রাত্রে আমার কাছে দুই আগন্তুক আসিল। আমরা এমন এক দীর্ঘ ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম যে তাহার দৈর্ঘ্য হেতু আমরা তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে পাই নাই। তিনি ছিলেন ইব্রাহিম (আঃ)।"[১]

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি কথা নিয়ে আলোচনা করতে আমরা বহুদূর গিয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য কথাগুলো লেখবার প্রয়োজনবোধ করছিলাম-এ জন্যই যে হযরতের বাণী বিজাতিরা হাস্যাস্পদ মনে করতে পারেন। তাঁরা মনে করতে পারেন যে মানুষ ৯০ ফুট লম্বা হতে পারে এটা অকল্পনীয় ও পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। যে জন্যই ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছি এবং যারা বিশ্বাস করবে না তাদের লিখিত উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এজন্য অপরাধ হলে পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চাই।

টীকা ঃ ১ । সংগৃহীত মাসিক মোহাম্মদী -১১শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা। মাঘ ১৩৪৪ সাল। English Translation of Hamd-Allah Mustafis 'NUZHAT-AL-QUTUB' By G. Le straznge. Page No 286.

২ । সংগৃহীত-মাসিক মোহাম্মদী-১১শ' বর্ষ-৪র্থ। মাঘ-১৩৪৪ সাল।

৩ । সূরা রুমে (৩০:৯)-বলা হয়েছেঃ-

"তাহারা কি এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৎপর দেখিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কেমন হইয়াছিল। তহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং ভূমি খনন করিয়াছিল এবং ইহারা যেরূপ আবাদ করিয়াছে তাহারা অপেক্ষা অধিকতর আবাদ করিয়াছিল এবং তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী-সহআগমন করিয়াছিল।

টীকা ঃ ১ । হাদিস। সহীহ বুখারী শরীফ। কৃত-আলহাজ্বআবদুর রহমান খাঁ। সৃষ্টির পারম্ভ পরিচ্ছেদ । হাঃ নং ৬২/২৩৩।

আমরা হযরতের বাণীতে দেখেছি যে আল্লাহ্ তাঁকে আদেশ করেছিলেন ফেরেশতাদের সালাম করতে। তিনি তাঁদের সালাম জানালে ফেরেশতারাও প্রতি উত্তর দিলেন এই বলেঃ- "ওয়া আলায়কুম সালাম। ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।" অর্থাৎ এবং আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে তাঁহার করুণা ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হউন।"

এই সম্বর্ধনা দেওয়া - নেওয়ার রীতি মুসলিম সমাজে আজও চলে আসছে এবং পৃথিবী বিলীন হবার পূর্ব পর্যন্ত চলবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মানব পিতা আদম (আঃ)-এর এ রীতিকে অনুসরণ না ক'রে জাতিভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক শব্দসমূহ সংযোজনা করে বলে- "Good morning':'নমস্তে'- 'Ohyo gozaimas' ইত্যাদি।

ফেরেস্তাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আল্লাহ্ ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন হযরত আদম (আঃ)-কে সারা বিশ্ব ঘুরে দেখাতে। অসীম এ বিশ্বকে আদম (আঃ) কিভাবে দেখলেন? ফেরেশতারাই বা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন?

আল্লাহ্ মায়মুনা নামক একটি অশ্ব সৃষ্টি করলেন সুগন্ধি বিশিষ্ট মুশক দ্বারা। এই অশ্বটির পাখা ছিল মণি-মুক্তার সৃষ্টি। হযরত আদম (আঃ) এই অশ্বটির পৃষ্ঠে উপবেশন করেন। এর চালক ছিলেন জিবরাইল (আঃ)। আর আদমের ডাইনে ও বায়ে ছিলেন ইস্রাফিল ও মিকাইল। সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ফেরেশতারা আদমকে দেখালেন।

উৎসাহী পাঠকবৃন্দের জন্য এখন প্রশ্ন ঃ

একঃ-আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে কোথায় প্রথম রাখা হয়েছিল?

দুইঃ- এ পৃথিবীতে কেন আসলেন?

তিনঃ-এ পৃথিবীকে আদম সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর কোন চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেই সম্ভব নয়। সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর প্রেরিত রসুলদের বাণী অনুযায়ী আমরা যা জানতে পেরেছি তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ

আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ বেহেশতে (স্বর্গে) রেখেছিলেন। সেখানকার সব কিছুই তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বেহেশতে একটি বৃক্ষ ছিল যাকে বলা হতো জ্ঞানবৃক্ষ বা Tree of Knowledge. হযরত আদম (আঃ)-কে এই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় আদম (আঃ)-এর সঙ্গিনী বিবি হাওয়া (যাকে আদমের বামপাশের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল) ঐ নিষিদ্ধ ফল নিজে ভক্ষণ করেন এবং স্বামীকে ভক্ষণ করান। এই অপরাধের কারণ হিসাবে আদম (আঃ)-কে স্বর্গচ্যুত করা হয়। কোরআন ও বাইবেল থেকে আমরা এ কথাই জানতে পাই। যদিও মূল রহস্য ছিল-এ বিশ্ব সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি যে কথা আমি পূর্বে লিখেছি।

এখানে কোরআন ও বাইবেলের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ও সে সত্যতার প্রমাণ করছি।

কোরআন

"এবং আমি বলিয়াছিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিণী স্বর্গোদ্যানে অবস্থান কর; এবং উহা হইতে যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না-অন্যথা তোমরা অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অনন্তর শয়তান তাহাদের উভয়কে তথা হইতে বিচ্যুত করিল; তৎপর তাহারা উভয়ে যাহাতে ছিল তথা হইতে তাহাদিগকে বহির্গত করিল; এবং আমি বলিয়াছিলাম-তোমরা নিচে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরস্পরের শত্রু। এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ -সম্পদ রহিয়াছে। অনন্তর আদম স্বীয় প্রতিপালক হইতে কতিপয় বাক্য শিক্ষালাভ করিল; তৎপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১] (২:৩৫–৩৭)

উপরে বর্ণিত বাণীর শেষাংশ পাঠ করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কেন আমি পূর্বে লিখেছি যে আদমের ইচ্ছাতে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করা হয় নি। স্রষ্টার মহান ইচ্ছা প্রতিফলিত করতেই আদম হাওয়ার এ ভুল। আদমকে (আঃ) পৃথিবীতে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় নি বরং নবীদের প্রেরণ, মানবজাতি সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ-সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রিয়া সম্পন্ন ইত্যাদি করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার বিকাশ করেছেন।

'আদম স্বীয় প্রতিপালক হইতে কতিপয় বাক্য শিক্ষালাভ করিল......। কোরআনের এ বাণী হতেও বুঝা যায় যে তাঁর মহৎ ও মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানব-জাতির সৃষ্টি। আদম (আঃ)-কে যে বাক্য সর্বপ্রথম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল–তা ছিল এই ঃ

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্'

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই–মুহাম্মদ যার বার্তাবাহক (রসুল)।

আদমকে ক্ষমা করা হলো ঐ বাণী উচ্চারণ করার জন্য। এবারে দেখি বাইবেলে এ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে।

বাইবেল–আদি পুস্তক

(মানবজাতির পাপে পতন)

৩ ১. সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল–ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা ঐ উদ্যানের কোন ফল খাইও না।

২ নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি।

৩ কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন–তোমরা তাহা ভোজন করিও না।

৪ স্পর্শও করিও না,–করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল কোনক্রমে মরিবে না।

৫ কেননা ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তাহা খাইবে সেইদিনই তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে। তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ্য হইয়া সদ্যসদ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবে।

৬ নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যকর ও চক্ষুর লোভজনক আর ঐ বৃথা জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয় তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন, পরে আপনার মত নিজ স্বামীকেও দিলেন। আর তিনিও ভোজন করিলেন।

৭ তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা উলঙ্গ; আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিদ্বাইয়া ঘাগর প্রস্তুত করিলেন।

৮ পরে তাহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন। তিনি দিবা অবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন।

টীকা ঃ-১ । কোরআন,-সূরা বাকারা। আয়াত ৩৫-৩৭।

৯ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়?

১০ আমি উদ্যানে রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।

১১ তিনি কহিলেন–তুমি যে উলঙ্গ ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?

১২ তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল তাই খাইয়াছি।

১৩. তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন,–তুমি এ কি করিলে? নারী কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল তাই খাইয়াছি।

১৪. পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম করিয়াছ এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত; তুমি বুকে হাঁটিবে এবং যাবজ্জীবন ধুলি ভোজন করিবে।

১৫. আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাঁহার পদমূল চূর্ণ করিবে।

১৬. পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; এবং সেও তোমার ওপর কর্তৃত্ব করিবে।

১৭. আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয় আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তুমি তাহা ভোজন করিও না। তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এইজন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল।[১]

১৮. তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর তোমার জন্য কণ্টক ও শিয়ালকাটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে।

১৯. তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে। তুমি তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ কেননা তুমি ধুলি এবং ধুলিতে প্রতিগমন করিবে।[১]

২০. পরে আদম আপন স্ত্রীর নাম 'হবা' (জীবিত) রাখিলেন কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন।

২১. আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরাইলেন।

২২. আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ মনুষ্য সদ্যসদ্য জ্ঞাপ্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল। এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্ত জীবি হয়।

টীকা ঃ ১ । বাইবেলে বর্ণিত বাণীগুলোর সঙ্গে কোরআনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে–'এইজন্য তোমার নিমিত্ত এই ভূমি অভিশপ্ত হইল।' আর কোরআনে বলা হয়েছে, 'এই পৃথিবী প্রতারণার ভাণ্ডার ব্যতীত নহে।'

শব্দ ও বাক্যের মধ্যেও কোরআন ও বাইবেলে একই জ্ঞানদান করা হয়েছে সৃষ্টি ও ধ্বংসতত্ত্বে। ১৯ নং বাক্যসমূহের ঠিক অনুরূপ বাক্য কোরআনে রয়েছে।

টীকা ঃ-১ । আমি ইহা (মাটি) হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারই মধে তোমাদিগকে প্রতিগমন করিতে হইবে এবং ইহা হইতেই তোমাদিগকে পুনরায় সমুথিত করিব। |মিনহা খালাকনাকুম। ফিহা নুইয়েদোক। ওয়া মিনহা নুখরেজোকুম তারাতান উখরা। সূরা-তা-হা। আঃ-৫৫|

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাকে এদের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন তিনি যাহা হইতে গৃহীত সেই মৃত্তিকাতে সৃষ্টিকর্ম করেন। এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এমন জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্বদিকে রূপকগণকে ও ঘুর্ণায়মান তেজময় খড়ক রাখিলেন।

আল্লাহর বাণী তা যে কোন গ্রন্থেই থাক না কেন একইরূপ। আমরা হিংসার বসে তা স্পর্শ করতে চাই না। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের যাজক পুরোহিত যাঁরা, তাঁরা পর্যন্ত কোরআন স্পর্শ করতে রাজি নয়। শুধু দূরে রেখেই ক্ষান্ত নয় কোরআনের ওপর বিরূপ মন্তব্য করে পৃথিবীর অমুসলিম ভাইদের বিপথগামী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলমানদের মধ্যেও তদ্রূপ। বাইবেল নাম শুনেই 'তওরা'-'তওরা' বলে থাকেন। একটি ঘৃণার ভাব অন্তরে এনে পবিত্র এ ধর্মগ্রন্থের ওপর জঘন্যতম মন্তব্য করে ছাড়েন। অথচ দু-জাতিই জানে না যে আল্লাহর বাণীর প্রতি অশ্রদ্ধা করার পরিনাম- Hell বা দোজখ।

আদম (আঃ) স্বর্গচ্যুত হবার কারণ কোরআন ও বাইবেলে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখন কোন্ গ্রন্থকে বলবেন অপবিত্র, অসত্য?

এখন তা হলে আমরা ২টি প্রশ্নের উত্তর কোরআন ও বাইবেল হতে পাচ্ছি-

(১) হযরত আদমকে সৃষ্টি করে স্বর্গে বা বেহেশতে রাখা হয়েছিল। কেন এ পৃথিবীতে আসলেন সে উত্তরও মিলল-'পাপের পতন'।

দুটো মহাগ্রন্থ হতে মানব সৃষ্টি নিগূঢ় রহস্য খুঁজে পেলামঃ-

(১) কোরআন ঃ "এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রহিয়াছে।" (পূর্বে উল্লিখিত)

(২) বাইবেল ঃ 'এই নিমিত্ত সদাপ্রভু তাহাকে এদনের উদ্যান হইতে (আদন বহেশত) বাহির করিয়া দিলেন যেন তিনি যাহা হইতে গৃহীত-সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম করেন।' (পূর্বে উল্লিখিত)

সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ বিকাশ, তাঁকে নিগূঢ়ভাবে জানা, ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যেই এ পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তন্মদ্ধে মানব জাতির সম্প্রসারণ।

বিভিন্ন ধর্মের যাজক, পুরোহিত ব্রাহ্মণ যাঁরা-তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী কতটুকু জানেন তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে দুঃখ হয় তাঁকে শেষ নবী,-নবী সম্রাট একথা স্বীকার করা তো দূরে থাক নবী হিসাবেও স্বীকার করে না। এটা একটা জাত ক্রোধ এবং জাত স্বভাব। তাই নবীর বিরুদ্ধে বরাবরই প্রচারণা করে এসেছে এবং আজও করছে। কিন্তু এত কিছু করার পরেও তারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিন্দু-মাত্র খাটো করতে পারে নি। যদি তারা আল্লাহর বাণী কোরআন পড়ত, হৃদয়ঙ্গম করত তবে হিংসা করা ত দূরে থাক সারাদিন এ বাণী নিয়েই পড়ে থাকত। আর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর একটি বাণীও যদি তারা ভক্তিভরে গ্রহণ করত তা হলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করত। তিনি যে কত উদার, কত মহৎ, কত জ্ঞানী, সবার কত আপন তার পরিচয় মেলে বিধর্মীদের প্রতি আচরণে, ভদ্রতায়, ক্ষমায় ও নিষ্ঠায়। তাঁর মহৎ প্রেম সর্বজাতির জন্য, সর্বকালের মানুষের জন্য। হযরত মরিয়মকে যেমন তিনি নারীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন-মরিয়ম পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)-কেও নিকটতম ভাই হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে যেমন তিনি মেনে নিয়েছেন-হযরত মুসার (আঃ) ক্ষমতাকেও তেমনি স্বীকার করেছেন। নবী, রসুল ও তাঁদের ওপরও অর্পিত বাণীসমূহের ওপর তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস রেখেছেন। পরপৃষ্ঠার কয়েকটি বাণী এর সাক্ষ্য বহন করে ঃ-

হযরত আলি (রাঃ) বলেন,

"আমি রসুলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনয়াছি-ইমরানের কন্যা মরিয়ম ছিলেন তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ নারী এবং খাদিজা তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ নারী।"[১]

আবু হোরাইরা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"আমি দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত লোকের মধ্যে ঈসা বিন মরিয়মের নিকটতম-কেননা নবী সব সৎভাই, তাহাদের মাতা ভিন্ন কিন্তু ধর্ম এক।"[২]

"রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কি অবস্থা হইবে তোমাদের যখন ইবনে মরিয়ম নামিয়া আসিবেন তোমাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্য হইতেই হইবে তোমাদের নেতা।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত-

"নবী (দঃ) বলিলেন-কোন বান্দার পক্ষে মানায় না যে সে বলে, 'আমি ইউনুস বিন মত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'-এবং তিনি তাঁহাকে সম্পর্কিত করিলেন তাঁহার পিতার সহিত।"[৩]

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যেমন অন্য নবীদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন পূর্ববর্তী নবীরাও তেমনি হযরতের আগমন বার্তা, সুমহান চরিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীরূপে ঘোষণা করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বেদ-পুরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা, ত্রিপিটক প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এর সাক্ষী হয়ে আজও ধরার বুকে বিদ্যমান। আমার রচিত **'জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'** পুস্তকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। হিংসা-বিদ্বেষ দূরে ঠেলে বইখানি পড়ুন। দেখবেন অজ্ঞতা, হীনতা ও সংকীর্ণতা পালিয়ে গেছে। ভক্তিতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি হৃদয় ভরপুর হয়েছে। আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে আপনার অন্ধ চক্ষু।

জন্ম ও মৃত্যু রহস্য

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত-

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, "এবং তিনি ছিলেন সাদিক ও মাসদূক'-বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের 'সত্ত্বা' মায়ের পেটে রক্ষিত হয় চল্লিশ দিন। তারপর উহা থাকে জমাট রক্তরূপে ততোদিন। তারপর উহা থাকে মাংসপিণ্ড রূপে ততোদিন। তারপর খোদা এক ফেরেস্তা পাঠান এবং তাহাকে আদেশ দেওয়া হয় চার কথার এবং বলা হয়, —লিখ তাহার কর্ম, তাহার জীবিকা, তাহার আয়ুষ্কাল এবং সে ভাগ্যহীন কি ভাগ্যবান। তারপর তাহার মধ্যে ফুঁকিয়ে দেওয়া হয় রূহ (আত্মা)। তারপর তোমাদের কেহ করিতে থাকে এমন কর্ম যে তাহার মধ্যে ও বেহেস্তের মধ্যে ব্যবধান থাকে একহাত মাত্র। কিন্তু তখন বলবৎ হয় তাহার ওপর খোদার লিপি আর সে করিতে থাকে দোজখের কর্ম। আবার কেহ করিতে থাকে এমন কর্ম যে তাহার মধ্যে দোজখের মধ্যে ব্যবধান থাকে একহাত মাত্র কিন্তু তখন বলবৎ হয় তাহার ওপর লিপি আর সে করিতে থাকে বেহেস্তের কর্ম।"[১]

উপরে বর্ণিত হাদিসটি আমার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। শরীর বিজ্ঞানের জটিল জটিল রহস্য। পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা। রসায়ন বিজ্ঞানের প্রকল্প। যৌন বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। তাই আমি অনেক স্থানে আমার লিখিত কয়েকটি পুস্তকের মাঝেই এ বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন-বার বার এ উদ্ধৃতির কেন প্রয়োজন ছিল।

টীকা ঃ ১ । সহীহ্ বুখারী। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। হাঃ নংঃ৮১/২৫২
২ । ঐ ঐ ঐ -৯২/২৬৩
৩ । ঐ ঐ ঐ -৭৮/২৪৯
টীকা ঃ১ । হাদিস। সহীহ্ বুখারী তজরীদ। হাঃ নং -৯/১৮০।
পৃঃ নং-১৭৯-৮০। তর্জমা-আবদুর রহমান খাঁ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিরাকার হতে সাকার এবং সাকার হতে নিরাকারের মাঝে চক্রাকারে ঘুরে আসতে কত জটিল রহস্য, কত জটিল সমাধান ও জটিল বৈজ্ঞানিক কারিগরীই না রয়েছে এ বাণীতে। এখানে আমরা খুঁজে পাচ্ছি 'নজরুলের' ত্রিভুবনের রহস্যময় তত্ত্ব-যে রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

প্রকৃতিগত এ দৃশ্য ভুবনকেই বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে পায়। এখানকার অতি সামান্য দু'একটি পদার্থের বিশ্লেষণ করে কৃতিত্ব নিতে চায়। এ পদার্থসমূহের কার্যক্রম ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন কতে চায়। অথচ জানে না সামান্য একটা পরমাণুর সৃষ্টি করতে। তাদের স্বভাব ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে নব সৃষ্টির অধ্যায় রচনা করতে।

'জন্ম-মৃত্যু' রহস্য বুঝবার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই। যদি থাকত তাহলে তারা ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কতই না খেলা দেখাত! পারে নি। পারবেও না।

"TEST-TUBE'-এ শিশু জন্মের কাহিনী খবরের কাগজে, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করে সারা দুনিয়ার মানুষকে তাক লাগানো হয়েছে। আমি কিন্তু অবাক হই নি। কেননা আমি জানি সারা বিশ্বের সমস্ত বস্তু ল্যাবরেটরীতে জমা করে সে বস্তুর সংযোজনে বা তাদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটি বীর্যকণা বা নারীর ডিম্বকোষ তৈরি করতে পারবে না-যা জন্মের প্রাথমিক Element বা পদার্থ। এ পদার্থ তৈরি করার ক্ষমতা একমাত্র বৈজ্ঞানিক আল্লাহ্‌র যিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা করেছেন এই বলে-

(১) "আফারায়তুম মা তুমনুন? আ-আনতুম তাখলুকুনাহু আম নাহনুল খালেকুন?"[১]

অর্থাৎ

"অতএব তোমরা কি শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ? তবে কি তোমরাই উহা সৃষ্টি করিয়াছ অথবা আমিই সৃজনকারী?"

(২) "এক্‌রা বে-ইসমে রাব্বেকাল্লাজি খালাক। খালাকাল এনসানা মেন আলাক।"[২]

অর্থাৎ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর-যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি মানুষকে ঘনীভূত শোণিতযোগে সৃষ্টি করিয়াছেন (বীর্য যোগে)।"

(৩) "ফাল-ইয়ানজুরুল এনসানু মিম্মা খুলেক। খুলেকা মেম মায়ে দাফিকেন।"[৩]

(৯৬ : ৫-৬)

অর্থাৎ

"অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে-সে কিসের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে? সে সবেগে নির্গত সলিল (বীর্য) দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। উহা পৃষ্ঠ ও পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত হয়।"

সৃষ্টিতত্ত্বের আসল যে উপাদান 'বীর্য' তা কোন্ প্রক্রিয়ায়, রাসায়নিক কোন্ পদ্ধতিতে সৃষ্টি হচ্ছে এ তত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারছেন না। সহবাসে যে বীর্য নির্গত হয় এর মধ্যে থাকে কোটি কোটি বীর্যকণা বা শুক্রকীট। *A কোরআনের এ গভীর তত্ত্ব এতদিন এ রহস্যের জালেই বেষ্টিত ছিল। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর এ শুক্রকীটের সন্ধান মিলল। কোরআনের সত্যতা প্রামাণিত হলো। তবুও অজ্ঞানীদের চোখ ফুটল না। এরা বিশ্বাস করল বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাতেই 'টেস্ট টিউবে' শিশু জন্মলাভ করল। এবারে আসুন-এ ঘটনাটি জেনে নিয়ে আলোচনায় রত হই।

টীকা ঃ ১। কোরআন। সূরা ওয়াকেয়া। আয়াত -৫৮-৫৯।

২। কোরআন। সূরা আলাক আয়াত ১ ও ২

৩। ঐ সূরা তারেক। আয়াত-৫ ও ৬

*A বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে ১ কিউবিক সেন্টিমিটারে আড়াই কোটি শুক্রকীট থাকে। একবার সহবাস করলে যে বীর্য স্খলন হয় তাতে থাকে ২০/২৫ কোটি শুক্রকীট।

FIRST TEST-TUBE BABY BORN
GIRLS BIRTH MAKES MEDICAL HISTORY

OLDHAM ENGLAND (AP)-A baby gril, believed to be first human conceived outside the wombs was reported to be 'quite normal' and in good condition in a hospital early Wednesday, hours after being born to a woman who could not have a child by normal means.

Health authority announced the birth accured at 11.47PM (2247GMT-Wednesday) in the redbricked Oldham General Hospital in this North England mining town.

The mother 30 years old Lesley Brown was reported to be 'Over the Moon with joy'. The baby was conceived when researchers combined an egg from Mrs brown with her husband's sperm in a test-tube, including fertilization, then implanted the Microscopic embryo in the mother's body.

Mrs. Brown has blocked fallopian tubes and had not been able to reproduce naturally.

The fallopian tubes normally carry the eggs from the overy to the uterus. .

A bulletin issued by the North-West regional health authority said, 'the child's condition at birth was excellent and all examinations showed it to be quite normal'.

The father, 38 years old Gibert John Brown, chain smoked in a waiting room outside the forth floor operating there after during the brief operation that made medical history.

Hospital officials said he was close to tears when he was told he had a daughter,--------.

THE DAILY YOUMIURI
JAPAN-THURSDAY,
JULY-27,1978

Tried for nine yers.

Mrs. Brown has been trying to have a baby since he was married nine years ago.

Steptoe, one of the Britain's most distinguished gyanecologist, and Edwards, a Cambridge University Physiologist and geneticist, by passed Mrs. Brown's problem by taking an egg from one of her overies.

He fertilized it with her husband's sparm in a test-tube in their laboratory i Oldham, November 10 and implanted it in Mrs. Brown uterous serveral days latter......."

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্ণ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত চমকপ্রদ ঘটনা হতে আমরা জানতে পারছি যে মিসেস লেসলী ব্রাউন বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ ৯ বছর যাবৎ কোন সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারেন নি। কারণ ডিম্বকোষ থেকে যে স্খলিত ডিম্ব ফেলিপিন টিউবযোগে আনিত হয় এবং পুরুষের শুক্রকীটের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেয় (যা ছবি দেখানো হয়েছে) সে টিউবটি অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ গাইনোলোজী স্পেশালিস্ট মিঃ স্টেপটো তার সহযোগীদের নিয়ে মিসেস ব্রাউনের ডিম্বকোষ থেকে একটি ডিম্ব নিয়ে তাঁর স্বামীর শুক্রকীটের সঙ্গে 'টেস্ট-টিউব'-এর ভিতর মিলন ঘটায়। অতি সাবধানতার সঙ্গে ওল্ডহ্যাম ল্যাবরেটরীতে এ টেস্ট-টিউবটি রাখা হয়। 'ডিম্ব-শুক্রকীট' সম্মিলিত Zygote অর্থাৎ fertilized egg কয়েকদিন পরে মিসেস ব্রাউনের গর্ভে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই শিশু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যখন শিশু পুর্ণাঙ্গ হয় তখন গর্ভ হতে সিজারী অপারেশন করে বের করা হয়।

পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে TEST-TUBE -এ যে 'ডিম্ব-শুক্রকীট' রাখা হয়েছিল তা ল্যাবরেটরীতে সৃষ্টি হয় নি। হয়েছিল মিসেস ব্রাউনের ডিম্বকোষে এবং তাঁর স্বামীর বীর্যে। এ সম্মিলিত 'ডিম্ব-শুক্রকীট' মাত্র কয়েকদিনের জন্য অতি সাবধানতার সঙ্গে টেস্ট-টিউব-এর মধ্যে রাখা হয়েছিল একবিন্দু রক্তে রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। শিশুর হাড়-মজ্জা, অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গ, পূর্ণ আকৃতির নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নয়। Test-tube থেকে এ Zygote-টি মিসেস ব্রাউনের জরায়ুতেই পুনরায় তুলে দেওয়া হয়। এই নারীর গর্ভেই শিশুটি খাদ্য পায়, পূর্ণ আকৃতিতে মানবরূপ ধারন করে। ল্যাবরেটরীতে নয়। বৈজ্ঞানিকদের কোন কৌশলেই নয়।

সৃষ্টির পদ্ধতি যে কত রহস্যময়, কত বিজ্ঞানসম্মত, কত সুশৃঙ্খল সেটাই ব্যক্ত করেছেন সর্বকালের বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি বলেছেন যে এই 'সত্ত্বা'-অর্থাৎ Fertilized egg-চল্লিশ দিন পর্যন্ত একরূপ ধারণ করে। রক্ত -কণিকারূপে পরের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। এরপর মাংস পিণ্ডরূপে অবস্থান করে চল্লিশ দিন। তারপর অস্থি-মজ্জা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির রূপ নিতে ঠিক ঐরূপ চল্লিশ দিন করে সময়েরই প্রয়োজন পড়ে। Time factor বা সময়-সূচি জন্ম প্রকৃতির জন্য যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটাই জ্ঞানীদের লক্ষ্যণীয়। ১ মাস বা ১ দিন বা ১ঘণ্টা কমবেশি হলে সৃষ্টি কোন্ রূপ নিত কে জানে?

হযরতের এ মহাবাণী যে কল্পনাপ্রসূত নয়, অবান্তর নয়, অবৈজ্ঞানিক নয় তার প্রমাণ মেলে জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টিকারী আল্লাহর বাণীতে। কোন্ বস্তুর সমন্বয়ে, কোন্ স্থানে, কোন্ পক্রিয়ায়, কত সময়ে, কোন্ শৃঙ্খলিত উপায়ে একটি সুন্দর, সুঠাম আকৃতির শিশু জন্মলাভ করতে পারে তা দেখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

কোরআন (১) "ইয়া আয়ুহান্নাছো এন্ কুনতুম্ ফি রাইবেম্ মিনাল বায়সে ফা ইন্না খালাকনাকুম মেন্ 'তুরাবেন' সুম্মা মেন্ 'নুৎফাতেন' সুম্মা মেন্ 'আলাকাতেন' সুম্মা মেন্ 'মুদায়াতেম' খালাকাতে ওয়া গায়রে মুখাল্লাকাতেল-লে-লুবাই-ইয়ানা লাকুম ও নেকের -রু ফিল্ আরহামে' মা-নাশাউ এলা এজা আজাল্লে মুসাম্মা নুখরেজোকুম তিফলা সুম্মা লে তাবলুগু আশাদ্দোকুম।" [২২:৪]

অর্থাৎ,

"হে মানবগণ যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও তবে নিশ্চয় আমি এ জন্য মৃত্তিকা হইতে, তৎপর শুক্র হইতে তৎপর রক্তপিণ্ড হইতে তৎপর মাংস পিণ্ড হইতে পুনরাকৃতি ও অসম্পূর্ণাকৃতি সৃষ্টি করিয়াছি-যেন আমি তোমাদিগকে সুবিদিত করি। এবং

যাহাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থিত করাই, তৎপর আমি তাহাকে শিশুরূপে বহির্গত করি যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনিত হও।"[১]

(ক) উপরে উদ্ধৃত বাণীর মাঝে আমরা সৃষ্টির মূল বস্তুর সন্ধান পেলাম। (১) প্রাথমিক পর্যায়ে মাটি। এ মাটি দিয়েই মানব দেহ গঠন করা হয়েছে। এরপর এর অভ্যন্তরে আত্মা ফুৎকার করে সজীব, কর্মক্ষম; বুদ্ধিমান মানব সৃষ্টি করা হয়েছে।

(খ) পরবর্তী উপাদান হিসাবে শুক্র বা বীর্য।

মানব হতে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক রূপে মানব সৃষ্টির তত্ত্বই পরবর্তী আয়াত বা পদগুলোতে বলা হয়েছে। চক্রাকারে বংশবৃদ্ধির জন্য মানবদেহে যে মূল উপাদান প্রয়োজনে সেটাকেই 'শুক্র'-বলা হয়। এরপর কিভাবে রক্তবিন্দু মাংসপিণ্ড অস্থি সংযোগে দেহকে সুগঠিত করা হয়েছে তার বিবরণ (গ) দেওয়া হয়েছে-'আলাক' ও 'মুদাতেম' শব্দযোগে। এ ছাড়া এ বাণীতে সুনির্দিষ্ট কালের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যা সৃষ্টির জন্য অতীব প্রয়োজন। শৃঙ্খলিত পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক কৌশলেরও ব্যাখ্যা রয়েছে এ মহামূল্যবান বাণীতে। এই মূল উপাদন 'শুক্র' ও সমন্বিত 'ডিম্ব শুক্রকীট'-এর কথা কোরআনে আরও বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কোন ধাঁধাঁয় না পড়েন অথবা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভিন্ন বিশ্লেষণ না দেন এ জন্যই হয়ত এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে আর কয়েকটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(২) (ক) "আলাম ইয়াকু 'নুৎফাতাম'-মিম-মানি ইউম্ না সুম্মা কানা 'আলাকাতান'-ফা খালাকা ফাসাওয়া। ফা জায়ালা মিনহুর রাওজায়নেজ জাকারা ওয়ালা-উন্‌সা।" [৭৫:৩৭-৩৯]

অর্থাৎ,

"তবে কি জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত একবিন্দু শুক্রমাত্র নহে? তৎপর সে শোণিতপিণ্ড হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তৎপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি উহা হইতে যুগলরূপে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছিলেন। [সূরা কেয়ামাহ। আয়াত ৩৭-৩৯]

(২) (খ) ফাল-ইয়ান্‌জুরুল ইনসানো মেম্-মা খুলেক। খুলেকা মেনমায়ে দাফিকেন।" (৮৬:৫-৬)

অর্থাৎঃ অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে সে কিসের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। সে সবেগে নির্গত সলিল দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। (সূরা-তারেক। আয়াত (৫-৬)

এখানে মূল উপাদন দুটির (শুক্রকীট ও রক্তবিন্দু) উল্লেখ ছাড়াও সৃষ্টির অবস্থান স্থল -'জরায়ুর'-কথা জানানো হয়েছে। আর একটি বিষয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের জন্য রয়েছে। সৃষ্টির অপরূপ কৌশল দেখানোর পর আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতার বিকাশ করেছেন। একই চরিত্র বিশিষ্ট শুক্রকীট ও ডিম্ব সমন্বয়ে যে 'রক্তবিন্দু'-সৃষ্টি হয় সেখান থেকে কোন্ পদ্ধতিতে, রাসায়নিক কোন ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার মাঝে পৃথক লিঙ্গ -পৃথক চরিত্র, ও পৃথক আকৃতি বিশিষ্ট নারীপুরুষের সৃষ্টি হতে পারে এ চিন্তা আমাদের মাথায় দিয়েছেন।

(৩) আলাম নাখলুকুকুম মেম-মায়ে মাহিন। ফা জায়াল নাহু ফি কাররেম মাকিন। এলা কাররেম মা'লুম। ফা কাদ্দারনা-ফা মিনাল কাদেরুন।" [৭৭ : ২০-২৩]

অর্থাৎ,

"তবে কি আমি তোমাদিগকে এক ঘৃণিত সলিল বিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করি নাই? তৎপর আমি

টীকাঃ ১ । কোরআন । সূরা হজ্জ। আয়াত-৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

উহাকে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করিয়াছিলাম। এক সুপরিজ্ঞেয় নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ফলতঃ আমি উহা নির্ধারণ করিয়াছিলাম। অতএব আমি কেমন উত্তম নির্ধারণকারী।"[১]

(৭৭ : ২০-২৩)

(৪) "আল্লাজি আহসানা কুল্লে সাইয়েন খালাকাহু ওয়া বাদা খালকাল ইনসানা মেন তিন। সুম্মা জায়ালা নাসলাহু মেন সুলালাতেন মেম-মায়ে মাহিন। সুম্মা সাব্বাহু ওয়া নাফাকা ফিহি মে রুহিহি ওয়া জায়ালা লাকুম সাময়া ওয়াল আবছারা ওয়াল আফিদাতা কালিলাম্-মা -তাসকুরুন।"[২] (৩২ : ৭-৯)

অর্থাৎ

"তিনিই তাহার সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় সুন্দরতর করিয়াছেন। এবং তিনিই মৃত্তিকা হইতে মানব সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলের সারাংশ হইতে উহার বংশধর করিয়াছেন। অনন্তর উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণসকল, চক্ষুসকল ও অন্তঃকরণ সমূহ করিয়া দিয়াছেন তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাক।

চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানীদের জন্য উপর্যুক্ত মহাবাণীগুলো অমৃতস্বরূপ। অদৃশ্য বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করার জন্য এমন বাস্তব ও চিরসত্যের নির্ভুল বাণীর সন্ধান মেলে না। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবারই চক্ষুস্থির হয়ে যায়। এ তত্ত্বের কোন ভুল নেই। এ রহস্যের কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রতিটি সৃষ্টিই সুন্দর ও সুশৃঙ্খল–তা প্রাণীই হোক, তরুলতাই হোক বা পাহাড় পর্বতই হোক। কোন সৃষ্টিতেই ফাঁক নেই। অভাব নেই।

সর্বপ্রকার সৃষ্টির মধ্যে মানব সৃষ্টিই সবচেয়ে জটিল ও রহস্যপূর্ণ। অতি ছোট একটি জরায়ু প্রকোষ্ঠে এত সব ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে এত মনোরম আকৃতিতে মানবশিশু তৈরি হতে পারে। হাত -পা-চোখ-নাক-কান-মাথা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর -রূপে ও গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ শিশু জরায়ু হতে বের হবার পরই তার দৈহিক ক্রিয়া শুরু হয়। প্রস্রাব পায়খানা খাওয়া সব কিছুরই একটা অনুভূতি আসে। আর সে অনুভূতিতেই সাড়া দেয় তার গর্ভধারিণী মা। জন্মের পূর্বেই মাতার স্তনে পরিপূর্ণ হয় বিশুদ্ধ ও বলকারক ভিটামিনপূর্ণ দুগ্ধ। এ অসীম ক্ষমতা-সেই মহাপরাক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কারোরই নেই। তাই জ্ঞানান্ধদের চ্যালেঞ্জে তিনি বললেনঃ-

(৫) "খালাকাকুম মিন্ নাফসে ওহেদাতুন। সুম্মা জায়ালা মিনহা যাওযাহা ওয়া আন্-জালালাকুম মিনাল্ আন্-আমে সামানিয়াতা আজওয়ায়েন। ইয়াখলুকুকুম ফি বুতুনে উম্মাহাতেকুম খালাকাকুম মিম বাদে খালকেন ফি জুলুমাতে ছালাছেন। জালেকুমুল্লাহ রাব্বুকুমল্লাহুল মূলক। লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ফা আন্না তুছরাফুন্। এন্ তাকফুরু ফা ইন্নাল্লাহা গানিউন আনকুম। ওয়া-লা -ইয়ারদা লে ইবাদিহিল কুফরা। ওয়া এন তাশকুরু ইয়ারদাহু লাকুম।"[১] (৩৯ : ৬-৭)

অর্থাৎ

তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর উহা হইতে তাহার সহধর্মীণী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশু হইতে অষ্ট জোড়া অবতীর্ণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীগণের গর্ভে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টির পর সৃষ্টি করিয়াছেন। এইতো তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তাঁহারই আধিপত্য। তিনি ব্যতীত

টীকা : ১ । কোরআন। সূরা মোরছালাত। আয়াত-২০ -২৩।

২ । কোরআন। সূরা সেজদা। আয়াত ৭-৯।

টীকা : ১ । কোরআন। সূরা জোমর। আয়াত ৬-৭

কোনই উপাস্য নাই; অতঃপর তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? যদি তোমরা অবিশ্বাস কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর সুপ্রচুর এবং তিনি স্বীয় সেবকগণের অবিশ্বাসে সন্তুষ্ট নহেন; এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য উহাতেই সন্তুষ্ট হন।"

(৬) "হুয়াল্লাজি ইউ-সাব্বিরুকুম কাইফা ইয়াশা-ও" (৩:৬)

অর্থাৎ

"তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী 'জরায়ুর' মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন। সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই।"[২]

(৭) "ইয়া আয়ুহাল এন্ সানো মা-গাররাকা। বে রাব্বেকাল কারিম। আল্লাজি খালাকাকা ফাসাওয়ালাকা ফায়াদা লাকা। ফি আইয়ে সুরাতেম-মা-সায়া-রাক্কাবাকা।" (৮২:৬-৮)

অর্থাৎ

"হে মানব! তোমার সেই মহিমান্বিত প্রতিপালক হইতে কিসে প্রতারিত করিয়াছে? তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে সুগঠিত করিয়াছে, অনন্তর তোমাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি তোমাকে যেরূপ আকৃতিতে ইচ্ছা সংযোজিত করিয়াছেন।"[৩]

সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার সৃষ্টির রহস্য গভীর। কোন্ পদ্ধতিতে, কোন্ প্রক্রিয়ায়–এ মানব শিশু জন্মলাভ করে, বর্ধিত হয় তার সামান্য একটু বিবরণ ওপরে বর্ণিত সূরাসমূহে মেলে। জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের চোখ খুলে দিতেই হয়ত সৃষ্টিকর্তা এ বাণীসমূহ অর্পণ করেছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর। এ বৈজ্ঞানিকের বাণী হাতে নিয়েই আমার পরিচ্ছেদ মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর। এ বৈজ্ঞানিকের বাণী হাতে নিয়েই আমরা পরিচ্ছেদ আরম্ভ করেছি। এ বাণীর সারবত্তা প্রমাণ করতে তাই সমুদ্র মন্থন করে যা পেয়েছি তাই সন্নিবেশিত করেছি ওপরে উদ্ধৃত বাণীর মাঝে। বিরক্তিকর হলেও আলেম ওলামা, শরীর বিজ্ঞানী ও রসায়ন বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করছি এগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করতে। কেন বিভিন্ন সূরায় বীর্য-মণি বা শুক্র বিন্দুর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে–বিভিন্ন চরিত্রে ও রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চলুন এ নিয়ে একটু আলোচনা করি ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছি।

(১) নুৎফাতান ঃ-এর অর্থ বীর্য, শুক্র বা মণি। অলৌকিকভাবে মানবদেহে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বস্তু। তরল পদার্থ–যা ফোঁটা ফোঁটা বা চুয়ে পড়ে।

(২) আলাক ঃ- অর্থ–ঘৃণিত রক্তবিন্দু। (Fluid liquid)

(৩) সুলালাত ঃ- অর্থ–নিষ্কাশিত বস্তু, শ্রেষ্ঠতম অংশ, উৎপাদিত বস্তু।

(৪) মাহিন ঃ- অর্থ–অবজ্ঞাত, নগণ্য তরল পদার্থ। এ সৃষ্টিতে কোন পদার্থের সমন্বয় রয়েছে তা রসায়নবিদগণ খুঁজে পায় না। সংমিশ্রিতজাত তরল পদার্থ।

(৫) তুমনুন ঃ- অর্থ–শুক্রকীট, মনুষ্য সৃষ্টির মূল বস্তু।

(৬) আরহাম ঃ- অর্থ– জরায়ু গহ্বর। যে স্থানে সৃষ্টি রূপলাভ করে। রেহেম ধাতু হতে উৎপন্ন। এখানে শিশুর উর্বরতা প্রাপ্তি ও বৃদ্ধি লাভ করে। বৃক্ষ যেমন তার মূল দ্বারা মাটি হতে প্রয়োজনীয় পদার্থ টেনে শাখা -প্রশাখা -কাণ্ড ও পত্রের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ সমস্ত বৃক্ষে সরবরাহ করে বৃক্ষের বৃদ্ধি ও উর্বরতা ঘটায় এ জরায়ু ঠিক তদ্রূপ কাজ করে।

---

২ । কোরান। সূরা আল-ইমরান। আয়াত-৩

৩ । কোরআন। সূরা এনফেতার। আয়াত–৬-৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরে বর্ণিত শব্দগুলো নিরর্থক নয়। প্রতিটি শব্দেরই বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আসল উপাদান বা বস্তুটিকে 'নুৎফাতান' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বস্তুটি পিচ্ছিল। অসংখ্য শুক্রকীটের আধার। সবেগে নির্গত। অণ্ডকোষ হতে নিষ্কাশিত। ধমনীর মাধ্যমে সবেগে জলের ন্যায় প্রবাহিত। এ জন্যই 'সুলালাম মেম-মায়ে' বলা হয়েছে। এর অর্থ অবজ্ঞাত সলিল। জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অথচ জল নয়। কিন্তু জলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-সবেগে প্রবাহিত, কখনও স্থির। অচল নয় সচল। কঠিন নয় তরল। এ স্বাভাবটি সূরা তারেকে পরিষ্কার বলা হয়েছে: 'খুলেকা মিম-মায়ে দাফিকেন' অর্থাৎ সবেগে নির্গত সলিল দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই যে সলিল বা জল, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত নয়। এই জন্যই অবজ্ঞাত বা 'সুলালাতন' বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই অবজ্ঞাত সলিলের অভ্যন্তরে রয়েছে মূল সৃষ্টির উপাদান যাকে 'ভুমনুন' অর্থাৎ শুক্রকীট বলা হয়। এ 'নুতফাতান'-এ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ন্যায় দু'টি উপাদানে মিশ্রিত নয়। একক উপাদান শুক্রকীট। অথচ সংখ্যায় কোটি কোটি। একক ধর্ম পালন করেও বিদ্বেষ বশে ধ্বংস হয় না। অবজ্ঞাত অর্থটি অত্যন্ত তাৎপর্যশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ উপাদানের সংমিশ্রণে এ তরল পদার্থ সৃষ্টি আজও তা রসায়নবিদগণ বের করতে পারেন নি।

আলাক অর্থ-রক্তবিন্দু। এ রক্তবিন্দুকে 'ঘৃণিত' বিশেষণযোগে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ 'আলাক'টা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একবিন্দু রক্ত যা 'ডিম্ব-শুক্রকীট' সমন্বয়ে গঠিত। এটাকেই শারীরবিজ্ঞানীরা Fertilized egg বা Zygote বলে।

ঘৃণিত বলার কারণ হিসাবে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে অণ্ডকোষ হতে নিষ্কাশিত হয়ে এ বীর্য মূত্রদ্বারের মাধ্যমেই স্খলিত হয়। বাহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বারে মধ্য দিয়ে যে বস্তু নির্গমন হয় তা ঘৃণিত। যেমন—মল ও মূত্র। ডিম্বকোষ ও অণ্ডকোষ হতে ডিম্ব এবং শুক্রকীট বের হয়ে যে রক্তবিন্দু বা আলাক সৃষ্টি করে তাকে এজন্য ঘৃণিত বলা হয়েছে। সৃষ্টির অমূল্য মণি বা বীর্য সহবাসে যে সুখ দান করে তার তুলনা এ বিশ্বে আর কিছু নেই। আথচ স্খলিত হবার পরেই হয় ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, নিজের বীর্য নিজের কাছেই ঘৃণিত। মধুমিলনের এ উপাদানে যে স্ত্রী হয় আনন্দে দিশেহারা, উন্মাদ, ভাবি সন্তানে জননী-সে স্ত্রীও সহবাসের পরে এ বীর্যকে করে ঘৃণা। মন ও দেহকে পবিত্র করতে জলের সন্ধান করে। এর চেয়ে বেশি বিশ্লেষণের আর প্রয়োজন আছে কি?

'আরহাম'-যে স্থানে মানবশিশু জন্মলাভ করে, রূপলাভ করে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, পূর্ণ আকৃতিতে গড়ে উঠে, অলৌকিক প্রক্রিয়ায় নাভির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার রহস্যপূর্ণ স্থানকেই আরহাম বা জরায়ু বলা হয়। মানবদেহে যত জটিল ও কঠিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই থাক না কেন এ মহাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট জরায়ুর তুলনা হয় না। মানবসৃষ্ট কোন ল্যাবরেটরীতেই জরায়ুর উপাদান সৃষ্টি করা যায় না। জরায়ুর আকৃতি -প্রকৃতি ও কার্যকারিতার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলাও সন্নিবেশিত করা যায় না। কোন্ মহাবৈজ্ঞানিক তাঁর এমন কৌশলে নিরাপদ সৃষ্টির আশ্রয়স্থল, বিশ্রামস্থল ও বর্ধিষ্ণুস্থল তৈরি করেছেন তা চিন্তা করলে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধিই লোপ পায় না-তাঁকে পাবার নেশায় পাগল হয়ে আকাশে-বাতাসে ও মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছা হয়। মহাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি এ জরায়ুর সৃষ্টি না হতো তাহলে কিভাবে কোথায়, কোন্ স্থানে এ সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন হতো কান বৈজ্ঞানিক তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারত না। এ জন্যই বৈজ্ঞানিক নবী এ বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে চিন্তাশীল ও বৈজ্ঞানিকদের হতবাক করে দিয়েছেন ও সেই মহাশক্তির আত্মসমর্পন করতেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যে মানবশিশু মাতৃগর্ভে সুনির্দিষ্ট একটি সময় অবস্থান করে-সে শিশু তার খাদ্য,

বাসস্থান, আরাম-আয়েশ কোন কিছুরই অভাব অনুভব করে না। সবকিছুই তার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে দান করা হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভ হতে ভূপৃষ্ঠে আগমন করার পরই দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। রাজার ছেলে, ধনীর কন্যা যে খাদ্য ও আরাম-আয়েশ ভোগ করে একটি কুলি বা রিক্সা মজুরের ছেলে-মেয়ের ভাগ্যে তা জুটে না। এর কারণ কেউ বলে কপাল বা ভাগ্য। আর কেউ বলে ভাগ্য নয় কর্মফল। তাদের মতে পিতামাতার কর্মফলের ওপরেই সন্তানের ভাগ্য নির্ভর করে। আর সন্তানের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে তার ভাগ্য। যে ভাগ্যবান হয় সে গর্ব করে বলে-তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও অসাধারণ পরিশ্রমই তাকে ভাগ্যবান করেছে। দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি অবশ্য নিজের কপালকেই দোষারোপ করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও পরিশ্রমকে ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করে না।

কে ঠিক আর কে বেঠিক? এ দ্বন্দ্বের অবসান হয় নি এবং হবেও না। হবে শুধু তখনি যখন নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এককেন্দ্রিক হবে-সে কেন্দ্র ঐ সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু পাই, যা কিছু ঘটে তা আমার ইচ্ছায় নয়। আমাকে পেতে ও নিতে বাধ্য করা হয়। পাবার থাকলে দৌড়ে যাই। না পাবার থাকলে ঘুমিয়ে থাকি। তাইতে সুখী। তাইতে দুঃখী।

পাহাড় দাঁড়িয়ে থেকে খাবার পায়। কত শক্তি তার গায়। ক্ষয় নেই, লয় নেই, কোটি কোটি বছর ধরে মাথা উঁচু করে আছে। বৃক্ষলতা, তরুরাজি স্ব-স্থানে থেকেই অজস্র খাদ্য পায়। সে কি পরিশ্রম করে? অজগর সাপ, পশুরাজ সিংহ, বৈদ্যুতিক মাছ এরা কি আমাদের মত বুদ্ধি খাটিয়ে হাট-বাজারে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি-বাকরি করে? শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি লাফালাফি ও ছুটাছুটি করে খাদ্য যোগায়? দেহের অনু-পরমাণু কোথা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে? যে 'ভ্রূণ' নিয়ে আলোচনা করলাম সে ভ্রূণ মায়ের পেটে কিভাবে খাদ্য নিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় একথা জন্মের পরে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী হয়েও বলতে পারে না। কেন?

কারণ ঐ জীবিকা, আয়ুষ্কাল ও ভাগ্য আমার হাতে নয় আমার চেষ্টার ফল নয়। মায়ের গর্ভে যখন ছিলাম সন্তানরূপে নয় একখণ্ড মাংসপিণ্ড রূপে ঠিক তখনি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে আমার ঐ কয়েকটি জিনিস। এর পরেই দেওয়া হয়েছে আত্মা বা প্রাণ। তাহলে দেখা যায় প্রাণ পাবার পূর্বেই ভাগ্য পেয়েছি যে ভাগ্য চলে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত।

রসুলের (দঃ) বর্ণিত বাণীর অংশ আমাদের বাস্তব জীবনে প্রমাণযোগ্য। সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছেও অনেক মহাপুরুষকে পদস্খলিত হতে দেখা যায়। আবার বেঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখলকারীকেও দেখা যায় ইমানের দরজায় হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। বেহেস্তের একহাত দূরে থেকে ফিরে আসা ও দোজখের একহাত দূর থেকে ফিরে আসার অর্থ-তার ভাগ্যের খেলা, কর্মফল নয়। যদি কর্মফলে সৌভাগ্যবান হওয়া যেত তাহলে বেহেস্তের নিকট হতে ফিরে আসার কথা এবং দোজখের নিকট হতে ফিরে আসার কথা রসুল (দঃ) বলতেন না। তিনি বলেছেন ঐ লিখনের কথা যা ফেরেস্তারা শিশুর আত্মা শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেবার পূর্বেই আল্লাহ্‌র আদেশ লিখে গেছে ভাগ্যবান কি ভাগ্যহীন এজন্য দু'টি জিনিসের ওপর কারোরই বাহাদুরী খাটে না। বিজ্ঞান এখানে অচল। ওলি-গাউস, নবী-পয়গম্বর, সাধু-ভক্ত, রাজা-মহারাজা, বিত্তশালী-শক্তিশালী, ডাক্তার-কবিরাজ, চোর-বদমায়েস, দস্যু-খুনী সবারই শক্তি এখানে এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এর ওপর বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রতিটি মানুষের জীবনেই রয়েছে।

এবারে আসুন, আমরা সৃষ্টিকর্তার বাণী ধরে রসুলের (দঃ) বাণীর সারবত্তা প্রমাণ করি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাইবেল

(তৌরাত-উপদেশ ৩/১৪)

"ঈশ্বর যাহা কিছু করেন তাহা চিরস্থায়ী। তাহা বাড়াইতেও পারা যায় না; কমাইতেও পারা যায় না। আর ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, যেন তাঁহার সম্মুখে মনুষ্যগণ ভীত হয়। **"যাহা আছে তাহাই ছিল; এবং যাহা হইবে তাহাই ছিল; এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর তাহার অনুসন্ধান করেন।"**

বাইবেল (গীত সংহীতা-দাউদের সংগীত) ১৩৯/১৩-১৬

(১৩) বস্তুত তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমিই মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।

(১৪) আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্মসকল আশ্চর্য তাহা আমার প্রান বিলক্ষণ জানে।

(১৫) আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি-গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম; পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম।

(১৬) তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে। **তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল; যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল যখন সে সকলের একটিও ছিল না।**

কোরআন (৭৮:২৯)

"এবং আমি উহার প্রত্যেক বিষয় লিখিতভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি।"

(সূরা নবা। আয়াত-২৯)

জানি আমার উপরে উদ্ধৃত কথাগুলো নিয়ে চরম একটি সমালোচনা হবে। কেননা যারা কোরআন, হাদিস, তৌরাত, ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী নয় তাদের কাছে এটা হবে অর্থহীন ও হাস্যস্পদ। তাঁরা বলবেন–কঠিন পরিশ্রম না করলে চেষ্টার দ্বারা ইপ্সিত বস্তুর লক্ষ্যে পৌছলে কি করে সফলতা লাভ করে?

"Industry is the mother of good luck" অর্থাৎ পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি–এটা যুগ -যুগের জন্য সত্য। কে পরিশ্রম না করে জ্ঞান অর্জন করে? বিত্তশালী হয়? শাসক হয়? পণ্ডিত হয়? সবার মূলেই পরিশ্রম ও চেষ্টা। কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমার মনেও যে দ্বন্দ্ব আসছে না–তা নয়। সারাটি জীবন যে কত ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছি, কঠিন সংগ্রাম করেছি সে তো সামান্য নয়। যদি এতটুকু না করতাম তাহলে অতি শৈশবেই লেখাপড়া শেষ হয়ে যেত। অজ্ঞানতা, দারিদ্রতা, নির্বুদ্ধিতা আমাকে গ্রাস করে ফেলত। সমাজের কাছে থাকতাম অপরিচিত এক গ্রাম্য চাষীরূপে। শুধু আমার কথাই নয়, এ বিশ্বে যারা কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত-দার্শনিক সবার কৃতিত্ব ঐ একক চেষ্টায়।

আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন ঃ

"এবং মানুষের জন্য এতদ্ব্যতীত কিছুই নাই যাহা সে চেষ্টা করিয়া থাকে।"[১]

(৫৩ : ৩৯)

এখান থেকে বুঝা যায় যে মানুষ যেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করবে সে ঠিক সেইরূপ সফলতা ও ফল লাভ করবে।

টীকা ঃ ১। কোরআন। সূরা নজম। আয়াত- ৫৩ - ৩৯।

উপরে বর্ণিত আল্লাহ্‌র এ মহাবাণী চিন্তায় আর একটি বিপাক আনল। আল্লাহ্‌র কথার সঙ্গে, রসুলুল্লাহর (দঃ) কথার সঙ্গে কি গরমিল হচ্ছে? না মোটেও নয়। রসুল (দঃ) বরং আমাদের চিরদ্বন্দ্বের অবসান করেছেন এই বলেঃ-

(১) "চেষ্টা করা আল্লাহ্‌র আদেশ এবং তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন চেষ্টা দ্বারা তাহা লাভ করা যায়।"[১]

(২) "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার বাসস্থান দোজখ বা বেহেস্তে নির্ধাতির হইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তবে কি যাহা আমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে আমরা তাহারই ওপর নির্ভর করিব? তিনি বলিলেন, তোমরা কাজ করিতে থাক কেননা যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য উহাই সহজ হইবে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার জন্য পূর্ণ কাজগুলি সহজ হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি হতভাগ্যদিগের পর্যায়ভূক্ত হইবে তাহার পক্ষে অসৎ কার্যগুলি সহজ হইবে।"[২]

রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) বাণীর সর্বনিম্ন লাইনটির সহিত কোরআনে বর্ণিত বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবানদের কার্যলিপি যেহেতু জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে সেহেতু দুনিয়াতে তাদের কার্যগুলি সেইরূপই হবে, এতে সন্দেহ থাকবার কথা নয়। এজন্যই কোরআন থেকে আমরা দেখতে পাই ভাগ্যবানদের পরিশ্রমকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"ফা-ছানুইয়াচ্ছেরুহু লেল ইউছরা।"[৩] (২৯ :৭)

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমার পথকে সহজ হতে সহজতর করিয়া দিব। অন্যত্র দুর্ভাগ্যবানদের জন্য বলা হয়েছে ঃ

"বালেত্বাবায়াল্লাজিনা জালামু আওয়াহুম বে-গাইরে এল্‌মে। ফা মাইয়াহদি মান্ আদাল্লাহ। ওয়া মা লাহুম মিন-নাছেরিন।"[৪] (৩০ : ২০)

অর্থাৎ,

"কিন্তু যাহারা অত্যাচারী তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া থাকে; **ফলতঃ আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহাকে কে পথ প্রদর্শন করিতে পারে?** এবং তাহাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই।"

এবারে আমরা মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করি। রসুলের (দঃ)–বাণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেরেস্তা শিশুর আয়ুষ্কাল ও জীবিকা লিখে থাকেন। আয়ুষ্কাল অর্থাৎ শিশু জন্মলাভের পর কতদিন এ ধরায় অবস্থান করবে। কারো অবস্থানের সঙ্গে কারো মিল দেখা যায় না। ইচ্ছা করেও কেউ বেশিদিন বাঁচতে পারে না। আবার অতি বৃদ্ধের দল মরতে চাইলেও মরে না। প্রতিটি মানুষের জন্যই একটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে। এ কাল বা সময় শেষ হলেই মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ এ কথাই ঘোষণা করেছেন তার মহাবাণীতে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েঃ-

"নাহনু কাদ্দারনা বায়নাকুমুল মাউতা ওয়া মা নাহনু বে মাসবুকিন।"

অর্থাৎ,

"আমিই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং আমি উহাতে অসমর্থ নহি।" (সূরা ওয়াকেয়া। আয়াত-৬০)

টীকা ঃ ১ । সগীর। সংগৃহীত–হাদিসের আলো ২য় খণ্ড। পৃঃ নং ১৪৮। হাঃ নং ৭৬২। কৃত–মুঃ আজহার উদ্দিন, এম. এ.।

২ । শায়খান। সংগৃহীত–হাদিসের আলো। কৃত–ঐ । হাঃ নং ৪৮৮।

৩ । কোরআন। সূরা লায়েল। আয়াত –৭।

৪ । কোরআন। সূরা রুম্। আয়াত–২৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যু কি? এর অবস্থা কি এটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা যে একদম অবিশ্বাসী বা কাফের সেও আল্লাহ্ স্বীকার না করলে তাঁর এ রহস্যময় বিজ্ঞান 'মৃত্যুকে' স্বীকার করে। কেননা মৃত্যুর ওপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে আজীবন বেঁচে থাকবে এবং নিজ বাহুবল, জনবল ও ধনবল নিয়ে প্রতাপ দেখাবে সে দুঃসাহসও তার বুকে নেই। কেননা নিজের চোখেই দেখতে পায় যে তার চেয়েও বড় অবিশ্বাসীরা করুন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। কারুন, ফেরাউন, আদ-সমুদ ও নমরূদ বাদশার ইতিহাস না জানলেও নিজের অবিশ্বাসী বাপ-দাদার কথা জানে। এ মৃত্যু সবার জন্যই সত্য। সবার ওপরই তার করালহস্ত প্রসারিত। যুগ যুগ ও শতাব্দীর জন্য সৃষ্টিকর্তার এ বাণী সত্য–

"কুল্লু নাফসুন জায়েকাতুল মাউত"

অর্থাৎ, প্রতিটি জীবই মৃত্যুর সম্মুখীন।

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) -এর যে মহাবাণী ধরে আলোচনা শুরু করেছিলাম এ পরিচ্ছেদে সেখানে উল্লেখ ছিল যে জন্মের পূর্বেই ফেরেস্তাকে লিখতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল ৪টি বিষয় লিখতেঃ- (১) বান্দার কর্ম, (২) জীবিকা, (৩) আয়ুষ্কাল (৪) ভাগ্যহীন কি ভাগ্যবান।

প্রতিটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেই দেখা যায় যে যার জন্য যা লিখিত হয়েছে তদনুযায়ী সে কর্ম করে এবং সে অনুযায়ী ফল পায়। একই মায়ের পেটে জন্মলাভ করে যেমন-রং চেহারা, আকৃতি-প্রকৃতি ভিন্নরূপ হয় তেমনি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, চরিত্র, মন-মানসিকতা, ভাগ্যেরও তারতম্য দেখা যায়। এতে সৃষ্টির লীলা যেমন ধরা পড়ে স্রষ্টার অপরিসীম কারিগরী শক্তিও তেমনি বিকাশ লাভ করে। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ এজন্যই তাঁর মহাশক্তির কাছে দেহ-মন উজাড় করে আত্মসমর্পণ করে।

চলুন রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাণী ধরে এ 'মৃত্যুর' ওপর আরও কিছু আলোকপাত করি এবং দেখি এর প্রকৃত রূপ ও পরিণতি।

মৃত্যুর রূপ

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন ঃ

'মৃত্যুকে উপস্থিত করা হইবে এক মেটে রং -এর মেড়ার আকারে এবং এক নিনাদকারী নিনাদ করিয়া বলিবে, হে বেহেস্তবাসীগণ দেখ, তখন তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবে। নিনাদকারী বলিবে, তোমরা চিন কি উহাকে? তাহারা বলিবে, 'হাঁ, উহা মৃত্যু। কেননা সকলেই মৃত্যুকালে দেখিয়াছে।' তারপর সে নিনাদ করিবে, 'হে দোজখবাসীগণ দেখ; তখন তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবে। সে বলিবে, 'তোমরা চিন কি উহাকে? তাহারা বলিবে, 'হাঁ, উহা মৃত্যু।' কেননা সকলেই উহাকে দেখিয়াছে।' **তখন যবেহ করা হইবে উহাকে।** নিনাদকারী বলিবে-'হে বেহেস্তবাসীগণ, এখন চিরকাল থাক এখানে। আর মৃত্যু নাই; এবং হে দোজখবাসীগণ চিরকাল থাক এখানে আর মৃত্যু নাই; তারপর রসুলুল্লাহ্ (দঃ) পড়িলেন এই ঃ

"হে মুহাম্মদ সতর্ক কর কাফিরদের ঐ দুর্গতির দিন সম্বন্ধে যেদিন মীসাংসা করা হইবে সব বিষয়ের। আর এখন তাহারা এই দুনিয়াবাসীরা উদাসীন এবং বিশ্বাস করে না।"[১]

অদৃশ্য বিজ্ঞানের একটি আলোড়নকারী তত্ত্ব 'মৃত্যু'। মৃত্যু বলতে এতদিন আমাদের একটি ধারণা ছিল নির্জীব প্রাণহীন দেহ। অর্থাৎ যে দেহ হতে আত্মা অপসারিত। কিন্তু মৃত্যু বলতে যে একটি **'সৃষ্টবস্তু'** আছে –যা তার ক্রিয়া ও চরিত্র মাহাত্ম্যে আমাদের দেহ হতে

টীকা ঃ ১ । তজরিদুল বুখারী। তর্জমা-আঃ রহমান খাঁ। হাঃ নং ৪৪/৫৭১

প্রাণের বিলুপ্তি ঘটায় তা জানতাম না। তবে একদিন 'সূরা মুলক' পড়তে বিভ্রান্তিকর একটি চিন্তাধারায় পড়েছিলাম যখন দেখলাম আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন ঃ

"তাবারাকাল্লাজি বে-ইয়াদিহিল মুলক। ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়েন কাদির। আল্লাজি খালাকাল মাউতা ওয়াল হাইয়াতা লে-ওয়াবলু ওয়াকুম আইয়ুকুম আহছানো আমালান। ওয়া হুয়াল আজিজুল গাফুর।"[২] (৬৭ : ১৩)

অর্থাৎ, "তিনিই কল্যাণবর্ধক যাঁহার হস্তে আধিপত্য এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন–যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক সৎকার্যকারী; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।"

বহুদিন পর আল্লাহ্র বাণীর প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেলাম রসুল (দঃ)-এর বাণীতে। এ বাণীর শুরুতেই মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে–"মৃত্যুকে উপস্থিত করা হইবে এক মেটে রং-এর মেড়ার আকৃতিতে"। যার আকৃতি আছে, যার প্রকৃতি আছে, যে সর্বনিয়ত সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করে সে বস্তুত শুধু নির্দেশ নয়, এক অদ্ভুত সৃষ্ট বস্তু। পাপী-তাপী ও পুণ্যবান প্রতিটি মানুষই এ মৃত্যুর কায়া প্রাণত্যাগ করবার পূর্বে দেখতে পায়। ভয়ঙ্কর সে মূর্তি। এর রূপ দেখে চমকে যায়, শঙ্কিত হয়। চিৎকার দেবার শক্তি থাকে না। পালিয়ে গিয়ে এ বীভৎস মূর্তির হাত থেকে নিজকে রক্ষা করবার বুদ্ধি থাকে না। যে সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করত না, উচ্চস্বরে গলাবাজি করে বলতঃ-

'আনা রাব্বুকুমুল আলা' আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক, সেই মুখ থেকেই আবার উচ্চারিত হয় 'আমি বিশ্বাস করিলাম সেই আল্লাহকে যে আল্লাহকে বনি ইসরাইলগণ বিশ্বাস করিয়াছে।'

নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত হইলাম।[১] (১০ : ৯০)। এমন প্রমাণও আমাদের হাতে রয়েছে।

রসুল (দঃ)-এর বাণীর শেষাংশ হতে আর একটি তত্ত্ব আমরা উদ্ধার করছি। যে মৃত্যু কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করে সে মৃত্যুকে যবেহ করা হবে। মৃত্যুকে যবেহ করার অর্থ তার মৃত্যু। নিহত ব্যক্তি যেমন এ পৃথিবীতে আর ফিরে আসে না তেমনি দিবসের পরে বেহেস্ত ও দোজখ পরিপূর্ণ হবার পর মৃত্যুকে যখন যবেহ করা হবে তখন সেও আর ফিরে আসবে না। প্রান সংহার করবে না কোন দোজখীর বা বেহেস্তীর। অপার দুঃখ ও অপার সুখেই কাটবে অনন্ত জীবন।

চলুন মৃত্যুর আরও কিছু রূপ দেখে নেই। এরপর মৃত্যুকালীন অবস্থায় মানুষের কি অবস্থা হয় সেটার কিছু বর্ণনা দিব।

ঃ মৃত্যু সৃষ্টি রহস্য ঃ

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়া শত আবরণের মধ্যে অদৃশ্য করিয়া রাখেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অপেক্ষা বিরাট করিয়া উহার আকৃতি গঠন করত সত্তরটি শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখেন। প্রতিটি শিকলের দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার বৎসরের রাস্তার সমপরিমাণ। ফেরেস্তাগণ উহার পার্শ্ব দিয়া সময় সময় গমনাগমন করিলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। আদি মানুষ হযরত

২ । কোরআন। সূরা মোলক। আয়াত –১-৩।
টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা ইউনুস । আয়াত-৯০

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্ যখন জীবের জীবন সংহার করার কাজে হযরত আজরাইলকে নিযুক্ত করেন তখন হযরত আজরাইল আরজ করিলেন--'প্রভু, মৃত্যু আবার কি?'

আল্লাহ্ তখন শত আবরণ উন্মুক্ত করিতে এবং ফেরেস্তাগণকে মৃত্যুর প্রতি নজর করিতে বলিলেন। সকলে মৃত্যুকে দেখার জন্য দণ্ডায়মান হইলে আল্লাহ্ মৃত্যুকে বলিলেন ঃ-

"তোমার সমস্ত পাখা মেলিয়া ইহাদের ওপর উড়িয়া বেড়াও এবং তোমার সমুদয় চক্ষু খুলিয়া ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আল্লাহর নির্দেশমত মৃত্যু যখন সমস্ত পাখা মেলিয়া এবং চোখ খুলিয়া তাহাদের উপর দিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল তখন সেই ফেরেস্তাগণ সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হাজার বৎসর পর চেতনা লাভ করিয়া তাহারা আরজ করিলেন--'প্রভু, আপনি ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কিছু সৃজন করিয়াছেন কি?"

আল্লাহ্ বলিলেন, "ইহা আমারই সৃষ্টি। আমিই ইহা অপেক্ষা মহিয়ান ও গরিয়ান। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করিতে হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ আজরাইলকে বলিলেন--জীবের জীবন সংহার করার জন্য তোমাকে নিয়োগ করিলাম। আজরাইল বলিলেন-

হে আল্লাহ! ইহাত আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ **মৃত্যু আমা অপেক্ষা শক্তিশালী। তখন আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু অপেক্ষা শক্তিশালী করিয়া মৃত্যুকে তাহার আয়ত্বাধীন করিয়া দেন।"**[১]

এ উদ্ধৃতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য। কেননা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রসুলুল্লাহ্র (দঃ) বর্ণিত মৃত্যু রহস্য-এ প্রথম লাইনটি যথেষ্ট। 'মৃত্যু' যে একটি জীব--ভয়ঙ্কর জীব তা জ্ঞানী ব্যক্তিরা কল্পনার মাঝেই খুঁজে পান। আমাদের মত অতি সাধারণ ব্যক্তিদের সম্মুখে বাস্তব জিনিসটি তুলে না ধরলেও ঐ সম্বন্ধে হাজার চিন্তা করেও এর রূপ কল্পনা করতে পারি না। তাই এত সুন্দরভাবে মৃত্যুর রূপ তিনি তুলে ধরেছেন। যে আজরাইল দৈনিক লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন সংহার করছে সে আজরাইলও এর রূপ দেখে জ্ঞানহারা হয়ে হাজার বছর কাটিয়েছে। এ আজরাইলও এর হাত থেকে রেহাই পাবে না। মৃত্যুর অসাধারণ শক্তি দেখে আজরাইলও ভীত হলে আল্লাহ্ মৃত্যুকে তাঁর আয়ত্বাধীন করলেন। এজন্যই আজরাইল একে হাতে নিয়ে এত খেলা খেলছে। এত প্রাণ সংহার করছে। মৃত্যু আজ আজরাইলের হাতের ক্রীড়নক।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন ঃ

"সুখ নাশককে বহুবার স্মরণ কর।" জিজ্ঞাসা করা হইল উহা কি? তিনি বলিলেন--মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু।"[১]

মৃত্যুকালীন অবস্থাই পার্থিব জীবনের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা বড় কঠিন। দুনিয়ার মায়া, দুনিয়ার মোহ, দুনিয়ার সুখ-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে নিঃসহায় অবস্থায় এক অদৃশ্য রাজ্যের দিকে পা-বাড়ান যে কত কঠিন তা সুস্থ মস্তিষ্কে

টীকা ঃ ১ । সংগৃহীত--হযরত ইমাম গাজ্জালীর দাকায়েকুল আখবার। পৃঃ নং--৯-১০।

টীকা ঃ ১ । তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা। সংগৃহীত--হাদিসের আলো। কৃত-পূর্বে বর্ণিত। ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা নং--১৩৪। হাঃ নং --৬৭৪।

একবার চিন্তা করলেই বুঝা যায়। কিন্তু এ চিন্তা সাধারণত আমাদের মাথায় আসে না। পার্থিব জীবনের সুখ ও লালসায় মানুষ থাকে মত্ত। কবরে পৌছবার পূর্ব পর্যন্ত এ লালসা, এ আকাঙ্খা থেকেই যায়। বাস্তব জীবনে এটা আমরা দেখতে পাই প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই। সর্বজ্ঞাত ও সর্বজান্তা আল্লাহ্ মানুষের মনের মাঝে বিরাজমান। তিনি মানুষের স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা ও কল্পনা সবই বুঝেন তাই তাঁর বাণীতে বলেছেন ঃ

'আল-হাকোমোত্তাকাছোর। হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির।"[২]

অর্থাৎ

"আধিক্যের আকাঙ্ক্ষাই তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যতদিন পর্যন্ত তোমরা কবরে প্রবেশ না করিতেছ।"

আজরাইল যখন প্রাণ সংহার করতে আসে তখন মুমূর্ষু ব্যক্তি তার বিরাট মূর্তি দেখে অস্থির হয়ে যায়। ভয়ে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ে। পালাবার বুদ্ধি থাকে না। সাহায্যের কোন পথ থাকে না। ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, বল-ভরসা, শক্তি -সাহস, কোন কিছুই কাজে লাগে না। দুনিয়ার মোহ কেবল তখনি লোপ পায়। নিজ পুত্র-কন্যা সবাই ঘিরে থাকে কিন্তু কেউ পিতা-মাতার সাহায্যে আসতে পারে না। আজরাইল যখন দুনিয়াকে তার সম্মুখে উপস্থিত করে বলে ঃ

"হে আল্লাহ্র বান্দা! দুনিয়াকে তুমি কেমন পেয়েছিলে? তখন সে বলে ঃ 'দুনিয়া প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ, ভণ্ডামির কারাগার।"

দুনিয়া তখন ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বলবে ঃ 'ওরে পাপী! নরাধম! আমি তোকে চাই নি। তুই আমাকে চেয়েছিলি। তাই ইচ্ছামত যা খুশি করেছিস।'

মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষের খেদ আসে, অনুশোচনা আসে কিন্তু উপায় থাকে না। যদি ঐশ্বর্যের বিনিময়ে, শক্তি-সাহসের দৌলতে, জ্ঞান-গরিমার বাহাদুরীতে এ মৃত্যু যন্ত্রণা হতে কেউ রেহাই পেত তাহলে সবাই পূর্ব হতেই সে প্রস্তুতি নিত। কিন্তু উপায় নেই। একটিমাত্র উপায় যে পৃথিবীর লোভে লালায়িত না হয়ে সৎকাজ করেছে, আল্লাহ্র উপাসনায় মত্ত হয়েছে, রোজা থেকে কাম-রিপু দমন করেছে, আপন ধন খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছে, মৃত্যুযন্ত্রণার কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করেছে, শয়তানের প্রলোভন থেকে দূরে থেকেছে কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই ঐ কঠিন বিপদ থেকে রেহাই পাবে। এটাই হলো প্রস্তুতি যা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন এই বলে ঃ

"মৃত্যুর পূর্বে মরণের জন্য প্রস্তুত হও।"[১] (সগীর)।

মুমূর্ষু ব্যক্তির বুকে স্টেথিস্কোপ দিয়ে, এক্স-রে করে ফটোগ্রাফি নিয়ে সম্মুখে টেলিভিশন ফিট করে বা কম্পিউটার সংযোজনা করেও কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন অবস্থা তুলে ধরতে পারি না। এটা আমারেদ অক্ষমতা না ব্যর্থতা বলতে পারি না। তবুও দুঃখ হয় যে এক্স-রে, গামা-রে ও কসমিক-রে এর মত শক্তিশালী আলো শিরা-উপশিরা, অন্ত্র-তন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড ভেদ করে সমস্ত অবস্থা টেনে আনলেও আনতে পারে না মৃতকালীন ব্যক্তির করুণ আজাবের চিত্র। যদি আনতে পারত বিভীষিকার সেই জটিল ফটোগ্রাফী তাহলে ভ্রূকুটি করে কেউ বলতে পারত না ঃ

'Cowards die many times before their death'.

২ । কোরান। সূরা তাকাছোর। আয়াত--১-২।

টীকা ঃ ১ -২। সংগৃহীত। হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ

'কাপুরুষগণ মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মৃত্যুবরণ করে।' বাধ্য হয়ে বলত অদৃশ্য বিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ঐ কথা ঃ

"সুখনাশককে (মৃত্যুকে) বহুবার স্মরণ কর।"[২]

এ বাণীর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মানুষ যদি মৃত্যুর সেই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে, গোর আজাবের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করে, তাহলে এ দুনিয়াতে সে কোনদিনই পাপ কাজ করতে পারবে না। অন্যকে ফাঁকি দিয়ে, জুলুম-অত্যাচার ক'রে কারো ধন লুট করতে পারবে না খেলাধূলার এ জীবন যে একদিন শেষ হয়ে যাবে, বার্ধক্য শরীরের শক্তি কেড়ে নেবে, মৃত্যু নিকটে এসে হাতছানি দেবে এ কথা তার মনে পড়বে। তাই অন্যায় করবে কিভাবে? মৃত্যুকে স্মরণ করাই মুক্তির পথ। শান্তির পথ। মিলনের পথ। সৌভাগ্যের পথ ও স্বর্গের পথ।

মৃত্যুকালীন অবস্থা যে সুখের নয়, অতীব যন্ত্রণাদায়ক একথা আল্লাহ্ ও রসুলের পবিত্র বাণী হতে বুঝা যায়। অসত্যবাদীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেনঃ--

"ফা-লাউলা এজা বালাগাতেল হুলকুমা ওয়া আনতুম হেনায়েজেন তানজুরুন। ওয়া নাহনু আকরাবো এলায়হে মিনকুম ওয়া লাকেল্লা তুব্‌ছেরুন। ফা-লাউলা এন কুনতুম গাইরা মা'দেনীন।"[১]

অর্থাৎ

"অতঃপর যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে তখন কেন তোমরা উহা রোধ কর না? এবং তখন তোমরা শুধু তাকাইয়া থাক। এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর থাকি কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। অতএব যদি তোমরা শক্তিহীন না হও তবে কেন উহা রোধ কর না?"

"এবং সে জানিবে যে নিশ্চয়ই ইহা বিদায়কাল। এবং সে যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণায় জড়িত হইবে।"[২] (৭৫:২৮-২৯)

মৃত্যুর সময় আত্মা বা রূহ দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকে। আজরাইলকে ধরা দিতে চায় না। হৃৎপিণ্ড হতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে লুকায়। অবেশেষে যখন কণ্ঠদেশে পৌঁছে তখনই আজরাইল তার নির্মম হস্তে প্রাণ সংহার করে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার এ অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারেন না। তাই আজরাইলকে কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দেন। এ কথাটি বুঝা যায় রসুলুল্লার (দঃ) নিম্নোক্ত বাণী হতে। তিনি বলেন ঃ

"মানুষের যখন প্রাণবায়ু বাহির হওয়া আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ উচ্চস্বরে ধ্বনিত হতে থাকে এই বলে ঃ

"ওহে আজরাইল ক্ষান্ত হও। তাহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দাও। তাহাকে আরও একটু সময় আরাম করিতে দাও। তারপর আত্মা যখন কণ্ঠদেশে এসে পৌঁছে তখন বলা হয়-'হে যমদূত! তাহার জীবনের সাথী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বিদায় লইতে একটু সময় দাও। তখন তাহার হাত-পা, চক্ষু-নাসিকা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাহাকে চিরবিদায় দিয়ে বলে ঃ

"কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর আল্লাহ্‌র অসীম করুণা বর্ষিত হউক।"

ইহার পরেই আসে চরম পরিণতি। হাত-পা নিস্তেজ হইয়া যায়। চক্ষু হইয়া পড়ে

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা ওয়াকেয়া। আয়াত--৮৩-৮৬

২ । কোরআন। সূরা কেয়ামাহ। আয়াত--২৮-২৯

জ্যোতিহীন। কর্ণদ্বয় হারায় শ্রবণশক্তি এবং দেহরাজ্য আত্মাহীন অবস্থায় অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে।"[১]

এই চরম দুরাবস্থার কথা আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন ঃ-

"ওয়া-যা-য়াত সাকবাতুল মাউতে বেল হাক্কে। জালেকা মা কুনতা মিনহু তাহিদ।"[২] (৫০ : ১৯)

অর্থাৎ- "এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই উপস্থিত হইবে; ইহাই তাহা যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতে।"

'মৃত্যুর বিকার' আল্লাহ্‌র এ সাবধান বাণী হতেই বুঝা যায় মৃত্যুর সময় কি কঠিন অবস্থা দাঁড়াবে। এই মৃত্যুকে ভয় কে না করে? নবীরা পর্যন্ত এ মৃত্যু যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। মানুষের কাছেও দোয়া চাইতেন। হযরত ইসা (আঃ) মানুষকে দেখলেই বলতেন ঃ

"হে বন্ধুগণ! তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ্-পাক আমার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু যন্ত্রণা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি ভয়ে জীবন-মৃত হইয়াছি।"[৩]

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিজেও আল্লাহ্‌র নিকট মৃত্যুর প্রার্থনা করেছেন এই বলে ঃ

"হে আল্লাহ্! আমার মৃত্যু যন্ত্রনাকে সহজ কর।"[৪] শুধু নিজের জন্যই নয় তাঁর উম্মতদের এ যন্ত্রণা হতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনা জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন বলে জানা যায়। এর ওপর পরে আলোচনা করছি।

হযরত মুসা (আঃ) পাপীদের মৃত্যুযন্ত্রণা কিরূপ হবে তা জানতে চেয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ্ তার মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা কিরূপ তা জিজ্ঞাসা করেন। হযরত মুসা (আঃ) উত্তর দেন ঃ

"জীবন্ত পাপীকে জ্বলন্ত কড়াইয়ে ভাজিয়া থাকিলে সে যেমন উড়িয়াও পালাতে পারে না, মরেও যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পায়'না-ঠিক তেমনি।"[৫]

হযরত ইদ্রিস (আঃ) বলেছেন ঃ

"জীবন্ত চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া ছাড়াইবার সময় যেরূপ কষ্ট হয় আমি তাহার চেয়েও বেশি কষ্ট পাইয়াছি।"[১]

মৃত্যু যন্ত্রণা শুধু মানুষের নয় প্রাণী মাত্রই হয়ে থাকে। একটি গরু, ছাগল বা মুরগী যবেহ করে ছেড়ে দিলে দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তেজ হয়ে চুপ করে না। বহুক্ষণ লাফালাফি করে পা মাটিতে আঁছড়িয়ে তারপর মৃত্যুবরণ করে। অলি-গাউসদের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে আজরাইল মানুষের মত এদের জীবন সংহার করে না। এদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া মাত্রই এ যন্ত্রণা শুরু হয়। এদের আত্মাও পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ আশ্রয় পায় না। মানুষের মত পশুর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক ও দূরদর্শিতা নেই। আমরা যেমন মৃত্যুকে গভীরভাবে স্মরণ করি, মৃত্যুর চিন্তায় আতঙ্কগ্রস্ত হই, মুমেন বান্দারা আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করে, জীবজন্তুরা তা বুঝে না এবং আতঙ্ক গ্রস্তুতও হয় না বলে মনে হয়। যদি মৃত্যু যন্ত্রণা বুঝতে

টীকাঃ ১ । সংগৃহীত -দাকায়েতুল আখবার -কৃত ইমাম গাজ্জালী। পৃঃ নং-২০

২ । কোরআন। সূরা ক্বাফ। আয়াত-১৯

৩ । হইতে ৫ । হাদিস। সংগৃহীত-নেয়ামুল কোরআন। কৃত মৌলানা মুহাম্মদ শামসুল হুদা, বি. এ., বি. এল. (শেষ পৃষ্ঠা)

টীকা ঃ ১ । হাদিস। সংগৃহীত-নেয়ামুল কোরআন। কৃত মৌলানা মুহাম্মদ শামসুল হুদা, বি. এ., বি. এল. (শেষ পৃষ্ঠা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারত তাহলে এদের কি অবস্থা হত তা হযরতের একটি বাণী হতে বুঝা যায়।

তিনি বলেছেন–"ভোগবিলাস বিনাশকারী মৃত্যুর চিন্তা অধিক পরিমাণে কর। আমরা মৃত্যু যন্ত্রাণার অবস্থা যেরূপ জানি পশু-পক্ষীরা যদি সেরূপ জানত তাহলে আমাদের কারো ভাগ্যে স্থূলকায় পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করা হত না। অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়ে এরা মোটা-তাজা হত না।"[২] এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র বাণী নিম্নরূপ ঃ-

"যদি তোমরা অবলোকন করিতে যখন ফেরেস্তাগণ অবিশ্বাসীদিগের প্রাণ হরণ করিবে তখন তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে থাকিবে যে তোমরা প্রজ্জ্বলিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।"[৩] (৮ : ৫০)

মৃত্যু যন্ত্রণা কি সবার সমান?

এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত জটিল। কেউ বলেন–মুমেন ব্যক্তিরা মায়ের কোলে শিশুরা যেমন ঘুমায় তেমনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আবার কেউ বলেন এ যন্ত্রণা হতে কেউ রেহাই পায়নি, পাবেও না। এ যন্ত্রণা সবার জন্য এক। এ মীমাংসা কে করবে? পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত উদ্ধৃতি হতে আমরা দেখছি রসুলুল্লাহ্ (দঃ) স্বয়ং এ যন্ত্রণা হতে রেহাই পেতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছেন তাঁর নিজের এবং উম্মতদের জন্য। হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুর ভয়ে বলেছেন–'আমি জীবনমৃত' অর্থাৎ জীবন থাকা সত্ত্বেও মৃত। হযরত মুসা (আঃ) 'জীবন্ত পক্ষীকে উত্তপ্ত কড়াইয়ে ভাজার সামিল'–বলেছেন। আর হযরত ইদ্রিস (আঃ) বলেছেন–"জীবন্ত পশুর চামড়া ছোলার মত যন্ত্রণা।" নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতেই তাঁরা এ কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন–'মৃত্যুর পরে তাঁরাও জীবিত হননি–কিভাবে তাঁরা তাদের মৃত্যু যন্ত্রণার কথা বললেন। সব প্রশ্নই জটিল। সব চিন্তাই জটিল। সমাধান করা কঠিন। তাই এ চিন্তায় হাবুডুবু না খেয়ে চলুন যে মহানবীর বাণী ধরে আলোচনা করছিলাম সে বাণীই দেখি ও বিশ্বাস করি। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেননা আমাদের মত মূঢ় ব্যক্তি যদি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ ক'রে বেঁচেও আসে* আর সে বর্ণনা ঢাক-ঢোল পিটেয়েও সবাইকে শুনায় তবুও কেউ বিশ্বাস করবে না। কেননা সবাই জানে আমরা মূঢ় মিথ্যাবাদী।

---

[২] । হাদিস। সংগৃহীত। নেয়ামুল কোরআন। কৃত –মৌলানা মুহাম্মদ শামসুল হুদা, বি. এ., বি. এল. (শেষ পৃষ্ঠা)।

[৩] । কোরআন সূরা আনফাল। আয়াত–৫০।

টীকা ঃ * । মৃত্যুর পর পুনরায় বেঁচে ওঠার ঘটনা অস্বাভাবিক। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র নিকট যে তা সম্ভব কোরআন ও ইঞ্জিলের বাণী হতে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিম্নে এই উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ-

"যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তদ্বিষয়ে বিরোধ করিতেছিলে এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ তাহার প্রকাশক হইলেন। তৎপর আমি বলিয়াছিলাম উহার এক খণ্ড দ্বারা আমাকে আঘাত কর; এইরূপে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" সূরা বাকারা (২ : ৭২-৭৩)।

ঘটনাটি এই–হযরত মুসা (আঃ) -এর সময় এক ব্যক্তি তার নিজের ধনবান চাচাকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তির পরিবার হযরত মুসা (আঃ) -এর নিকট এই অভিযোগটি পেশ করেন। হযরত মুসা (আঃ) বলেন–"একটি গরু যবেহ কর এবং এর মাংসখণ্ড দ্বারা মৃত ব্যক্তির ওপর আঘাত কর। তাহলে মৃত ব্যক্তি নিজেই হত্যাকারীর নাম বলে দেবে। এরূপ করায় মৃত ব্যক্তি জীবিত হয় এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়।"

মুমেন ব্যক্তির অবস্থা ঃ- মুমেন বা বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রাণ সংহার করতে আজরাইল অর্থাৎ যমদূতকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়। কেননা যমদূতের করাল হস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁর আত্মা বলবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া তুমি আমাকে নিতে পারবে না। তোমাকে আমি চিনি না। আজরাইল যখন বলবেন–আল্লাহ্‌র নির্দেশেই এসেছি তখন আত্মা বলবে–

"আল্লাহ্ যখন আমাকে সৃষ্টি করে দেহে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তোমাকে দেখি নি এখন কোথা হতে এসেছ?" [১]

আজরাইল এ কথায় অপ্রতিভ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবেন এবং এ কথাগুলো পেশ করবেন। আল্লাহ্ তখন বলবেন–"আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। সুতরাং তুমি বেহেস্তে চলে যাও এবং আমার নাম খোদাই করা একটি ফলক এনে তাঁর সম্মুখে রেখে দাও।

"আল্লাহ্‌র নির্দেশমত আজরাইল (আঃ) **'বিসমিল্লাহের রহমানির রহিম'** একটি ফলক এনে তাঁর সম্মুখে রেখে দিতেই এই পবিত্র আত্মা মানবদেহ ত্যাগ করে অনন্তলোকে বিলীন হয়ে যাবে।"[২]

রসুল (দঃ)-এর অন্য একটি বাণী হতে জানা যায় যে আজরাইল জীবন সংহার করার সময় মুমেন বান্দার মুখের দিকে অগ্রসর হলে তখন মুখ বলে ঃ–'হে আজরাইল আর অগ্রসর হইও না। কারণ আমা দ্বারা এই বান্দা সর্বদা আল্লাহ্‌র জয়গান করিয়াছে।'

এরূপভাবে যমদূত আজরাইল হাত-পা-কান -চোখ যেদিকেই অগ্রসর হয় সেদিকেই বাধা পায়। কারণ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আল্লাহ্‌র পথে কাজ করেছে। তখন আজরাইল আল্লাহ্‌র কাছে একথা জানালে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তুমি তোমার হাতের তালুতে আমার নাম লিখে আমার বান্দার চোখের সম্মুখে ধর। আজরাইল (আঃ) হাতের তালুতে আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম লিখে বান্দার সম্মুখে ধরতেই তার আত্মা আল্লাহ্‌র নামে পাগল হয়ে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা ভুলে গিয়ে আনন্দে বিলীন হয়ে যাবে।"[৩]

রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) বাণী হতে বুঝা যায় যে পুণ্যবান ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা পাপীদের মত হবে না। তারা তাদের আজাব হতে মুক্তি পাবে। এখন প্রশ্ন–কোন্ কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) নিম্নবর্ণিত বাণীসমূহ বিশ্লেষণ করে চলুন আমরা মুক্তির পথ বেছে নেই।

তিনি বলেছেন ঃ–(১) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য 'সূরা ইয়াসিন' পাঠ করে তার অতীত পাপ মাফ হয়। মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট উহা পড়।"

যে সূরা পাঠে আল্লাহ্ খুশি হন এবং পাঠকারীর অতীত পাপ মাফ হয় সে সূরাটিই পাঠ করতে বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট। এর উদ্দেশ্যই যে তার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার উপশম হয়। আমরা প্রত্যক্ষভাবেও দেখেছি যে সমস্ত ব্যক্তির প্রাণ সহজে বের হচ্ছে না–চরম কষ্ট পাচ্ছে তার পাশে বসে সূরা ইাসিন পাঠ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মা বের হয়ে যাচ্ছে। এই সূরা সম্বন্ধে আরেকটি হাদিস নিম্নরূপ।

(২) "আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টির হাজার বছর আগে 'সূরা তা-হা' এবং 'সূরা ইয়াসিন' পাঠ করেছিলেন। যখন ফেরেশতারা তা শুনলেন তখন আল্লাহ্ বললেন–"সেই জাতিই সুখী যাদের জন্য ইহা নাজেল হবে। সেই হৃদয়গুলোই সুখী যা তা ধারণ করবে এবং সেই জিহ্বাগুলোই ধন্য যা তদনুযায়ী কথাবার্তা বলবে।" (মিশকাত)

টীকা ঃ ১ –৩। হাদিস। সংগৃহীত–দাকায়েকুল আখবার। কৃত –ইমাম গাজ্জালী।(পূর্ব পৃষ্ঠার ১নং টীকা সহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩)"প্রত্যেক জিনিসের হৃদয় আছে। কোরআন শরীফের অন্তঃকরণ সূরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে তার জন্য আল্লাহ্ দশ বার কোরআন সম্পূর্ণ পাঠ করার পুরস্কার লিপিবদ্ধ করেন।" (তিরমিজী)

উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'সূরা ইয়াসিন' এমন একটি মহামূল্যবান সম্পদ যা দ্বারা বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন। শুধু তাই নয় ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অতুলনীয় সম্পদ। পরলোকের পাথেয়। মুক্তির একমাত্র ঔষধ।

যে সূরা পাঠে দশবার কোরআন শেষ করার পূণ্য মেলে সে সূরা যার অন্তরে আছে অর্থাৎ মুখস্থ রয়েছে তার কাছে যমদূত আসতে সংকোচ বোধ করার কথাই বটে। যে ব্যক্তি চোখ দিয়ে এ সূরা দেখেছে, কান দিয়ে শুনেছে, হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে এ পবিত্র বাণী তার প্রাণলীলা আজরাইল ইচ্ছামত সংহার করতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী তাঁর নাম ফলক **'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'** দেখাতে হয় ঐ মুমূর্ষু পুণ্যবান ব্যক্তিকে।

মধু পান না করলে যেমন মধুর স্বাদ বুঝা যায় না, তেমনি কোরআন পাঠ না করলে, কোরআনের কলব সূরা ইয়াসিন অন্তরে না তুললে এবং এর মর্ম অনুধাবন না করলে এর প্রকৃত গুণ বুঝা যায় না। এ জন্যই ফেরেশতারা এ সূরা শুনে মন্তব্য করেছেন–**"সে জাতিই সুখী যাদের ওপর তা অবতীর্ণ হবে।"**

আর একটি আমলে আমার বিশ্বাস মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয়। সেটা হলো 'আল্লাহ্' নামের জেকের। অর্থাৎ মনে মুখে **'আল্লাহ্'** অথবা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**।

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) স্বয়ং মৃত্যুর সময় এ বাণীই পাঠ করেছেন। এই বলে ঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্না-লিল মাউতে ছাকারাতুন।"

পুণ্যবানদের আত্মা যে পাপীদের আত্মার মত কষ্ট পাবে না এটা বুঝা যায় রসুলুল্লাহর (দঃ) নিম্নোক্ত হাদিস হতে যা নিম্নরূপ ঃ

"যখন কাহারো ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরজগতে যাত্রার সময় নিকটবর্তী হয় তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেস্তা স্বর্গীয় কাফন ও সুগন্ধি লইয়া তাহার দৃষ্টির প্রান্তসীমায় বসিয়া থাকে। অতঃপর যমদূত তাহার মাথার পাশে উপবেশন পূর্বক আরজ করেন ঃ "ইয়া আয়ুহান নাফছো মোতমাইয়েন্নাত'। অর্থাৎ হে প্রসন্ন আত্মা! তাড়াতাড়ি আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টির জন্য বাহির হইয়া আইস।"

রসুল (দঃ) বলেন–"তখন আত্মা বাহির হইয়া আসে এবং তাহার মুখ হইতে পানির বিন্দু পড়িতে থাকে –যেমন মশক হইতে পড়িয়া থাতে তৎপর তাহারা তাহার আত্মাকে ধরিয়া উক্ত কাফনের মধ্যে রাখিয়া দেন। তখন তাহা হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকে।"

কোরআনের ৩০ পারায় 'সূরা ফজর' এ রয়েছে "ইন্না আয়ুহান নাফছোল মোতমাইন্নাত। তুরজি এলা রাব্বেকা রাদিয়াতাম মারদিয়াতা। ফাদখুলী ফি এবাদি ওয়াদখুলী জান্নাতী।"

অর্থাৎ,

"হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাগমন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"

পরিতুষ্ট আত্মা অর্থাৎ Satisfactory soul -কেই আল্লাহ্ সম্বোধন করেছেন। প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তাঁর দিকে প্রত্যাগমন করার অর্থ হতে বুঝা যায় যে চরম কষ্টের কোন অনুভূতি না নিয়েই আল্লাহর দিকে পুণ্যবানদের আত্মা উর্ধ্বগমন করছে। পাপী বা সাধারণ মানুষের জন্য এ বাণী নয়।

পবিত্র বাইবেলও এ কথারই প্রমাণ দেয়। নিম্নে এর কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

(১) গীত সংহিতা। ১১৬/১৫ ঃ

"সদা প্রভুর দৃষ্টিতে বহুমূল্য তাহার সাধুগণের মৃত্যু।"

(২) হিতোপদেশ। ১২/২৮ ঃ

"ধার্মিকতার পথে জীবন থাকে। তাহার গমনপথে মৃত্যু নাই।"

শেষের লাইনটি হতে বুঝা যায় এ নশ্বর পৃথিবী হতে যখন পুণ্যবান বক্তিদের আত্মা বহির্গত হয় তখন তার কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। আত্মার গমন পথে কোন বাধা বা ক্লেশ আসে না।

এবার দেখি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র বাণীতে উপরে বর্ণিত বাণীর সাক্ষ্য মেলে কি-না।

তিনি বলেছেন ঃ

"শিশু যেরূপ মাতৃগর্ভ হতে বহির্গত হয় মোমেনগণও সেইরূপ পৃথিবী হতে বহির্গত হয়।"[১]

এখান থেকে দেখা যায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী নির্ভুল। বিশ্ব মানবজাতির জন্য ভয় প্রদর্শক, সঠিক ও সুপথের নির্দেশদাতা। পারলৌকিক মহান কল্যাণের সংবাদদাতা। চলুন, তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী ধরে আমরা জ্ঞান লাভ করি, সাবধান হই। কবরের ভয়াবহ অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করি।

আল্লাহ্ যিনি সর্বজীবকুলের সৃষ্টিকর্তা তিনি এ মহানবীর সম্বন্ধে এ জন্যই বলেছেন ঃ

"নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং তুমি নরকবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।"[১] (১ : ১১৯)

কবরের মাঝে

মৃত্যুর পর প্রতিটি নরনারীকেই তা যে কোন জাতিরই হোক এক অজ্ঞাত স্থানে যেতে হয়। এ স্থানের পরিবেশ কেমন, সুখ-দুঃখ কেমন, আমরা কিছুই জানি না। অনুভব করি না। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাধক-মহাসাধক কেউ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে অথবা বিজ্ঞানের কোন যন্ত্রকৌশলে দেখতে পায় না–মাটির সামান্য তিন-চার ফুট নিচে মরা মানুষকে নিয়ে কি খেলা চলছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা মহাশূন্যের চাঁদে, গ্রহ-নক্ষত্রে পাড়ি জমিয়েছে, মহাসাগরের তলদেশ থেকে ছবি আনছে, মণিমুক্তা সংগ্রহ করছে। পৃথিবীর গহীন প্রদেশ হতে সোনা-রূপা, তেল, গ্যাস উত্তোলন করে পারিবারিক জীবনে কাজে লাগাচ্ছে, শরীরের অভ্যন্তরে এক্স-রে, গামা-রে, কসমিক-রে ব্যবহার করে এর ক্রিয়া-কৌশল দেখছে কিন্তু পারছে না সামান্য মাটির নিচে অবস্থিত মৃত মানুষের শরীরটির ওপর কোন পরীক্ষা চালাতে। শান্তি-অশান্তি, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না এ দেহের সঙ্গে জড়িত কি-না তা আজও কোন যন্ত্রে ধরা পড়ছে না। তবে কি এ দেহের ওপর কোন ক্রিয়া নেই? এ দেহ কি পচে-গলে কীট-পতঙ্গের খোরাক হচ্ছে? আর মাটির সঙ্গে মিশে তা বৈজ-অজৈব পদার্থে রূপলাভ করছে? যদি তাই হয় তবে মৃত্যুতে ভয় কেন? মৃত্যুই যদি নিস্তারপর্ব হয় তাহলে মৃত্যুতে আনন্দিত হবার কথা। সংসারের এ নির্মম জ্বলা, বার্ধক্যের শক্তিহীন অশান্তি, দারিদ্রের চরম কষাঘাত, অত্যাচারীর পাষাণ পদাঘাত থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তবনে পাখির মত আকাশে ঘুরে বেড়াবার কথা। মৃতের জন্য তবে

টীকা ঃ ১ । সগীর। সংগৃহীত– হাদিসের আলো। কৃত – পুর্বে বর্ণিত।

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা আল-ইমরান। আয়াত –১১৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিলাপ কেন? মৃত আত্মার প্রতি প্রার্থনা কেন? তার শান্তির জন্য দান-খয়রাত কেন? তবে কি সেখানে কিছু ঘটছে? বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে পারবে না। দার্শনিকরা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। রেডিওতে মৃত ব্যক্তির কোন খবর মেলে না। টেলিভিশনের পর্দায় এ চিত্র ধরা পড়ে না। কোন সাংকেতিক ধ্বনিও কানে বাজে না। তাই বিশ্বাস করবার কোন যুক্তিই নেই। মৃত চিরদিনই মৃত। ধুলির দেহ ধুলির সঙ্গে লীন হয়ে যায়। ধুলি যেমন অচল, মৃতদেহও তেমনি অচল। এখানে সুখও নেই-দুঃখও নেই। চেতনা নেই। বোধশক্তিও নেই। হাসিও নেই। কান্নাও নেই। ব্যাথাও নেই-জ্বালাও নেই। দুঃখ নেই-বেদনাও নেই। প্রেমও নেই-বিরহও নেই। এটাই আমাদের ধারণা।

এবারে দার্শনিক হয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একটু লড়াই করি। যদি হেরে যাই তবে বলব এবং স্বীকার করব যে কবরের মাঝে মৃতব্যক্তির সঙ্গে কোন খেলাই চলছে না। মৃত অর্থ ধুলি, নিষ্ক্রিয়, অচেতন, অজৈব।

সজীব প্রাণীর ওপর অর্থাৎ আমার দেহের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব খাটাই। দেখি রেডিওতে কিভাবে ধরা পড়ে? কিভাবে এর ছবি টেলিভিশনে আসে?

দুঃখে যখন কাঁদি তখন বিজ্ঞানের কোন মাপ্যযন্ত্র কি বলে দিতে পারে এর ওজন কত? সুখে যখন হাসি তখন কি কিলোমিটারে ধরা পড়ে এর প্রসারতা? প্রেমের গভীরতা, আঘাতের নিদারুণ ব্যথা, প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতার ছবি কি টেলিভিশনে ধরা পড়ে? অথবা স্কেলে পরিমাপ করে রেকর্ড করা যায়?

থার্মোমিটারে জ্বর মাপা যায়, জ্বরের জ্বালা মাপা যায় না। ল্যাকটোমিটারে দুধ মাপা যায়, দুধের স্বাদ মাপা যায় না। দাড়িপাল্লায় লবণ, চিনি মাপা যায় কিন্তু এর তিক্ততা ও মিষ্টতা মাপা যায় না। মানুষ মাপা যায় কিন্তু মন মাপা যায় না। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আশা-ভরসা, জ্বালা-যন্ত্রণা, ক্ষুধা -তৃপ্তি, হাসি -কান্না, আনন্দ -নিরানন্দ কোন্‌টি যন্ত্রে ধরা পড়ে? কোন্‌টি মাপা যায়? কোন্‌টি গ্রাফ-পেপারে চিহ্নিত করে পড়ান হয়? বলতে পারবেন কোন আধুনিক চিন্তাকৌশলী-বৈজ্ঞানক? যদি এর একটিও পারে তবে বলব কবরের মাঝে কোন ঘটনাই ঘটে না। আর যদি না পারেন তবে আসুন ঐ মহাবৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মহাসত্যের বাণী শুনুন। আর সচেতন হয়ে আত্মাকে নির্মল করুন। অদৃশ্য বিজ্ঞানের অদৃশ্য টেলিভিশনে এর ছবি দেখুন। প্রকৃত রূপ দেখুন।

তিনি বলেছেন ঃ

"যদি জানিতে মৃত্যুর পর কি সাক্ষাৎ করিবে তবে কখনও তৃপ্তি ভরে কিছুই আহার বা পান করিতে পারিতে না বা বিশ্রাম লাভের নিমিত্তে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতে না বরং একটি উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে এবং নিজেদের বিষয়ে ক্রন্দন করিতে।"[১]

উপরে উদ্ধৃত বাণী হতে দেখা যায় যে কবরের মাঝে বেশ চমকপ্রদ ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে। এমন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না। বিপদ আসে কেটে যায়। সূর্য ডুবে আবার উঠে। অন্ধকারের পর আলো আসে। দুঃখের পর সুখ আসে। তৃষ্ণার জ্বালা জল দূর করে। ক্ষুধার জ্বালা খাদ্যে নিবৃত্ত হয়। বিরহের জ্বালা প্রেমে নিপাত যায়। কান্নার পর বুক সুস্থ হয়। ঝড়ের পর পৃথিবী শান্ত হয়। পূর্ণ চাঁদ ক্ষয় পেয়ে আবার আবির্ভাব হয়। ডাকাতের পিছে পুলিশ থাকে। অসহায়ের পিছে সহায় থাকে। অশান্তির মাথায় শান্তির ঝাণ্ডা থাকে। কিন্তু একি!

টীকা ঃ ১ । হাদিস-সগীর। সংগৃহীত আলো, ২য় খণ্ড। পৃঃ নং ১৪৯। কৃত-আজাহার উদ্দিন।

কবরে সাহয্যকারী নেই। পুলিশের ডাণ্ডা নেই। ধনের উপকারিতা নেই। ক্ষমতার বাহাদুরী নেই। মর্যাদার আসন নেই। দুষ্কর্মের প্রতিফলন শাস্তি-কঠিন শাস্তি। যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই। পালাবার জায়গা নেই। চিৎকারে কোন লাভ নেই।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কথাগুলো সত্য? কবরের করুণ অবস্থার কথা যদি কেউ জানে তবে এ পৃথিবীতে কেউ পানাহার করবে না। বিছানায় গিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহেও অবসর নেবে না। উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বক্ষে করাঘাত করবে। নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে শুধু কাঁদতে থাকবে। বিজাতিরা এসব কথা বিশ্বাস করবে না। হিন্দু ভাইয়েরা বলবে তাদের ধর্মগ্রন্থে এমন কথা নেই। শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণকে এমন কথা বলেন নি। শ্রীশ্রী পরমহংসদেবও তাঁর মহান উপদেশে এমন ত্রাসের কথা বলেন নি। আর বলবেনই বা কেন? হিন্দু ভাইদের তো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দেহের অণু-পরমাণু জলে-স্থলে-হাওয়ায় মিশে যায়। কবরের লাশের মত এক জায়গায় অচল হয়ে থাকে না। তাই মৃতদেহ আজাব কিসে?*A

খ্রীষ্টান ও ইহুদি ভাইয়েরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণীকে আমলই দেয় না। হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর বাণীকেই একমাত্র মহাবাণী বলে মনে করে। যদিও তারা কবরে যায়, মুসলমানের মত ধুলার বিছানাতেই স্থান পায় তবু এমন কঠিন বাক্যের কথা বিশ্বাস করে না। কেননা পবিত্র বাইবেলেও এমন সতর্কমূলক বাণী মেলে না। সেখানে বিচার দিনের কথা আছে। ঈশ্বরের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা আছে। পুনরুত্থানের কথা আছে। স্বর্গের সুন্দর বর্ণনা আছে। অপার সুখ, শান্তি ও আনন্দের কাহিনী আছে। দেবদূতদের কার্যকলাপের বিবরণ আছে। নরক যন্ত্রণার কথা আছে। ঈশ্বরের দয়া-মায়া ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু কবরের বিবরণ নেই। (আমার চোখে এ যাবৎ এমন ঘটনার কথা বাইবেলে পড়ি নি।)। তাই তারা কবরের মাঝে কিছু ভয়াবহ ঘটনা ঘট্‌ছে এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

পবিত্র বাইবেলের বাণীসমূহ যারা গভীরভাবে পড়েছেন এবং চিন্তা করেছেন তাদের কাছে কিন্তু কবরের ঘটনা অস্পষ্ট নয়। নবীরা অনেক সময় পরকালের ঘটনাসমূহ বুঝানোর জন্য পার্থিব বস্তুর উপমা ও তুলনা দিয়ে বুঝিয়েছেন। হযরত ঈসার (আঃ) মুখ-নিঃসৃত বাণী এর প্রমাণ। ডুমুরের গাছকে সম্মুখে রেখে পুনরুত্থান থেকে আরম্ভ করে কালের অনেক ঘটনাপ্রবাহ পরকালে নিয়ে ঠেকিয়েছেন। জ্ঞানীদের জন্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য তাঁর বাণী অমৃতসম।

পবিত্র বাইবেলে **'উপদেশক'** পরিচ্ছদে মৃত্যুর অবস্থা যে ভয়াবহ তার কিছুটা আভাষ মেলে। সেখানে হযরত সোলায়মান (বাইবেলের ভাষায় **'শলোমান'**) উপদেশক হিসাবে এ কথা বলেছেন ঃ

"আমি দেখিলাম আপন কর্মে আনন্দকরণ ব্যতীত আর মঙ্গল মনুষ্যের নাই; কেননা ইহাই তাহার অধিকার। **মনুষ্যের মৃত্যুর পরে যাহা ঘটিবে কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারিবে?**

(বাইবেল –উপদেশক। ৩/২২)

উপরে উদ্ধৃত মহাবাণীর শেষ লাইনটি–**"মৃত্যুর পরে যাহা ঘটিবে কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারে?"** অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বাণীর ওপর বিভিন্ন বিশ্লেষণ চলে। যেমন–

*A আমার 'বিজ্ঞান না কোরআন?' পুস্তকে 'কোকনছ' পাখির জীবন ইতিহাস তুলে ধরেছি। নিজের সৃষ্ট আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। ঐ ভস্ম বা ছাই থেকে আবার পূর্ণ আকৃতির পাখির জন্ম হয়। বইটি পড়ুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথমত ঃ মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থায় কি ঘটবে এটা জানবার শক্তি কোন বৈজ্ঞানিকের হয় নি। হবেও না। মহান শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ জানে না।

দ্বিতীয়ত ঃ কেউ বলবে মৃত্যুর পর সুখের জীবন, কেউ বলবে দুঃখের জীবন। এ নিয়ে চলবে দ্বন্দ্ব। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের পার্থক্য না দেখে যদি সবাই সুখে ঘুমাত তবে কি এ বাণীর প্রয়োজন ছিল? চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক বাক্যে উত্তর দেবেন-'না'।

দেখি বাইবেলে এরূপ বাণী আর খুঁজে পাই কি-না এবং উপরে বর্ণিত বাণীর সমাধান মেলে কি না।

গীত সংহিতা

১১৬/৩ "মৃত্যুর রজ্জু আমাকে বেষ্টন করিল, পাতালের কষ্ট আমাকে পাইয়া বসিল, আমি সংকটে ও দুঃখে পড়িলাম।

৪ তখন আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকিলাম। বিনয় করি সদাপ্রভু, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

৫ সদাপ্রভু কৃপাবান ও ধর্মময়, —
বস্তুত আমাদের ঈশ্বর স্নেহশীল।

৬ সদাপ্রভু অমায়িক লোকদিগকে রক্ষা করেন; আমি দীনহীন হইলে তিনি আমার পরিত্রান করিলেন।

৭ হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া যাও। কেননা সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করিয়াছেন।"

হবকুক-৩/১৬

৩/১৬ "আমি শুনিলাম, আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,
সেই রবে আমার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইল,
আমার অস্থিতে পচন প্রবেশ করিল;
আমি স্ব-স্থানে কম্পিত হইলাম,
কারণ আমাকে বিশ্রাম করিতে হইবে,
সংকটের দিনের অপক্ষোয়-
যখন আক্রমণকারী আসিবে লোকদের বিরুদ্ধে।"

উপরে বর্ণিত বাণীসমূহ কি প্রমাণ করে? মৃত্যুর পর কি সব শেষ? সব কিছু মাফ হয়ে যায়? কোন শাস্তি নেই? মাটির নিচে কার কঠিন রবে অন্তর কেঁপে ওঠে, ভয়ে ঠোঁট দুটো নড়েচড়ে ওঠে। জড়দেহে পচন ধরে কিন্তু পচে না কোন্ বস্তু যে ঐ শাস্তির ভয়ে-সংকটের আশঙ্কায় শান্তি পায় না। নিচের দুটো লাইন চিন্তা করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে মৃত্যুর পরই শুরু হবে কবরের মাঝে ঐ আক্রমণকারীর কঠিন শাস্তি অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিকারীদের দেহে, মনে ও আত্মায়।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী কি এবার সত্য মনে হয়? অদৃশ্য জগতের মহান বিজ্ঞানী কবরে কী ঘটছে তা বুঝতে পারেন, দেখতে পারেন। এ অপরূপ শক্তি দুনিয়ায় কোন বৈজ্ঞানিককেই দেওয়া হয় নি। এ কথা আমরা বাস্তবেই দেখছি। কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে মানুষকে তাক লাগাতে পারে অথচ নিজের আত্মা ও মনকে দেখতে পায় না। দুঃখ কষ্টকেও মাপতে পারে না। তাই কবরের আজাব কি করে বুঝবে? টেলিভিশনের পর্দা এখানে নিষ্ক্রিয়। দেখুন হযরতের দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি আমাদের মত বৈজ্ঞানিকের মত নয়। কত প্রখর ও বাস্তব একথা শুনুন তাঁর পবিত্র বাণীর মাঝে।

হযরত জায়েদ-বিন-সাবেত বলেন ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ) নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাঁহার একটি খচ্চরের উপর বসিয়াছিলেন এবং আমরাও তাঁহার সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল এবং হুজুর (দঃ)-কে মাটিতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। দেখা গেল ৫টি কি ৬টি কবর রহিয়াছে। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন-'এই কবরবাসীকে কে চেনে?' এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,-'আমি চিনি হুজুর'। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন,-"ইহারা কবে মরিয়াছে?" সে উত্তর করিল-'শেরেকের জামানায়।' তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ

"এই উম্মত তথা মানুষ তাহাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় পড়ে (এবং শাস্তি ভোগ করে)। অতঃপর ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেওয়া ত্যাগ করিবে-তাহা না হইলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতাম যেন তিনি তোমাদিগকে কবর আজাব শুনান যাহা আমি শুনিতে পাইতেছি।"[১]

বাস্তব দৃষ্টিতে এমন ঘটনা দেখে ও শুনে তিনি কবর সম্বন্ধে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

"আমি এমন কোন জঘন্য স্থান দেখি নাই যাহা হইতে কবর জঘন্যতম নহে।"[২]

অবিশ্বাসী মানুষের জন্য কবরে কিরূপ শাস্তি হতে পারে রসুলুল্লাহ (দঃ)- এর নিম্নোক্ত বাণী হতে তা অনুধাবন করা যায়।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-বলেছেন ঃ "অবিশ্বাসীর জন্য তাহার কবরে নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হয় যাহারা তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। যদি সে সকলের একটা সাপ পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে তাহা হইলে এ পৃথিবীতে কোন তৃণলতা জন্মিবে না।"[৩]

রসুলুল্লাহ (দঃ)- আর একটি বাণীতে অবিশ্বাসীদের কবরের অবস্থা প্রসঙ্গে বলন ঃ

"তাহার রূহকে তাহার শরীরে ফিরাইয়া আনা হয় এং দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন-"তোমার সৃষ্টিকর্তা কে?" তখন সে উত্তর দেয়-'হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন-'এই যে লোকটি যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি কে'? সে বলে-'হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না।"

অতঃপর আকাশের দিক হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন : সে মিথ্যা বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য দোজখ হইতে একটি বিছানা আনিয়া দাও এবং তাহাকে দোজখের পোশাক পরাইয়া দাও। তদুপরি তাহার জন্য দোজখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। তদনুসার দরজা খোলা হইবে। তখন দোজখের উত্তাপ ও লু-হাওয়া তাহার দিকে আসিবে।

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলেন ঃ-

এছাড়া তাহার প্রতি কবরকে এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকে পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। অতঃপর তাহার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেস্তাকে নিযুক্ত করা হয়। যাহার সহিত একটি লোহার হাতুড়ি থাকে; যদি এই হাতুড়ি দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহা হইলে পাহাড়ও ধুলিস্যাৎ হইয়া যাইবে অথচ ঐ ফেরেস্তা তাহাকে এ হাতুড়ি দ্বারা সজোরে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে সে এত বিকট চিৎকার করে যাহা মানুষ ও জ্বেন ব্যতীত সমগ্র সৃষ্ট জীব পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত শুনিতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশিয়া যায়; অতঃপর পুনরায় তাহার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।"[১]

টীকা ঃ ১ -৩ হাদিস। মেশকাত শরীফ। ১ম খণ্ড। পৃষ্ঠা নং ১৪০ এং ১৪৫-পৃঃ ১৪৭/পৃঃ নং ১৪৪।

টীকা ঃ ১ । হাদিস। মেশকাত শরীফ। ১ম খণ্ড। পৃষ্ঠা নং-১৪০ এবং ১৪৫ -পৃঃ ১৪৭/পৃঃ নং-১৪৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুগে যুগে কবরের মাঝে সংঘটিত ঘটনাসমূহ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পবিত্র বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে। নিম্নে এরূপ বাস্তব ঘটনার কয়েকটি উদ্ধৃতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নারী-পুরুষ পাঠকবৃন্দের জন্য তুলে ধরছি। বিশ্বাস করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে রসুলুল্লাহকে (দঃ) ভক্তির সঙ্গে বুকে তুলে নিলে এ কঠিন বিপদ হতে মুক্তি পাবেন। আর অবিশ্বাস করলে কিরূপ শাস্তি হতে পারে তা বর্তমান কালের ঘটনা থেকেই দেখুন।

একঃ "মুর্শিদাবাদ জেলার সদ্য পরলোকগত ব্যক্তির কবর পাকা করবার উদ্দেশ্যে যখন কবরের পার্শ্ববর্তী মাটি খোঁড়া হচ্ছিল তখন মৃত ব্যক্তির পুত্র ও রাজমিস্ত্রী দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় যে মৃত ব্যক্তির দুইদিকের দুইটি হাত মাটিতে পেরেক পোতা অবস্থায় রয়েছে।"[২]

দুই : "২৪ পরগণা জেলার 'ধবধবি' স্টেশনের নিকটবর্তী পদ্মের হাট নামক গ্রামের একটি সমাধিস্থ স্ত্রীলোকের কবর কয়েক মাস পরে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং দেখা যায় যে স্ত্রীলোকটির শরীর রক্তাপ্লুত অবস্থায় অবিকৃত রয়েছে এবং কবরের চারপাশের মাটি চাপা চাপা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে।"[১]

তিন : হযরত ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ

"একদিন মক্কা হইতে মদিনা যাত্রার পথে দেখিলাম একটি কবর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইল। তার সর্বাঙ্গে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে আর তার গলায় রয়েছে লোহার শিকল লাগানো।"[২]

চার : কবরের মাঝে এরূপ অলৌকিক ঘটনা একটি দুটি নয়-হাজার হাজার এ যুগেই ঘটে যাচ্ছে। আমরা সেগুলো স্বচক্ষেই দেখেছি ও স্বকর্ণেই শুনেছি। ১৯৫৭ সনে (যখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানে অয়্যারলেস ট্রেনিং-এ ছিলাম) এরূপ আরও একটি ঘটনার কথা আমি নিজে পড়েছি। স্পষ্টই আমার মনে আছে। তখন লেখবার অভ্যাস ছিল না। তাই ঘটনাটি কেটে রাখি নি। নইলে অবিকল কাগজের কথাটিই তুলে ধরতাম। যাহোক, অবিকল ভাষাটা মনে না থাকলেও ঘটনাটা স্পষ্টই মনে আছে। কারণ এটা আমার অন্তরে ও মস্তিষ্কে বেশ দাগ কেটেছে। ঘটনাটি এই ঃ

তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন এক স্থানে এক মহিলার মৃত্যু ঘটে। গ্রামের লোক সামাজিক পদ্ধতি অনুযায়ী তাকে কবরস্থ করতে চেষ্টা করে। মৃতদেহটিকে কবরে রেখে ওপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দখা গেল একটি ভয়ংকর সাপ মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরেছে। সাপটিকে মারতে অনেকেই চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। কবরের কাছে গিয়ে মাটি দিতে কারোরই আর সাহস হল না। মহিলাটির স্বামী কে মওলানা সাহেব জানতে চাইলেন। বাপের বাড়িতে মহিলাটি মারা যায়। তাছাড়া তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ছিল বলে মহিলাটির বাপ-মাও তার স্বামীকে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। মওলানা সাহেবের আদেশে শেষে তার স্বামীকে ডাকতে হল। স্বামীর বিবরণে মওলানা সাহেব জানতে পারলেন যে মেয়েটি তার স্বামীর মনে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছে। স্বামীর প্রতি সে কোনদিনই তুষ্ট ছিল না এবং সদ্ব্যবহারও করে নি। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বাপের বাড়ি এসেছিল। মওলানা সাহেব সব ঘটনা শুনে লোকটিকে কবরের অবস্থা দেখালেন এবং মাফ করে দিতে বললেন। এছাড়া মেয়েটির বাবা-মা, জামাইয়ের পায়ের ওপর পড়ে মেয়ের জন্য ক্ষমা চাইল। লোকটি

---

২ । সংগৃহীত-'একমেবাদ্বিতীয়ম' পুস্তক হতে। কৃত-তেমোঃ আবেদ আলি, বি. এ. (অনার্স), এম. এ. বি.টি। পৃষ্ঠা নং ১০২।

টীকা ঃ ১ ও ২। সংগৃহীত -"একমেবাদ্বিতীয়ম' পুস্তক হতে। কৃত-মোঃ আবেদ আলি, বি. এ (অনার্স). এম. এ. বি.টি। পৃষ্ঠা নং-১০২।

শেষে তার স্ত্রীর অপরাধ অন্তর থেকেই ক্ষমা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল সাপটি আর নেই।

পাঠকবৃন্দ! এ ঘটনাটি অবিশ্বাস করতে পারবেন না। কারণ বিশ্বস্ত সূত্রেই এ ঘটনা সংগৃহীত হয়েছিল বলেই জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কয়টি অবিশ্বাস করবেন। রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ)-পবিত্র বাণী হতেও যেখানে দেখা যায় কবরে ৯৯টি সাপ কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করবে সেখানে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যা বর্ণিত হল তা অসত্য হয় কি করে?

রসুল (দঃ)-এ অদৃশ্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব, প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণ, খবরের কাগজের সবই তো অবিশ্বাস করা যায় না। যারা অমুসলমান, আল্লাহ্‌র প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, নবীদের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর তত্ত্বকে অবিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু মানবতার খাতিরে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ ও খবরের কাগজে উদ্ধৃত ঘটনাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। আর সবাইকে অবিশ্বাস করলেও সবার কথাকে উড়িয়ে দিয়ে মিথ্যা বললে একদিন আপনাকে সত্য সত্যই এ মিথ্যার জালে ধরা দিতে হবে। চলুন, কবরের এরূপ আর একটা দুর্ঘটনা আমরা দেখে নিচ্ছি।[১]

পাঁচ : কিছুদিন পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব হবিবর রহমান, বি. এ. বি-এড, এর নিকট একটি ঘটনা শুনেছি। ভাইকে আমি অন্তর থেকেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। কারণ তিনি একজন প্রবীণ সুশিক্ষিত ও ধর্মপ্রান মনীষী। প্রধান শিক্ষক ছিলেন একটি হাই স্কুলে। বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্গত শেরপুর উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। হোমিও ডাক্তার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। মিথ্যা বলেন না। মিথ্যা শিক্ষাও কাউকে দেন নি। আশা করি, আমার ভাই-এর বর্ণিত ঘটনাটিকে আমার মতই বিশ্বাস করবেন। তাঁর মুখের কথাটিই লিখছি ঃ

"বাড়ি হতে ৩ মাইল দূরে পথের ধারে এক বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দিবার সময় নাকি বেশ অসুবিধা হয়েছিল। তবু অনেক কষ্ট করে তাকে মাটি দেওয়া হয়। পরদিন ভোরে দেখা গেল শিয়াল কবরটি খুঁড়েছে। তবে বৃদ্ধাকে দূরে নিয়ে যায় নি। বৃদ্ধাটি কবরের মধ্যে বসে আছে। এই ঘটনা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে নারী-পুরুষ সবাই ছুটে আসে। মৃত বৃদ্ধার ছেলে-মেয়েরা এ হেন অবস্থা দেখে এবং সমবেত লোকজনের নানাপ্রকার সমালোচনায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়। তাই লাঠি দিয়ে মৃত মাকে শুইয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কি অদ্ভুত! তাকে কিছুতেই শোয়ানো যায় না। অবশেষে মাটি দিয়ে পূর্ববৎ ঢেকে দেওয়া হয়।

পরের দিনও দেখা গেল ঐ একই অবস্থা। শিয়াল বেচারা আবার মাটি খুঁড়ে 'লাশটাকে' ঐভাবে রেখেছে। অনেকেই চেষ্টা করল মৃতদেহটাকে শুইয়ে রাখতে কিন্তু পারল না। ঐ ঘটনার সময় আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং ঐ অলৌকিক ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখলাম। সমস্ত গা আমার শিহরে উঠল। সবাই বলাবলি করল যে ভাল একজন আলেম ও বুজুর্গান ব্যক্তির দরকার। নইলে এ অস্বাভাবিক অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা কঠিন। আমি কিছুক্ষণ দেখে গন্তব্যস্থানে চলে গেলাম। কয়েকদিন পর যখন আবার ঐ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি তখন দেখলাম কবরটি ঢাকা। কৌতূহল হলো। তাই গ্রামের লোককে ঐ ঘটনার

টীকা ঃ ১ । আমার রচিত 'বিজ্ঞান না কোরআন?' পুস্তকে 'অলৌকিক ঘটনাসমূহ আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ছিল-'কবরের মাঝে' হেডিং -এ পঞ্চ সংস্করণ পর্যন্ত। ষষ্ঠ সংস্করন হতে এ অংশটুক স্থানান্তরিত করে সংযুক্ত করা হল। কেননা পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বই-এর আকার অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম এক বিশিষ্ট আলেম কোরআন পাঠ করে দোয়া করার পর মৃত বৃদ্ধা আপনা আপনি মাটিতে শুয়ে পড়ল। পরদিন থেকে শিয়ালেরও এ দুষ্টামি বুদ্ধি মাথায় আসে নি। আর মৃত বৃদ্ধারও কবরে বসে থাকবার কুমতি হয় নি।[১]

ছয় : উপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ হতে দেখা যায় যে কবরের ঘটনায় মেয়েরাই বিশেষভাবে জড়িত। পুরুষদের কথা বলা হয় নি। এতে পুরুষ ছেলেদের আনন্দিত হবার কথাই বটে। তারা বলবে পুরুষ যত অপরাধই করুক না কেন কবরে গেলে সব মাফ। ফেরেশতারা এখানে এসে জ্ঞানহারা হয়। অথবা পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেশ সময় কাটায়। আমোদ-আহ্লাদ করে। তাই না? আসুন দেখি আমাদের কি অবস্থা।

বাংলাদেশের কোন এক জেলায় এক খ্যাতনামা মুসলিম ডাক্তার ছিলেন। তাঁর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না কারণ জগতে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে যখন পরিচিত ছিলেন তখন মৃত্যুর পরের অবস্থা বলে তাঁকে অখ্যাত করতে চাই না। বিশিষ্ট এক বন্ধুর কাছে শুনলাম এ ঘটনাটি। আমার কাছে যে তিনি মিথ্যা বলবেন না এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই আমাকে জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

জনৈক ডাক্তার ছিলেন এক গরিব পরিবারের সন্তান। তাঁর বাপ-মা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিজেরা উপবাস করে ছেলেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ান। এরপর বিশিষ্ট এক ধনী লোকের সুনজরে পড়েন ঐ ছেলেটি। ধনীরা সুনজর দেয় তখনি যখন তারা স্বার্থের কিছু সন্ধান পায়। এই গরিব ছেলেটির মাধ্যমে যে বিশেষ স্বার্থের উদ্ধার হবে এ অভিজ্ঞতা ধনী ভদ্রলোকটির ছিল। কারণ তিনি হয়ত বুঝেছিলেন যে এ ছেলে গরিব হলেও পরবর্তী যুগে এক খ্যাতনামা ধনী গোষ্ঠীর তালিকাভুক্তই হবে। তাই তার কুরূপা এক আদরের দুলালীকে তাঁরই গলায় গেঁথে দেন। অঙ্গীকার করলেন ছেলেটাকে ডাক্তারী পড়াবেন। ভদ্রলোক অঙ্গীকারের বর খেলাপ করেন নি। তাঁকে এম. বি. বি. এস. পাশ করিয়ে আনেন। এরপর স্টেথসকোপ, মাইক্রোস্কোপ বহুবিধ যন্ত্রপাতি-সহ সুন্দর এক ডিসপেন্সারী-কাম বাসাও করে দেন। ডাক্তার এখন থেকে বাপের ছেলে নয় শ্বশুরের ছেলে। মায়ের বাধ্য নয় স্ত্রীর বাধ্য। গরিবের বন্ধু নয় টাকার বন্ধু। শুনেছি বাপকে পরিচয় দিতেন চাকর বলে। বাপমায়ের স্থান তাঁর সুরম্য অট্টালিকায় হয় নি। হয়েছে তাঁর দাদার পরিত্যক্ত চালাবিহীন ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে। আর্ত ও পীড়িতদের সেবা তিনি করেন নি। করেছেন ধনীর মনঃতুষ্টি। আমার গ্রামেরই এক অতি দুঃখী রুগী তাঁর পায়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা চায়। করুণা অর্থ টাকা নয়, খাবার নয়, বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশন। অপরাধ তাঁর এই। গরিবের এই মিনতি তাঁর কাছে মহা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সহ্য করতে না পেরে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করেন যে তিনি গরিবের ডাক্তার নন। গরিবের জন্য আছে হাসপাতাল যেখানে বিনামূল্যে কিছুটা ট্যাবলেট আর এলকালি মিক্চার দেয়।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ক্ষমা করবেন। ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করেছি। কেন করেছি এ কথাটা এখনি বুঝতে পারবেন।

এক অকস্মাৎ মুহূর্তে ডাক্তারের মৃত্যু হল। তাঁকে সমাধিস্থ করবার জন্য গোরস্থানে নেওয়া হলো। যারা কবর খুঁড়ল তারা রিপোর্ট দিল কবরে পানি উঠছে। বহু চেষ্টা করেও পানিকে রোধ করা গেল না। আষাঢ় মাস নয় শ্রাবণ মাস নয়। ওপর থেকে আকাশের দ্বারও

টীকা ঃ ১ । (৯৫ পৃষ্ঠার শেষে দ্রষ্টব্য)-এর অনুরূপ।

খুলে যায় নি। তবু কেন কবরে পানি উঠছে একথা সবার মস্তিষ্কেই আলোড়ন এনে দিল। যাহোক, এই পানির মধ্যেই কিছু পাটখড়ি বিছিয়ে ডাক্তারকে রাখা হল। আশ্চর্য! যে কবর থেকে পানি ওঠে সেই কবর হতেই অনর্গল বিসুভিয়াসের মত লাভা উদ্‌গীরণ হচ্ছে। চিন্তাধারার সম্পূর্ণ উল্টো কথা। পানির মধ্যে আগুন ও ধুঁয়া। কবরের মাটি ভেদ করে কাদের এ নিদর্শন দেখাতে জানি না কয়েকদিন পর্যন্ত এ ঘটনা চলতেই থাকল।

ঘটনাটা কি অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে? অনেকেই বলবেন, না। কেননা তাঁরা বলবেন যে-যে স্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল তার অভ্যন্তর ভাগে গ্যাস ও ধূম্র সঞ্চিত ছিল। কিন্তু মৃত্তিকা স্তর ভেদ করে উঠতে পারে নি। মৃত্তিকা স্তরকে হালকা করে দেবার ফলেই গ্যাস প্রবল গতিতে উর্ধ্বদিকে উঠতে থাকে। গ্যাসের সংঘর্ষণে তাপ ও অগ্নির সৃষ্টি হয়। নেহাতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। বেশ মানলাম। আচ্ছা এবারে আমার মনের খট্‌কাটাকে ঘুচিয়ে দিতে বৈজ্ঞানিক ও সুধীমহলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মৃত্তিকা অভ্যন্তরে গ্যাস কি শুধু ৬ × ৩ =১৮ বর্গফুট জায়গা নিয়েই বদ্ধ ছিল? কবরটা ছিল কিন্তু গোরস্থানে। ঠিক পাশের কবরগুলি হতে কিন্তু এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় নি। এছাড়া গ্রীষ্মকালে যখন মাটির রস শুকিয়ে যায় তখন মাত্র দু তিন ফুট মাটির নিচে কি করে পানি জমে রইল এ প্রশ্নও কি করতে পারি না? পুরু মৃত্তিকা স্তরের মাত্র তিন ফুট অভ্যন্তরে কি গ্যাস এইভাবে সামান্য জায়গা নিয়ে বিস্তার লাভ করে? এ ধারণা কি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ব্যতিক্রম নয়?

কেন এ ঘটনা ঘটেছিল এ জবাব দিতে পারবেন না। দিতে গেলে মিল খাবে না। কারণ গাঁজাখুরী প্রমাণ দেখালে পাঠকবৃন্দ হাসবে। আর বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে প্রমাণ করতে গেলে যন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে। আধ্যাত্মিক জবাব ছাড়া এর আর কোন জবাব নেই বলতে হবে অলৌকিক ঘটনা। বলতে হবে অদৃশ্য শক্তির লীলা। বলতে হবে এই অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্তা আল্লাহর শক্তি মহিমারই কারসাজি। যিনি তাঁর মহাবাণীতে দুষ্কৃতিকারী, অবিশ্বাসী ও সৃষ্টজীবের কষ্টদাতাকে উদ্দেশ্য করে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে।

"ফা বাশ্‌শেরহুম বেআজাবেন আলীম" (কোরআন)

অর্থাৎ ঃ "অতএব তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির সংবাদ প্রদান কর।"

কবরে পুণ্যবানদের অবস্থা ঃ

কবরে পাপীদের কঠিন আজাবের কথা শুনে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কবর কি সবার জন্যই নিষ্ঠুর? যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক? সবার অস্থি-মজ্জা কি বিষাক্ত কীটের খাদ্য? কবরের মাটি কি দু'পাশ থেকে চাপ দিয়ে পুণ্যবানদেরও পাজরের হাড় ভেঙ্গে দেবে? না–তা হতে পারে না। আল্লাহ্ পুণ্যবানদের সহায়ক। যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করে, রাতে-দিনে তাঁরই আজ্ঞা বহন করে সেজদায় পড়ে থাকে, ক্ষুধায় দহন জ্বালা পেটে নিয়ে রোজা পালন করে, রোজ হাশর, উত্থান দিবসকে ভয় করে, রসুল (দঃ)-এর বাণীকে বুকে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে, বেহেস্ত-দোজখ ও বিচার দিবসকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এতিম, দুঃখী ও অসহায়ের বন্ধু হয়ে নিজের ধন বিলিয়ে দেয় সে কেন পাপীর ন্যায় কবরে যন্ত্রণাপদ শাস্তি ভোগ করবে? চলুন দেখি, অদৃশ্য বিজ্ঞানী আমাদের প্রিয়তম রসুল (দঃ)-এর পবিত্র বাণীর মাঝে আশার বাণী পাই কিনা।

হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন–"যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার নিকট নীলচক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফেরেস্তা এসে হাজির হন। তাঁদের একজনকে বলা হয় **'মুনকার'** আর অপরজনকে **'নকীর'**। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে (আমার প্রতি ইশারা করে) এ ব্যক্তি সম্বন্ধে দুনিয়াতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি বিশ্বাসী হলে বলে–'তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর রসুল । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল । তখন তাঁরা বলেন–'আমরা পূর্বেই জানতাম তুমি একথাই বলবে । অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭০ × ৭০=৪৯০০ বর্গহাত করে দেওয়া হয় এবং তথায় তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয় । তারপর তাকে বলা হয়–ঘুমিয়ে থাক । তখন সে বলে–না । আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে এ সংবাদ দিতে চাই । ফেরেস্তাগণ বলেন–'তা আল্লাহ্‌র হুকুম নেই । তুমি এখানে বাসর ঘরে বরের ন্যায় ঘুমিয়ে থাক–যে ঘুম পরিবারের একান্ত আপনজন ব্যতীত ভাঙ্গাতে পারে না । অতঃপর সে এভাবে ঘুমিয়ে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তার এ শয্যাস্থান থেকে উঠাবেন ।"[১]

বিশ্বাসী মানবজাতী এবার নিশ্চয়ই আনন্দ উপভোগ করছেন–যারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) -এর ওপর আস্থাশীল । ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ) বলে তাঁর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন । উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে চিন্তাশীল পাঠকরা নিশ্চয়ই একটি গভীর তত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছেন–**'মানুষ কবরেও কথা বলে–ঘুমায় ।'**

মানুষ কি সত্যি মরে যায়?

অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর একটি বিষয়ের ওপর হাত দিলাম । এর সমাধান দিতে পারব কিনা জানি না । আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাই । তিনি আমাকে জ্ঞান দান করুন । সত্য উপলব্ধি করবার অন্তর দিন । (আমিন)

বহুদিন থেকেই কোরআনের একটি বাণী চিন্তা করছি গভীরভাবে কিন্তু সমাধান দিতে পারি নি । পাঠকবৃন্দের নিকট এ বাণীটি তুলে ধরছি । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

"কুল্লু নাফছেন জায়েকাতুল মাউত"[১] (৩: ১৮৫)

"অর্থাৎ ঃ "সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী ।"

উপরে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তার বাণী বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার জন্যই সত্য । যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ নাস্তিক তারাও বলবে–'আল্লাহ সত্য না হলেও এ বাণী সত্য' । কেননা এ বাণীকে Universal Truth হিসাবেই গণ্য হরা হয় । শুধু বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নয়–প্রাণী মাত্রই অর্থাৎ যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে । অর্থাৎ প্রতিটি জীব মাত্রই এ মৃত্যুর সম্মুখীন । জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, ঋষি-সাধক, নবী-পয়গম্বর এর যথার্থতা অনুধাবন করছেন কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং হবেন । এ জন্যই বলতে বাধ্য–' Man is mortal'?

এখন আমাদের প্রশ্ন এখানে যে, **'কুল্লু নাফ্‌ছেন'** কেন বলা হলো । **'কুল্লু নাসুন', 'কুল্লু রেজালুন', 'কুল্লু রুহুন' বা 'কুল্লু কুলুবুন'** বলা হয় নি । তাহলে বলা যায় যে, সমস্ত মানব বা সমস্ত রূহ বা সমস্ত আত্মা মৃত্যুর সম্মুখীন নয় । শুধু 'কুল্লু নাফ্‌ছেন' অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রবৃত্তি অসাড়, অকর্মণ্য ও ধ্বংস হবে । আর পার্থিব জড়দেহের মৃত্যু হবে ।

'নাফ্‌স' এর অর্থ কি? 'নাফ্‌স'–আরবী শব্দ । এর অর্থ প্রবৃত্তি–যা ষড়রিপুকে চালনা করে । অর্থাৎ মানব জীবনের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এগুলোকে যে শক্তি চালনা করে সেই শক্তিকেই প্রবৃত্তি বলা হয় ।

এ শক্তিগুলো না থাকলে জীবন অচল, অসাড়, নিষ্পন্দ । প্রাণের অস্বিত্ব থাকে না । সব

টীকা ঃ ১ । গাদিস । মেশকাত শরীফ । ১ম খণ্ড । তর্জমা–নূর মোহাম্মদ আজমী (রাঃ) । পৃঃ নং–১৪২ ।
টীকাক ঃ ১ । কোরআন । সূরা আল-ইমরারন । আয়াত–৩ : ১৮৫ ।

ক্রিয়ার বিনাশ হয় । ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-অভিমান, ক্ষুধা-পিপাসা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমান, প্রেম-ভালবাসা, দয়া-মায়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা -দুরাশা, ত্যাগ-সাধনা, অস্থিরতা-চঞ্চলতা, গতি-অগতি সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মৃত্যুতে । তাই ফিরে আসে না জীবনে । দেখা দেয় না নতুন করে এ ভুবনে । এ ঘটনা শুধু মানুষের জীবনেই ঘটে না । সৃষ্টজীব মাত্রই হয়ে থাকে । তাই কোরআনে বর্ণিত এ মহাবাণী–'কুল্লু নাফ্‌ছেন জায়েকাতুল মাউত'-এর গভীর, গূঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ–**'প্রতিটি জীবের প্রবৃত্তিই মৃত্যুর সম্মুখীন ।'**

'নফসের' আর একটি অর্থ–**'পার্থিব জড়দেহ'** ।

যে দেহে প্রাণ আছে সে দেহ পার্থিব জড়বস্তুতে তৈরি । অতি সুন্দর সুঠাম দেহ রক্ত -মাংস, অস্থি-মজ্জা, গুরু-লঘু, গ্যাসীয়-জলীয় বস্তুতে সৃষ্টি হয়েছে । মৃত্যু ঘটলে এ বস্তুগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকে না । সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় । আকার থাকে না । নিরাকারে মিশে যায় । এ অবস্থার নামই মৃত্যু । 'নাফ্‌সের'–এ অর্থেও উপর্যুক্ত বাণী সত্য । বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ ।

'নাফ্‌ছের'–দুটি অর্থকে সম্মুখে রেখে আমাদের মনে আর একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় । সেটা হলো–যে পার্থিব জড়দেহে এক অদৃশ্য শক্তি প্রবেশ করিয়ে তাকে সচেতন করে, ক্রিয়াশীল করে, প্রবৃত্তিকে চালনা করে, তার কি মৃত্যু ঘটে? জড়দেহের মত, প্রবৃত্তির মত সে কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

'আত্মা' নামে একটি অদৃশ্য জড়দেহে প্রবেশ করে একে সচেতন করে । প্রাণের স্পন্দন ঘটায় । এ আত্মা অদৃশ্য, অবিনশ্বর । এর মৃত্যু নেই । যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যায় । যার নির্দেশে দেহ মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নির্দেশেই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । তার নির্দেশেই যেথা খুশি অবস্থান করে ।

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে মানব আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ **'ইল্লিন'** নামক স্থানে রেখে দেন । সেখান থেকে মহাপ্রভুর নির্দেশেই মায়ের গর্ভে সৃষ্টি শিশুর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয় । তাই শিশুর দেহ ক্রিয়াশীল হয় । এতে প্রাণের সংযোগ ঘটে । আবার যখন দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন এ আত্মা **উর্দ্ধগামী হয় এবং ঐ ইল্লিনেই স্থান লাভ করে** । অবশ্য এর মধ্যে আরও কিছু নিগূঢ় রহস্য রয়েছে । সে রহস্যটা পূর্বে জেনে নেই । এরপর বিচার করব মৃতদেহের অবস্থা ।

রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলেছেন ঃ (হাদিসের অংশ)

"মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তবে রহমতের ফেরেস্তাদিগকে ডাকা হইবে । আর পাপী হইলে আজাবের ফেরেস্তাদিগকে ডাকা হইবে তখন তাহারা মৃতের আত্মা লইয়া শূন্যে আরোহণ করিবেন ।"

তখন আল্লাহ্‌ বলিবেন–"হে ফেরেস্তাগণ! উক্ত আত্মাকে মৃতদেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া দাও যেন এ দেহের স্বরূপ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে । তারপর তাহার আত্মাকে ঘরের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিবেন । তখন মৃত আত্মা তাহার জন্য শোকাতুর ও অশোকাতুরদিগকে চিনিয়া লইবে কিন্তু কিছুই বলিতে পারিবে না । জানাজার পর মৃতদেহ কবরস্থ করা মাত্রই আল্লাহ্‌র আদেশে মৃতদেহে আত্মা প্রবেশ করিবে ।"

মৃতদেহের আত্মা যে উর্দ্ধগামী হয় শুধু রসুলুল্লাহই (দঃ) বলেন নি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও দেখতে পাই । যেমন ঃ

কোরআন ঃ ১ । "ওয়া আসফালা সাফেলীন" । (কোরআন)

২ । "ইন্না এলায়না এইয়াবাহুম । সুম্মা ইয়া আলায়না হিসাবাহুম ।"

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় আমার দিকে প্রত্যাবর্তন । অতঃপর আমার নিকটই হিসাব ।"

(৮৮ ঃ ২৫-২৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) "হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও।" (সূরা ফজর। আয়াত-২৭)

বাইবেল ঃ (১) (ইঞ্জিল-মথি ১২/৪৩-৪৪)

"আত্মা বলে-আমি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলাম আবার সেই স্থানেই (ইল্লিনে) ফিরিয়া যাইব।"

(২) "মনুষ্য সন্তানের আত্মা উর্দ্ধগামী হয় আর পশুর আত্মা অধঃগামী হয়। ইহা কে জানে?" (উপদেশক। ৪/২১)

(৩) "এবং আত্মা যাহার দান-সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে।" (উপদেশক-১১/৭)

শ্রী মদ্ভগবদগীতা ঃ "সত্ত্বগুণ যাহার মধ্যে প্রধান তিনি উর্দ্ধলোকে যান। যাহার রজোগুণ প্রধান তিনি মধ্যলোকে যান। আর যাহার তমোগুণ প্রবল সে জঘন্য প্রকৃতির বশে নিচলোকে যায়।"

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যমদূত (আজরাইল) মানবদেহ হতে আত্মা বের করার পর তা নিয়ে প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হয়। এরপর **আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের নির্দেশ দেন মৃতদেহে পুনরায় তা ফেরৎ দিতে।**

যখন আত্মাকে মৃতদেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন দু'জন ফেরেস্তা কবরে প্রবেশ করে ঐ মৃত ব্যক্তিকে তুলে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন-(১) তোমার সৃষ্টিকর্তা কে? (মান রাব্বুকা?) (২) তোমার ধর্ম কি? (ওয়া মা দীনুকা?) (৩) তোমার নবী কে? (ওয়া মান নাবীউকা?)

প্রতিউত্তরে বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলবে-

"(১) আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ (রাব্বি আল্লাহ্)

(২) আমার ধর্ম ইসলাম (ওয়া দ্বীনি ইসলামু)

(৩) আমার নবী মুহাম্মদ (দঃ) (নাবীই মুহাম্মদ (দঃ)।"

এখন প্রশ্ন যে আত্মার অভাবে দেহ অসাড়, অচল, কর্মহীন, বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন সে আত্মাকে মৃতদেহে যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি সে দেহ আর মৃত থাকে? পূর্বের ন্যায় কি প্রাণশক্তি, বোধশক্তি, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি ফিরে পায় না? যদি না পায় তবে মৃতদেহকে কেন তুলে বসানো হয়? কেন তাকে উপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলো করা হয়?

শুধু বিশ্বাসী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্যই কবরে এ প্রশ্ন নয় প্রতিটি মানবের জন্যই তা কবরেই হোক, শ্মশানঘাটেই হোক বা জলে-স্থলেই হোক এ প্রশ্ন। পাপীদের উত্তর কি পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে রসুল (দঃ)-এর বাণী হতে দেখিয়েছি। ফেরেস্তাদের প্রশ্নের জবাবে বলে-"হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না।'

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখুন -এ যেন ছাত্রদের উত্তীর্ণ -অবতীর্ণ হবার নিমিত্ত পরীক্ষা হলের প্রশ্ন অথবা মৌখিক পরীক্ষায় যাচাই কমিটির সম্মুখে নিজকে উপযুক্ত -অনুপযুক্ত প্রমাণ করা। মৃত ব্যক্তির জন্য এসব পরীক্ষার প্রয়োজন কি?

ফেরেস্তাদের এসব প্রশ্নের যে প্রয়োজন রয়েছে তা বুঝা যায় আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে।

ইন্টারভিউ বোর্ডের পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয় সে সসম্মানে চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় অথবা বোর্ডের প্রদত্ত সম্মানজনক সার্টিফিকেটে ধন্য হয়। ঠিক তেমনি উত্তীর্ণ বান্দাদের পুরস্কার নিম্নরূপ। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ (প্রশ্ন উত্তর শেষে)

"অতঃপর আকাশের দিক হতে উচ্চস্বরে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :- আমার বান্দা যথাযথ উত্তর দিয়েছে। সুতরাং তার জন্য বেহেস্তের একটি ফরাশ বিছিয়ে দাও এবং বেহেস্তের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া বেহেস্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। এ আদেশে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

ফলে তার দিকে বেহেস্তের স্নিগ্ধকর হাওয়া এবং এর সুগন্ধি বইতে থাকে এবং ঐ দরজা তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।"[১]

অবিশ্বাসীর ফলাফল ঠিক এর উল্টা। বেহেস্তের দরজার পরিবর্তে দোজখের দরজা খোলা হয়। সেখান থেকে উত্তপ্ত লু হাওয়া পাপীদের দেহের দিকে আসতে থাকে। আর এ অবস্থা চলবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত।

এবার চিন্তায় মস্তিষ্ক ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। **মানুষ কি মরে না? মরেও কি নিস্তার নেই?**

চলুন আরও একটু অগ্রসর হই। দেখি বৈজ্ঞানিক নবী (সঃ) মৃত মানবের আরও কি অবস্থা কবরে দেখিয়েছেন।

মৃতব্যক্তি দেখতে ও শুনতে পায়

তিনি বলেছেন ঃ

"যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তাহার সহচরগণ তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায় সে তাহাদের জুতার শব্দ শুনিতে থাকে। তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেস্তা উপস্থিত হইয়া তাহাকে তুলিয়া বসান এবং বলেন-এই ব্যক্তি সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা করিতে? যে ব্যক্তি মুমেন সে বলিবে, 'আমি সাক্ষ্য দেই-তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রসুল।[১] .....(পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)

উপরে উদ্ধৃত ও পূর্বে বর্ণিত হাদিস দুটির মর্মবাণী এক হলেও কথার মধে কিছুটা প্রভেদ রয়েছে। তবে দুটির মধ্যেই রয়েছে কবরে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিচিতি। যে পার্থিব জীবনে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'** এ বাণী হৃদয় মন দিয়ে বিশ্বাস করেছেন ও তদনুযায়ী কাজ করেছেন তিনিই মুমেন অর্থাৎ বিশ্বাসী। তার জন্য কবরে কোন আজাব নেই। উথান দিবস পর্যন্ত মায়ের কোলে শিশু যেমন ঘুমিয়ে থাকে তেমনি ঘুমিয়ে থাকবেন। আর মুনাফেক ও অবিশ্বাসীর অবস্থা হবে এর বিপরীত। কঠিন শাস্তি তার জন্য নির্ধারিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত।

প্রভেদ দেখছি একটি কথায় যা আমরা চাচ্ছিলাম এ আলোচনায় **'মানুষ কি সত্যি মরে যায়?'**

উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সহচরগণ তাহার নিকট হতে চলে যায় সে তাহার জুতার শব্দ শুনিতে থাকে।'

এখান থেকে দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির শ্রবণ শক্তি থাকে। নইলে জুতার শব্দ শুনতে পায় কিরূপে? দ্বিতীয়ত-বর্ণিত হাদিস হতে দেখা যায় যে তার দর্শন শক্তিও রয়েছে। তাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কায়া বা পবিত্র চেহারা মুবারক দেখতে পায়। তাই বিশ্বাসীরা বলে-উনি আল্লাহ্‌র রসুল। অবিশ্বাসীরা বলে-হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। ফেরেস্তারা প্রশ্ন করে ঐ মন্তব্যই শুনতে চায়।

টীকা ঃ ১ । হাদিস । সংগৃহীত - মেশকাত শরীফ। ১ম খণ্ড। পৃঃ নং ১৪৩/১৫০।

টীকা ঃ ১ । হাদিস। সংগৃহীত-মেশকাত শরীফ। ১ম খণ্ড। পৃঃ নং-১৪৩১৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর তৈরি হয় বিছানা। সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয় বেহেস্ত ও দোজখ।

তৃতীয়ত ঃ ফেরেস্তাদের প্রশ্নে মৃত ব্যক্তির উত্তর সঠিক হলে মুক্তি আর বেঠিক হলে লোহার মুগুরে শাস্তি।

মৃত ব্যক্তির যদি বোধশক্তি না থাকত, শাস্তি ও মুক্তি না বুঝত তাহলে অনর্থক ফেরেস্তাদের এত পরিশ্রম করে লাভ কি? আর অবিশ্বাসী মৃত ব্যক্তি ব্যথা না পেলে কেন কান ফাটানো চিৎকার দিয়ে সমস্ত জীবকে (মানব ও জ্বেন ব্যতীত) আতঙ্কগ্রস্ত করছে? তাহলে বুঝা যায় পার্থিব জীবনের মতই তাদের আঘাতে ব্যথা ও অসহ জ্বালায় চিৎকার করার মত অনুভূতি ও শক্তি আছে। পালাবার মত চিন্তা কবরে হয়ে থাকে না। এ জন্যই বলা হয় **'নফসের মৃত্যু ঘটে।'** দেখি এ বিষয়ে রসুল (দঃ-এর বাণীতে এরূপ কথা খুঁজে) পাই কিনা।

তিনি বলেছেন ঃ

"মৃত ব্যক্তি মাত্রই অনুতপ্ত হয়। যে সৎকর্মশীল সে অনুতাপ করে যে-সে দীর্ঘজীবি হলে আরও সৎকর্ম করতে পারত আর অসৎকর্মী হলে সে অনুতাপ করে যে -সে দীর্ঘজীবি হলে হয়ত পরে কুকর্ম ত্যাগ করত।"[১]

এখানে দেখছি মৃত ব্যক্তির মনোভাব পার্থিব জীবনে জীবিত ব্যক্তির মনোভাবের অনুরূপ। পুণ্য কাজে যে শান্তি সুখ পাওয়া যায় তা দীর্ঘস্থায়ী হবার আশা প্রতিটি মানুষই করে। বাসর রাতের অবসান হলে যেমন দুঃখ লাগে, সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হলে যেমন রাগ হয়, আরাম-আয়েসের চাকরিকাল শেষ হলে যেমন ব্যথা লাগে তেমনি কবরবাসী মুমেন ব্যক্তির ঐরূপ দুঃখ, ব্যথা ও অনুতাপ আসে। তার মনে হয় দুনিয়ায় আরও কিছুদিন অবস্থান করে পুণ্য কাজ করতে পারলে এর প্রতিদান আরও সুন্দর ও মূল্যবান হতো। ঐ বেহেস্তের (যা কবরবাসীকে সকাল-সন্ধ্যায় দেখান হয়) অপার সৌন্দর্য ও শান্তি প্রাণভরে চিরজীবন উপভোগ করত।

জুলুম করে, অত্যাচার করে, প্রতারিত করে অনেক মানুষেরই শেষ জীবনে অনুশোচনা আসে। অনুতপ্ত হৃদয়ে অতীতের কথা মনে পড়ে। যৌবনের সেই তাণ্ডব লীলা-খেলার কথা স্মরণ করে অশ্রুজলে সিক্ত হয়।

কিন্তু উপায় থাকে না যখন বার্ধক্যের অবসাদগ্রস্ত শিরা-উপশিরা অকর্মণ্য হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠিক তেমনি কবরস্থ পাপী ব্যক্তির আত্মাও অনুতাপে কাঁদে। দোজখের ভয়াবহ রূপ দেখে ফিরে আসতে চায় এ পৃথিবীতে। করতে চায় সৎকাজ। পেতে চায় শক্তি। নিতে চায় মুক্তি। কিন্তু ফিরে আসে না সে সময়। পূর্ণ হয় না তার এ অভিলাষ। সূর্য ডুবে আবার ওঠে। চাঁদ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে হাসিমুখে আবার উদিত হয়। রাত্রি আসে আবার যায় কিন্তু মানুষ কবর হতে ফিরে আসে না। কবরে গেলে আর পৃথিবীর মুখ দেখে না।

মৃত ব্যক্তির বিলাপ ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন (হযরত আয়েশার সঙ্গে কথোপকথনে) ঃ

"আয়েশা, গোসলদানকারী যখন মৃতদেহকে গোসল দেবার জন্য তাহার দেহের পরিধেয় অঙ্গুরী, পাগড়ি ইত্যাদি টানিয়া খোলে তখন মৃতের অসহনীয় কষ্ট হয়। আত্মা যখন এই বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায় তখন সে চিৎকার করে বলে-'ওহে আল্লহ্র বান্দা! খোদার কসম। পরিধেয় একটু আস্তে আস্তে খোল। একটু পূর্বেই মৃত্যু যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পেয়েছি। **এই চিৎকার মানব এবং দানব ব্যতীত সকলেই শুনতে পায়।"**

টীকা ঃ ১ । শায়খান। সংগৃহীত-হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। পৃঃ নং-১৪৪। কৃত আজহার উদ্দিন।

মৃতদেহে যখন পানি ঢালা হয়, তখন পূর্বের ন্যায় চিৎকার করে বলে -'ওহে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার দেহে অতি গরম বা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে কষ্ট দিও না। একটু পূর্বেই প্রাণ বের হওয়ায় শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। শরীর পরিষ্কার করার সময়ও অনুরূপভাবে কাকুতি-মিনতি করে। কাফন পরিধান করানোর সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে বলে-'তোমরা আমার কাফনের মাথার দিকটা আলগাভাবে বাঁধ যেন আমার আত্মীয়-স্বজন চিরদিনের জন্য আমাকে একবার দেখে নেয়। ঘর হতে বের করার সময় বলে-'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আমাকে এত তাড়াতাড়ি ঘর হতে বের করো না। আমার বাড়ি, ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ শেষবারের মত আমাকে দেখে নেবার সুযোগ দাও। আজ হতে আমার সন্তাগণ পিতৃহারা, এতিম। স্ত্রী বিধবা হলো। তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমি আমার সবকিছুই ছেড়ে দিচ্ছি। কোন দিনই আর ফিরে আসব না।"[১]

মৃত ব্যক্তি যে দেখতে পায় তার আর একটি প্রমাণ রসুল (দঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী। তিনি বলেছেন ঃ

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে তখন তাহার বাসস্থান প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহাকে দেখানো হয়। যদি সে দোজখবাসী হয় তবে তাহাকে দোজখের ঘর দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়-'এই তোমার ঘর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে পুনরুত্থিত না করবেন সে পর্যন্ত এখানেই অবস্থান কর।"[১]

হযরত আবু সাইদ খুদরী বলেন ঃ

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন-যখন লাশ খাটিয়াতে রাখা হয় এবং লোকে তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া লয় তখন যদি মৃতব্যক্তি নেককার হয় সে বলে :-আমাকে সম্মুখে লইয়া চল, আর যদি পাপী হয় তাহা হইলে বলে-হায় আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? তাহার এই কথা মানব ব্যতীত সকলেই শোনে। যদি মানব শুনিত তাহা হইলে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাইত।"[২]

শৈশবকাল থেকে আলেম-ওলামাদের মুখে একথা শুনেছি। এখনও শুনে আসছি। আমি তখন চিন্তা করতে পারি নি মানুষ মরে যাবার পর কেন এত সব দুঃখের কথা বলে। তখন শুনেছি আর বিশ্বাস করেছি। আজ দেখছি এ বিশ্বাস অহেতুক নয়। এর পিছনে কারণ রয়েছে। এ কারণটি খুঁজতে গিয় দেখি আত্মা মৃহদেহে আবার ফিরে আসে। তাই মৃত ব্যক্তি কাকুতি-মিনতি করে তার শরীরে আঘাত না দেবার জন্য। মৃতকে গোসল করিয়ে দেবার সময় সে বুঝতে পারে তার শরীরে পানি ঢালা হচ্ছে। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছে। দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়-চোপড় অপসারিত হচ্ছে। চাপ সহ্য করতে পারে না। আঘাতের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠে। গরম ও ঠাণ্ডা পানির অনুভূতি থাকে। তাহলে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য কোথায়?

শুধু কি তাই? নব্য বিবাহিত বধূ যেমন বাবার সংসার হতে বিদায় নেবার পূর্বে এদিক-সেদিক দেখে নেয়, ঘর-দরজা ও আসবাবপত্র দেখে, বাবা-মা -ভাইবোনকে বুকে জড়িয়ে বিলাপ করে; এমনকি পোষা কুকুর, বিড়াল অন্যান্য জীবজন্তুর দিকে তাকিয়েও অশ্রু বিসর্জন করে। এক সংসার থেকে অন্য সংসারে পদার্পণ করার মর্মবেদনায় সবাইকে জড়িয়ে ধরে। যেতে চায় না তবু যেতে হয় পুরাতন ঘর ছেড়ে নতুন ঘর বাঁধতে।

ঠিক তেমনি ঘর-দুয়ার, আসবাবপত্র, সুখের বিছানা, আদরের ছেলেমেয়ে, প্রিয়ার মুখ,

টীকা : ১ । সংগৃহীত-দাকায়েকুল আখবার। কৃত ইমাম গাজ্জালী। পৃঃ নং ২৭।

১ । শায়খান। সংগৃহীত-হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড। পৃঃ নং -১৪৪। কৃত আজহার উদ্দিন।

২ । হাদিস -মেশকাত শরীফ-তর্জমা-মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী। হান. ১৫৫৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধন-দৌলত, টাকা -পয়সা সব ছেড়ে যেতে মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় জর্জরিত হয়। আবেগে বুক ফেটে যায়। বিলাপে করুণ সুর ভেসে উঠে।

নব বধূকে নিয়ে প্রকৃতি যে খেলা খেলে, মানুষকে নিয়েও নিয়তি সেই খেলারই খোরাক জোগায়। হায়রে দুনিয়া! হায়রে সংসার! হায়রে সৃষ্টির খেলা!

এবারে হাদিস নং পাঁচ-এর বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করছি।

যদি কবরস্থ ব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় তার চিরজীবনের বাসস্থান দেখানো হয় তাহলে বলতে হবে কবরে সে নিষ্প্রাণ নয়। তার দর্শন ক্ষমতা সেখানে গিয়ে লোপ পায় না। নিষ্প্রভ হয় না। পার্থিব জগৎ থেকে সে বিদায় নিয়েছে কিন্তু অপার্থিব জগতে মূর্তিমান রয়েছে দর্শনশক্তি ও বোধশক্তি নিয়ে। কবরস্থ ব্যক্তি বুঝতে পারে সবই। শুনতে পায় সবই। দেখতে পায় সবই কিন্তু নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিছুই করতে পারে না। চেতন হয়েও অচেতন। প্রাণ থেকেও নিষ্প্রাণ। বোধ থেকেও নির্বোধ। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন :-**'কুল্লু নাফসেন জায়েকাতুল মাউত'**। অর্থাৎ প্রতিটি প্রবৃত্তিই মৃত্যুর সম্মুখীন।

মৃত্যুর পরে আত্মাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় একথা রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন। আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণও এ তত্ত্ব জানেন। তাই তাঁরা যুগে যুগেই সাবধান করে দেন এ অকৃতজ্ঞ মানবজাতিকে। 'নজরুল ইসলাম'-যাকে শুধু বিদ্রোহী কবি হিসাবেই জানি তাঁর প্রকৃত রূপ দেখি নি। পার্থিব জগতে হৈ-হল্লা করে যিনি কাটিয়েছেন-তিনি অপার্থিব জগতের কোন্ জ্ঞান আহরণ করে বলেছেন :

**"পলকে দৃষ্টি আঁধার হেরিয়া আবার দৃষ্টি হেরি
মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততোটুকু হয় দেরী।"**

[নজরুল]

এ যেন রসুল (দঃ)-এর তত্ত্বমূলক বাণীরই -**'জানাযার পর মৃতদেহ কবরস্থ করা মাত্রই আল্লাহ্র আদেশে মৃতদেহে আত্মা প্রবেশ করিবে'**-প্রতিধ্বনি। রসুলুল্লাহকে (দঃ) প্রাণের গভীরে ঠাঁই দিয়ে তাঁর মহাবাণী মানব সমাজে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রচার করাই হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই এমন সুন্দর ছন্দে ভাষা-ভাব মিশিয়ে অদৃশ্য জগতের এক রহস্যময় তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ যে মরে না কবরে শুনতে পায়, বুঝতে পারে, আনন্দ পায় এ কথাও ব্যক্ত করেছেন তাঁর অমর ছন্দ ও সুরের ধ্বনিতে। কোন্ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে তিনি গেয়েছেন ঃ

"মসজিদেরই পাশে আমায়
কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের
আযান শুনতে পাই।।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই
নামাজীরা যাবে।
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি
বান্দা শুনতে পাবে
গোর আজাব থেকে এ গুণাহ্গার
পাইবে রেহাই।।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত
নবীজির উম্মত
ঐ মসজিদে করেরে ভাই

কোরআন তেলাওয়াত
সেই কোরআন শুনে আমি যেন
পরাণ জুড়াই।।
কত ফকির-দরবেশ -আউলিয়ারে ভাই
মসজিদের আঙ্গিনাতে
আল্লাহ্র নাম জিকির করে
ডুবিয়ে গভীর রাতে
আমি তাদের সাথে জেগে জেগে
আল্লাহ্র নাম জপতে চাই।"

[নজরুল]

নজরুলের এ কথাগুলো অমূলক কিনা, রসের ভঙ্গিতে বা হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে একথা বলেছেন কিনা আমরা বিচার করি রসুল (দঃ)-এর বাণী ধরে।

(১) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন-"যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব তাহাকে-'হে সম্ভ্রান্ত সরদার' বলিয়া সম্বোধন করে তখন ঐ কবরের জন্য নির্ধারিত ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শুনিতেছ? সে বলে, 'হাঁ'। আবার জিজ্ঞাসা করে-'তুমি কি সত্যই সম্মানিত নেতা ছিলে?' আল্লাহর বান্দা বলে, 'না না। আমি কখনই তদ্রূপ ছিলাম না। বরং তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। আমি মহারাজাধিরাজের নিকৃষ্ট দাস ছিলাম মাত্র'। এরপর মৃত পরিতাপ করিয়া পুনরায় বলে-'আহা! তাহারা যদি আর কিছুই না বলিত তবে কতই ভাল হইত।'

তৎপর কবর এতই সংকীর্ণ হইয়া যায় যে এক পাঁজর অন্য পাঁজরে প্রবেশ করে ও মৃতব্যক্তি তখন চিৎকার করিয়া বলে-'হায়! ইহা হাড় ভাঙ্গার, লজ্জা ও পরিতাপের এবং কঠিন প্রশ্নের স্থান।'

কবরে মৃতব্যক্তি কথা বলে ঃ

হযরত কায়েস ইবনে কাবীসা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ)বলেছেন-"অবিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে অন্য মৃতদেহের সাথে কথাবার্তা বলার অধিকার দেওয়া হয় না। জনৈক ব্যক্তি আরজ করল-'হে আল্লাহর রসুল! মৃত ব্যক্তিরা কি কথা বলতে পারে?'

রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন, "হাঁ।। তারা একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারবে।"[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকী বলেন ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলছেন- "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কবর জিয়ারত করে এবং তার নিকট বসে, কবরবাসী তার সালামের উত্তর দেয় এবং তার সাথে ভাব বিনিময় করে যতক্ষণ না জিয়ারতকারী সেখান থেকে চলে যায়।"[২]

হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন -"যখন ফেরেস্তারা কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির আত্মা নিয়ে যায় তখন পূর্বে মৃতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই আত্মাকে পেয়ে এত বেশি আনন্দিত হয় যে এ দুনিয়ায়

টিকা ঃ ১ -২। হাদিস-ইবনে আবিদ। সংগৃহীত মৃত্যুর অন্তরালে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হারিয়ে যাওয়া কেউ ফিরে এলেও এত বেশি খুশি হয় না। অতঃপর এই আত্মাকে জিজ্ঞাসা করে–'অমুক ব্যক্তি কেমন আছে?' তখন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করবে–'ভাল আছে'। কেউ বলবে–'একটু থাম, একে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। দুনিয়ায় খুবই ব্যতিব্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল।' এরপর সে বলতে থাকবে–'অমুক এভাবে এবং অমুক এভাবে আছে।' এমনিভাবে কথা বলার মাঝে ঐ মৃতব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে (পূর্বে মৃত ব্যক্তির কথা) যে তার পূর্বে মারা গেছে সেকি তোমাদের কাছে আসে নি? এটা শুনে তারা বলবে সে তো দুনিয়া ছেড়েছে অথচ আমাদের কাছে আসে নি। তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দোজখে পাঠানো হয়েছে।"৩

মৃত ব্যক্তির স্বহস্তে তার কর্মলিপি লেখা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ

"একদা আমি রসুলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম –মুনকার–নকীরের পূর্বে কোন ফেরেস্তা কবরে আগমন করে কিনা?"রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন–

"হে ইবনে সালাম, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রুমান নামে একজন ফেরেশতা তাহাদের পূর্বে কবরে আগমন করতঃ মৃত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবেন এবং পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিতে বলিবেন।"

তখন মৃত ব্যক্তি বলিবে–'আমি কি দিয়া লিখিব। আমার নিকট কাগজ কলম কিছুই তো নাই। ফেরেশতা বলিবেন–'আঙ্গুলকে কলম, মুখকে দোয়াত এবং থুথুকে কালিস্বরূপ ব্যবহার কর।' বান্দা বলিবে–'কাগজ কোথায়?'

ফেরেশতা কাফনের কিছু অংশ ছিঁড়িয়া দিয়া বলিবেন–'ইহাতে লিখ।' তখন বান্দা বিনা দ্বিধায় পুণ্য লিখিয়া দিবে। কিন্তু পাপ কর্মসমূহ লিখিতে লজ্জাবোধ করিবে।

ইহা দেখিয়া ফেরেশতা ধমক দিয়া বলিবেন–পাপিষ্ঠ, দুনিয়াতে পাপ কাজ করিতে লজ্জাবোধ কর না আর আজ আমার সম্মুখে উহা লিখিয়া দিতে লজ্জিত হইতেছ? ইহা বলিয়াই প্রহার শুরু করিতে উদ্যত হইবেন। তখন সেই ব্যক্তি বলিবে–'আমাকে প্রহার করিবেন না। আমি সব কিছুই লিখিয়া দিতেছি।'

ফেরেশতা উক্ত আমলনামা মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতে বলায় সে বলিবে সীলমোহরাঙ্কিত করার কোন উপকরণ আমার নিকট নাই। কি দিয়া আমি এ কাজ সমাধা করিব?

ফেরেশতা বলিবেন–'তোমার নখ দ্বারা এই কাজ সমাধা কর। সে তাহাই করিবে। তখন ফেরেশতা উক্ত আমলানামা তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন। এই আমলনামা কিয়ামত পর্যন্ত তাহার গলায় ঝুলান অবস্থায় থাকিবে।"১

উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টি হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন এবং প্রশ্ন করছেন–'তুমি কি ইহা শুনিতেছ?' মৃতব্যক্তি উত্তর দিচ্ছে–'হাঁ।'

পণ্ডিত ব্যক্তিরা যা চিন্তা করতে পারেন না, বিজ্ঞানীরা যা হেসে উড়িয়ে দেন সেই স্বাভাবিক ও অকল্পনিয় বিষয়টি আমরা খুঁজে পাচ্ছি রসুল (দঃ)-এর বাণীতে।

দুনিয়ার বুকে বাহাদুরী দেখিয়ে, রাগে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে যারা মহাসম্মানী বলে

৩। ঐ আহম্মদ ও নসাই। সংগৃহীত –মৃত্যুর অন্তরালে। কৃ০–মওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী। বরযখ পরিচ্ছেদ। পৃঃ নং ১২-১৫।

টীকা ঃ ১। হাদিস। সংগৃহীত–দাকায়েকুল আখবার। পৃঃ ৪২—৪৫।

খ্যাতি লাভ করেছিল তারা আজ অসহায় এ কবরে। দুনিয়ায় সম্মানিত ব্যক্তি ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিচ্ছে লজ্জায় ও ভয়ে, 'না–না।' এরূপ ব্যক্তির শক্তির মাত্রা কত ভায়াবহ কবরের কি কঠিন চাপ তা ব্যক্ত হয়েছে এ হাদিস থেকে। মৃত ব্যক্তির মুখ হতে।

দ্বিতীয় নং হাদিস থেকে দেখছি মৃত ব্যক্তিকে বাধ্য করা হবে লিখে দিতে তার পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম। দেখা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তি তার শুধু সদ্‌গুণাবলীর কথাই লিখেছে। কিন্তু দোষ-ত্রুটি, অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার বা দুর্ব্যবহারের কোন কথাই তার জীবন তালিকায় লিখছে না। ইচ্ছাকৃত ভাবেই তার অপরাধসমূহকে লুকিয়ে যাচ্ছে। এরপর ফেরেশতার ভয় প্রদর্শনে বাধ্য হয়ে লিখছে। এ যেন দুনিয়ার খেলা। পুলিশ অপরাধীকে নিয়ে গোপন কথা শুনতে চায় ও নোট করতে চায়। অপরাধী কোনক্রমেই নিজের দোষের কথা বলে না। তার যতসব গুণকীর্তন ক'রে অপরাধের কথা লুকিয়ে যায়। আর নিজকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। কিন্তু কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করার পর সব অপকর্মের কথা অকপটে বলে দেয়। লজ্জা হলেও তখন আর উপায় থাকে না। পুলিশ তখন বিচারের অপেক্ষায় হাজতে পুরে রাখে খুনী, দাগী, চোর হিসাবে।

কবরের মাঝে যদি মৃত ব্যক্তি লিখতে পারে, সারা জীবনের কৃতকর্ম স্মরণ করতে পারে, হুকুমের নির্দেশ পালন করতে পারে আজাবের জন্য মর্মাহত হৃদয়ে বলতে পারে–'হায়! ইহা হাড় ভাঙ্গার, লজ্জা পরিতাপের কঠিন প্রশ্নের স্থান'–তবে কি বলবেন মানুষ মরে যায়?

এতক্ষণ আমরা অদৃশ্য জগতের মাঝে ছিলাম। এ জগতের ফেরেশতা আর সেই জগতের মৃতদেহের কাণ্ড-কারখানা দেখলাম। একজন ভয় দেখাচ্ছে আর একজন তা দেখে চিৎকার করছে। একজন নির্মমভাবে প্রহার করছে আর একজন নির্বিবাদে কাঁদছে। একজন নির্দেশ দিচ্ছে আর একজন তা পালন করছে। এবার দেখি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের রহস্য।

মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে রসুলুল্লাহর (দঃ) কথা ঃ

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মৃত বক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন –এমন রহস্যপূর্ণ ঘটনা জানবার সাধ কার না হয়। আমরা মনে করি মৃত্যুর পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সব ধুলির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। জ্ঞানশক্তি, বোধশক্তি, ধারণাশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি সব কিছুই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। পূর্বে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। অনেকে বিশ্বাস করেছেন। অনেকে সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আসুন, জ্ঞানী-গুণী, বিশ্বাসী সম্প্রদায় যাঁরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাঁকে অদৃশ্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে হৃদয়মনে স্বীকৃতি দিয়েছেন–তাঁরা শুনুন এ মহানবী কোন্ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের হতবাক করলেন।

আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

"বদরের দিনে নবী করিম (দঃ) আদেশ দিলেন এং চব্বিশজন কোরাইশ প্রধানকে নিক্ষেপ করা হইল বদরের এক শড়া পচা কূয়ার মধ্যে। তাঁহার রীতি ছিল যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের ওপর জয়লাভ করিতেন, তিনি তিনদিন অবস্থান করিতেন ময়দানে। যখন বদরে তৃতীয় দিন হইল, তিনি নিজের উটের পালান কসিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহার আসবাব উহার ওপর স্থাপন করা হইল। তারপর তিনি হাঁটিয়া চলিলেন এবং সাহাবীরা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। তাহারা বলিল–'আমাদের মনে হয় তিনি কোন কাজে যাইতেছেন। অবশেষে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি সেই কূয়ার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং এ মৃতদের নাম ও বাপের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।"

"হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি মনে কর না যে খোদা ও তাঁহার রসুলকে (দঃ) মানাই তোমাদের পক্ষে সুখের হইত? আমরা তো আমাদের প্রভু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেলেন তাহা সত্য পাইয়াছি; তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সত্য পাইয়াছ?"

আবু তালহা বলেন, তখন উমর বলিলেন–'রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনি কি কথা বলিতেছেন ঐ দেহগুলির সহিত যাহাদের মধ্যে আত্মা নাই।'

তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ

'কসম তাহার যাহার হস্তে মুহাম্মদ (দঃ) -এর জীবন –তোমরা বেশি শোন না যাহা আমি তাহাদের বলিতেছি–তাহাদের চেয়ে।'

(ওয়াল্লাজি নাফ্ছো মুহাম্মদে বে-ইয়াদিহি মা আনতুম বে-আসমায়া লে-মা আকুলু মিনহুমা)[১]

উপরে বর্ণিত রসুল (দঃ)-এর পবিত্র বাণী হতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ভাইয়েরা কি বুঝলেন? কি সিদ্ধান্ত দেবেন? মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করার অর্থ কি? যদি তারা না বুঝত তাহলে হযরতের মত মহাবৈজ্ঞানিক কেন সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ঐ নিকৃষ্টতম পচা দুর্গন্ধময় কূপের নিকট গমন করলেন এবং একটি একটি করে পাপীদের বাপের নাম ধরে কথাগুলো শোনালেন। হযরত উমরের মত বিজ্ঞ সাহাবা এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানতেন না যে মৃত ব্যক্তি কবরের মাঝে মৃত নয়। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্বোধনে অবাক নেত্রে তাঁকে প্রশ্ন করলেন–'হে রসুলুল্লাহ (দঃ)। আপনি কি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন–যাহাদের দেহে আত্মা নেই।' এর প্রতি উত্তরে রসুল (দঃ) তাঁকে কি শোনালেন?'

সর্বকালের, সর্বজাতির মানুষকে জানিয়ে দিলেন, তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়ে দিলেন, অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন আর মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র মহাকৌশলের অচিন্ত্যনীয় ব্যাখ্যা দিলেন এই বলে–

"তোমরা বেশি শুন না তাহাদের চেয়ে যাহা আমি তাহাদের বলিতেছি।"

এ মহামূল্যবান বাণী হতে আমরা শিখলাম '**মানুষ মরে না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।** এক নশ্বর পৃথিবী হতে আর এক অবিনশ্বর রাজ্যে প্রত্যাগমন করে। আল্লাহ স্বয়ং এ কথাই বলেছেন ঃ

"লা তারকাবুন্না তাবাকান আন তাবাক।"[১]

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে অধিরোহণ করিবে।'

এ মহাবাণী হতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে প্রতিটি মানুষই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছে। অর্থাৎ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই আমরা এ অবস্থা দেখতে পাই। একটি শুক্রকীট ও ডিম্বের সমন্বয়ে একবিন্দু রক্ত। রক্ত হতে মাংস। মাংস হতে অস্থি-মজ্জা। এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আত্মা। সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ শিশু। শিশু হতে আবার কিশোর। কিশোর হতে যুবক। যুবক হতে প্রৌঢ়। প্রৌঢ় হতে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হতে মৃত্যু অর্থাৎ অন্য জগতে প্রত্যাবর্তন। প্রতিটি প্রাণীর ব্যাপারেই এ বাণী সত্য। শুধু প্রাণী নয়। সৃষ্ট

টীকা ঃ ১ । সহীহ বুখারী–২য় খণ্ড। জেহাদের পরিচ্ছেদ।
তর্জমা–আঃ রহমান খাঁ। হাঃ নং –৫/৪২২।
টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা এনশেকাক। আয়াত –১৯

বস্তুমাত্রই এ রূপান্তরের নিয়মভুক্ত। প্রজাপতি চক্ষুষ্মানদের জন্য একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডিম থেকে গুটিপোকা। গুটিপোকা হতে অতি মনোরম আকৃতির প্রজাপতি। মূল বস্তু ঠিকই থাকে। শুধু দেহের রূপান্তর হয়। তাই ভ্রূণ থেকে মানবশিশু। ডিম থেকে পক্ষী। জল থেকে বরফ। জলের মূল বস্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যেমন পরিবর্তনেও বিনাশ হয় না, লয় হয় না, ক্ষয় হয় না তেমনি মানবদেহের আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিনাশ হয় না, আর বিনাশ হয় না বলেই মৃতদেহে যখন ফিরে আসে (রসুল (দঃ)-এর বাণী অনুযায়ী) তখন মৃতব্যক্তি চেতনাশীল হয়, দর্শনশক্তি ফিরে পায়।

সৃষ্টির এ অপরূপ রহস্য বোঝে কার সাধ্য!

কোরআনে যেমন রূপান্তরের কথা বলে ইঞ্জিল শরীফ অর্থাৎ বাইবেল 'নূতন নিয়ম' (NEW TESTAMENT) অধ্যায়ে সে কথাই হযরত ঈসা (আঃ) -এর পবিত্র মুখ থেকে বলা হয়েছে। বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

"আমি তোমাদের এক নিগূঢ় তত্ত্ব বলি; **আমাদের সকলের মৃত্যু হইবে না। কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হইবে।** এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তুরী ধ্বনিতে তাহা হইবে। কারণ তুরী বাজিবে তাহারা মৃতেরা অবিনশ্বর হইয়া উত্থাপিত হইবে এবং আমরা রূপান্তরিত হইব।"[১]

মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে হযরত শোয়েব (আঃ)-এর কথা

"অনন্তর ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, তৎপর তাহারা নিজেদের গৃহের মধ্যে অধোমুখে পড়িয়া রহিল। যাহারা শোয়েবকে অসত্যারোপ করিয়াছিল–তাহারা যেন কখনও তথায় ছিল না; যাহারা শোয়েবকে অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অতঃপর সে তাহাদিগ হইতে প্রত্যাবর্তিত হইল এবং বলিল–"হে সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার প্রতিপালকের প্রেরিত বার্তা প্রচার করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য সদুপদেশ দান করিয়াছি। তৎপর কিরূপে আমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষুণ্ণ হইব"?[২] (৯ : ৯১-৯৩)

হযরত শোয়েব (আঃ)-এর সময় যখন অবিশ্বাসীদের দুর্ব্যবহার, অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা চরম রূপ ধারন করে তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন– 'হে আল্লাহ! কে সত্যবাদী এবং কে অসত্যবাদী তুমি তার মীমাংসা করে দাও।'

আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। অবিশ্বাসীদের ওপর এক ভীষণ শাস্তি অবতীর্ণ হয়। আগুনের লেলিহান শিখা, ভূমিকম্প ও ধ্বংস ধ্বনিতে অবিশ্বাসীদের প্রাণশূন্য দেহ স্ব-স্ব গৃহের মধ্যে পড়ে থাকে। হযরত শোয়েব (আঃ) বিশ্বাসীদের নিয়ে এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন এবং এ ধ্বংসলীলা হতে মুক্তি লাভ করেন। এরপর তিনি বিধ্বস্ত স্থানে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণাম দেখে তাদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন ঃ

"হে হতভাগ্য সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করিয়াছিলাম; এবং তোমাদের হিত কামনা করিয়াই আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা তাহা না শুনিয়া এবং আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া যখন

টীকা ঃ ১ । নূতন নিয়ম–বাইবেল। করিন্থিয় অধ্যায়। ১৫/৫১-৫২
২ । কোরআন। সূরা আরাফ। আয়াত ৯১-৯৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজেদের দোষে অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছ তখন আমি তোমাদের জন্য কেমন করিয়া দুঃখ করিব এবং দুঃখ করিলেই বা আর কি ফল হইবে।"[১]

মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করার কারণ কি? তাদের এসব কথা বলে শোনাবার প্রয়োজন কি? তারা কি তবে শোনে, বোঝে ও দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়? দুষ্কৃতকারী, অবাধ্যকারী ও অত্যাচারী বলে কি তারা নিজেদেরকে দোষী বলে স্বীকার করে? পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েও, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েও যদি তারা শুনতে পায়-বুঝতে পারে (নবীদের কথায়) তাহলে কি বলবেন না-'মানুষ এক জগৎ হতে অন্য জগতে শুধু পাড়ি জমায়-'মরে না।'

চলুন, আরও কিছু শুনি, জানি ও জ্ঞান লাভ করি। আর ঐ রহস্যময় স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন হই।

কবরে লেখা-পড়া

জ্ঞানার্জনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে যারা লেখা-পড়া করে, জাতি-ধর্ম ও মানব সেবার অদম্য স্পৃহা যাদের হৃদয়ে জাগে, অথচ এ বাসনা পূর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয় তারা কবরের মাঝেই সুমহান শিক্ষকের হাতে শিক্ষালাভ করেন। চতুর্দিকে সাজানো থাকে তাদের জন্য অসংখ্য বই-পুস্তক। দুনিয়ায় যেমন জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিরা লাইব্রেরীর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন-কবরের মাঝেও ঠিক তেমনি জ্ঞান -ভাণ্ডারে ডুবে থাকেন। কে অলক্ষ্যে থেকে শিক্ষার্থীর জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেন, অপূর্ব জ্ঞানের আলোকে কবরে মৃত ব্যক্তির হৃদয় আলোকিত করেন-সে কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। দুনিয়ার এ শিক্ষা অপূর্ণ ও অতৃপ্তিকর। যে মহান ব্যক্তিরা কবরের মাঝে শান্তির বদলে শিক্ষা পান, লেখাপড়ায় আত্মভোলা হয়ে সময় অতিবাহিত করেন তারা কতই না সৌভাগ্যবান। রসুলুল্লাহর (দঃ) এমন রহস্যপূর্ণ বাণী দেখে আমি নিজেও এ কামনা করি। একান্তভাবেই সেই অদৃশ্য নিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাকে কবরের মাঝে দৃশ্য -অদৃশ্য বস্তুসমূহের বাস্তব জ্ঞানদান করে সুপণ্ডিত করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করবার কৌশল শিখিয়ে বেহেস্তের মাঝে সগৌরবে তা বিকাশ করবার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেন। আর আমার মত নির্বোধ বিশ্বাসী ভাইদের আশাও পূর্ণ করেন। (আমিন)

চলুন, এবার রসুলুল্লাহর (দঃ) এ তত্ত্বমূলক বাণীটি দেখে নেই। তিনি বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানার্জনের জন্য ব্রত হইয়া কিছু শিখিয়াছে আর বাকি রহিয়াছে এরূপ অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তবে সে শহিদের দরজা পাইবে এবং তার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া তাকে জ্ঞানদান করিবেন। কিয়ামতের দিনে সে পূর্ণ জ্ঞানীরূপে উত্থিত হইবে।"[১]

উপরে বর্ণিত হাদিসটির বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছেন আবু নছর নিশাপুরী। তিনি বলেন ঃ

"একদা কবর খননকালে অন্য একটি কবরের কিছু অংশ কাটা পড়িল। তাতে দেখা গেল একজন তরুন যুবক কোরআন শরীফ হাতে কারিয়া অতি মধুর সুরে তাহা পাঠ করিতেছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'হে ভাই কিয়ামত হইয়াছে কি?'

আমি বলিয়াম-'না', এখনও কিয়ামত হয় নাই। তখন সে বলি, 'আমার কবরের খোলা অংশটুকু বন্ধ করিয়া দিন।[২]

টীকা ঃ ১। কোরআন। সূরা আরাফ। তর্জমা -কৃত আলী হাসান। পৃঃ নং ৫১৮-১৯ অনুবাদ বিশ্লেষণ।
টীকা ঃ ১ -৩। হাদিস। সংগৃহীত-'মরণের পরে'। কৃত-মোঃ এনামুল হক নিজামী। পৃঃ নং ৫১-৫৩।

হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত ঃ

তিনি বলেছেন ঃ "আমি কোন কারণবশত রাত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) -এর কবরের পাশে অবস্থান করিতেছিলাম। তাঁহার কবর হইতে এমন সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াতের সুর শুনিতে পাইলাম -যাহা আমার মন-প্রাণকে বিমোহিত করিয়াছিল।"[৩]

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন -"যখন মোমেন মৃতদেহকে কবরে রাখা হয় তখন তাহার নিকট মনে হয় যেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে। যখন সে তাহার চক্ষুদ্বয় মুছ্তে মুছ্তে উঠে বসে এবং বলে আমাকে ছাড় আমি নামায পড়ব।"[৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

"একজন সাহাবী অজ্ঞাতসারে একটি কবরের ওপর তাঁবু গাড়িয়াছিল। কবরটি হইতে সূরা 'মোলক' পড়ার আওয়াজ আসিতেছিল। তখন সে সেখান হইতে উঠিয়া রসুলুল্লাহর (দঃ) দরবারে গিয়া ইহা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ

"সম্ভবত এই লোকটি দুনিয়াতে থাকাকালেও এই সূরার আমল করিয়াছে। তাই আল্লাহ-পাক কবরেও তাহার মুখ হইতে কোরআন পাঠ করাইতেছেন।"[১]

উপরে উদ্ধৃত রসুল (দঃ) -এর বাণী ও অন্যান্য সাহাবীদের বর্ননা হতে দেখা যায় যে মৃতব্যক্তি কবরে পড়াশোনা করে। সূরা 'মোলক' পাঠ করার শব্দ এবং কোরআন পাঠ করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এ কথাগুলো বিশ্বাসী বান্দারা অবিশ্বাস করতে পারে না। কেননা এ সূরাটি যে ইহ-পরকালের মুক্তি-সনদ তার প্রমাণ রসুল (দঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী।

তিনি বলেছেন ঃ

"পবিত্র কোরআন শরীফে এরূপ ত্রিশটি আয়াত আছে যাহা লোকের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি সাধন করিয়া থাকে। উহা **'তাবারাকাল্লাজি বে ইয়াদিহিল মুলক।"**[২]

'মানুষ যে মরে না'-সে পাপীই হোক আর পুণ্যবানই হোক-উপরে উদ্ধৃত হাদিসসমূহ তা প্রমাণ করে।

এখানে আর একটি গভীর তত্ত্ব রসুল (দঃ)-এর বাণী হতে পেশ করছি। **'মানুষ যে মরে না'** এটা তার আর একটি প্রমাণ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

'নিশ্চয়ই তোমাদের কার্যাবলীর ফিরিস্তি তোমাদের কবরবাসী আত্মীয়স্বজনদের সম্মুখে (মৃত ব্যক্তিদের) পেশ করা হয়। যদি তোমরা সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে থাক তাহলে খুশি হয় এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ক'রে বলে-'হে আল্লাহ! এটা তোমার দয়া ও অনুকম্পা। অতএব

৪। মেশকাত শরীফ। হাঃ নং ১৩১/১।
টীকা ঃ ১ হাদিস। সংগৃহীত-'মরণের পরে'।
কৃত--মোঃ এনামুল হক নিজামী। পৃঃ নং ৫১-৫৩
২। হাদিস। তিরমিজী। আহম্মদ, আবু দাউ, নেসাই ও ইবনে মাজা সংগৃহীত-হাদিস আলো, ১ম খণ্ড। কৃত আল্লাহার হোসেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি তাদের ওপর তোমার পরিপূর্ণ নিয়ামত দান কর এবং এ অবস্থায়ই তাদেরকে মৃত্যু দাও। আর যদি তাদের সামনে অসৎ কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করা হয় তখন তারা বলবে ঃ

"হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সৎকাজ সম্পাদনের এবং তোমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের তওফীক দাও।"[৩]

কবরের অভ্যন্তর হতেও যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তারা কি মৃত?

মুমেন ও শহিদদের দেহ পচে না

মাটির গড়া দেহ মাটিতে মিশে যায়। মাটিতে রূপান্তরিত হয়। এটা যেমন সত্য তেমনি বিজ্ঞানসম্মত। তবুও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই মাটির তৈরি ইট কোনটি থার্ড ক্লাস, কোনটি সেকেন্ড ক্লাস, কোনিটি ফার্স্ট ক্লাস। আবার কোনটি বা একদম ঝামা। থার্ড ক্লাস ইটের স্থায়িত্ব সময় কম। সেকেন্ড ক্লাসের বেশ কয়েক যুগ। ফার্স্ট ক্লাসের কয়েক হাজার বছর। আর ঝামা ইটের স্থায়িত্বকাল পাহাড়ের ন্যায় অগণিত বছর। এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলবেন–মাটির ওপর উত্তাপের সমতা ও অসমতা। যে মাটি নির্দিষ্ট তাপে নিদিষ্ট সময় ও সঠিক নিয়মে রূপান্তরিত হয় তাই প্রথম শ্রেণীর বা ফার্স্ট ক্লাস ইট বলে ধরা পড়ে। এ ইটের স্থায়িত্বকাল এ জন্যই বেশি। এর মূল্যও অনেক বেশি।

যে মহান ব্যক্তিরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর ধ্যানে মত্ত হয়, জেকেরে রাত্রি কাটায়, **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** মন্ত্রে সমস্ত দেহকে বিদ্যুতায়িত করে তার দেহ মাটিতে পচে যাবার কথা নয়। প্রতিটি মাংসপেশী, অস্থি মজ্জা, শিরা-উপশিরায় বিদ্যুত প্রবাহ ঘটে। সাধারণ মাটির দেহ আর থাকে না। প্রথম শ্রেণীর ইট ও ঝামার ন্যায় কঠিন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। কয়লা পুড়ে যেমন হীরার সৃষ্টি হয়, মানুষের দেহ (জেকেরকারী) পুড়েও তেমনি হীরার মত দেহ সৃষ্টি হয়। হীরার যেমন লয় নেই, ক্ষয় নেই, আলো বিকিরণের বাঁধা নেই তেমনি মুমেন মানবের দেহের ক্ষয় নেই, লয় নেই, বিকৃতি নেই, যেমন ছিল তিমনি থাকে। নবী-পয়গম্বর, ওলি-গাউস, সাধক-তাপস, দয়ালু-দাতা, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক যারা আল্লহর পথে জীবন অতিবাহিত করেছেন, রাত্রির সুখ হারাম করে, তাঁরই ধ্যানে মত্ত হয়েছেন, সৃষ্টির অপরূপ বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে কলম ধরেছেন, এবং দেশ-জাতি ও ধর্মের জন্য শহিদ হয়েছেন তাদের মৃত্যু নেই। তাদের দেহ পচে না। এমন কি তাদের কাফনের কাপড় পর্যন্ত অক্ষত থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত একটি -দুটি নয় অসংখ্য। যুগে যুগেই এর দৃষ্টান্ত মেলে। এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরছি।

মুহাম্মদ ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

"আমার মাতার মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কবর খনন করার সময় অন্য একটি কবরের কিছু ফাঁকা হইয়া গেল। তখন কবরটির ভিতরে দেখা গেল মৃত লাশটির কাফনের কাপড় একদম নতুন সাদা ধবধবে। আর একটি ফুলের ঝুড়ি ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এই ফুলের সুঘ্রাণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরে কবরটির খোলা জায়গাটুকু বন্ধ করিয়া দিলাম।'[১]

৩। হাদিস। সংগৃহীত–'মৃত্যুর অন্তরালে'।
কৃত–মৌঃ আশেক-ইলাহী বুলন্দশহরী। পৃঃ নং -৯৫

টীকা ঃ ১ । সংগৃহীত – 'মরণের পরে'। কৃত– পূর্বে বর্ণিত।

পুরান যুগের কথা শুনে নতুন যুগের ছেলেরা শুধু হেসেই উড়িয়ে দেয় না–অবাস্তব, গাঁজাখুরী ও অবৈজ্ঞানিক বলে উপহাস করে এবং বলে অন্ধ যুগের এ ধারণা ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের জন্য শোভা পায়, বৈজ্ঞানিক যুগের জন্য নয়। অথচ বিশ্বাস করে রাশিয়া ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের কাল্পনিক সূত্র যার কোন প্রমাণ নেই–দলিল নেই। এই কয়দিন আগে আমার রচিত **'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'** পুস্তকের বিরুদ্ধে **'দৈনিক করতোয়া'** বগুড়া পত্রিকায় জনৈক ব্যক্তি বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করে আমাকে 'সাইন্স-টু -ডে' (Science-to-day) সাময়িকী পড়তে বলেছেন। সেখানে নাকি বলা হয়েছে পৃথিবীর চারটি গতি রয়েছে। বিস্ময়কর উন্নতির যুগের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর বাণী ও রসুল (দঃ)-এর বাণীর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এজন্য তাঁর উত্তরে একস্থানে লিখেছিলাম ঃ

"বিস্ময়কর উন্নতির যুগে শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করা হচ্ছে। কিন্তু ওদের ওদের প্রশ্ন করে দেখেন মনের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত মাইল? কত আলোক বর্ষ? এক মিলি-সেকেন্ডেই কিন্তু সপ্তাকাশ পাড়ি দেয়। মাইক্রোস্কোপে দেখিয়ে উত্তর দিতে বলেন–আত্মার ঘনত্ব কত? প্রেমের ওজন কত? ব্যথা-বেদনার আয়তন কত? এর সঠিক উত্তর 'সাইন্স-টু-ডে' সামায়িকীতে পেলে বেদ-বাইবেল কোরআন দূরে রেখে আপনাকেই শ্রদ্ধা জানাব–স্বীকৃতি দেব। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে আপনাকে আখ্যায়িত করে সম্মান দিব।" উত্তর আসে নি। আসবে না কোনদিন। এজন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়েই **'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'**–বইটির সপ্তম সংস্করণ বের হয়েছে।

এবারে অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত চিন্তাবিদরা নতুন যুগের নতুন ঘটনা শুনুন। মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখা গিয়েছিল এ বিস্ময়কর ঘটনা। নতুন, পুরাতন, বিশ্বাসী, সাহিত্যিক, কবি, লেখক, ছাত্র, শিক্ষক এবং কৌতূহলী জনতার ভিড় জমেছিল এ দৃশ্য দেখতে। আমার বাড়ি হতে মাত্র এক মাইল দূরত্বের এ চমকানো ঘটনা। যাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার উদ্ভব –তিনি ছিলেন খ্যাতনামা সহৃদয়বান দাতা ও দয়ালু এক মহান ব্যক্তি। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ধুনট উপজেলার অধীন ভাণ্ডারবাড়ি গ্রাম নিবাসী তছিম উদ্দিন তালুকদার। আমি শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত। তাঁর মধুর সম্বোধন, প্রাণঢালা আদর দেখে আমি অভিভূত না হয়ে পারি নি। শুধু আমি নই, এতিম, দুঃখী, ফকির, কৃষক তথা ঐ অঞ্চলের এমন কেউ ছিল না যে তাঁর দান ও ব্যবহারে মুগ্ধ হতো না। গোশাইবাড়ি হাইস্কুল, ভাণ্ডারবাড়ি হাইস্কুল, মসজিদ এবং গরিবের বাড়িতে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা তাঁর হাতে যে কত হয়েছে তার হিসাব নেই। শুনেছি মৃত্যুর পূর্বে যে মসজিদের কাজ শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেন নি। এজন্য তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার আবদুর রশিদ (যিনি বর্তমানে জলেশ্বরীতলায় প্র্যাকটিস করেন) সাহেবকে নির্দেশ দিয়েও ছিলেন–আশি বিঘা সম্পত্তির ফসল পৃথক করে রাখতে। যতদিন পর্যন্ত ঐ মসজিদের কাজ শেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত ঐ টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহৃত হবে। কোন অংশীদারের অধিকার থাকবে না ভোগ করতে। শুনুন, পাঠকবৃন্দ! কে আল্লাহর প্রিয় কে অপ্রিয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি কোন আলেম বা ধর্মবিশারদ নন, একজন ধনী ব্যক্তি, ইউনিয়ন প্রধান। কাল-চেহারা বিশিষ্ট। মধ্যম আকৃতির। অথচ ভিতরে ছিল আলো। আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই এত দয়া এত মায়া। কবরের ভয়। হিসাব দিবসের ভয়–এ ভয় হৃদয়ে নিয়েই ১৯৭৪ সনে চোখ বুজলেন। বিছানা নিলেন অন্ধকার কবরে। ১৯৮৮ ইং সনের ভয়াবহ বন্যায় যখন বাড়িঘর বিধ্বস্ত হলো, জীবজন্তুর ঠাঁই রইল না, কবরের চিহ্ন রইল না, স্রোতে মানুষ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্তু-জানোয়ার অদৃশ্য জগতে পাড়ি জমালো তখন ভয়ঙ্কর বন্যার স্রোত তাঁর এ মৃতদেহকে ঠাঁইচ্যুত করল না। কেন? এর জবাব অবিশ্বাসীরা দিতে পারবেন? শুধু তাই নয়। পনের বছর পূর্বের এ মৃতদেহের কাফনের কাপড় একটুও পুরাতন হয় নি-নষ্ট হয় নি। মনে হচ্ছিল যে তিনদিন পূর্বের এ কাফন। শরীরটাও পচে নি। পোকায় খায় নি। ফলে মাটির সঙ্গে মিশে যায় নি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি এর পিছনে আছে? আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। গালি দেবার লোকেরও অভাব হবে না। চলুন দেখি, রসিক সাংবাদিকের কি মন্তব্য।

দৈনিক করতোয়া (বগুড়া)

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং

১৫ বছর পরেও কবরে লাশ অবিকৃত?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সারিয়াকান্দি (বগুড়া)–২৭শে সেপ্টেম্বর। ধুনটে ১৫ বৎসর পূর্বে মৃত্যু হলেও মরদেহ কবরে তরতাজা রয়েছে বলে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ধুনট উপজেলার ভাণ্ডারড়ি গ্রামের তছিম উদ্দিন তালুকদার ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবদ্দশায় তিনি এলাকায় ২টি হাইস্কুল, একটি মসজিদ -সহ অন্যান্য জনহিতকর কার্য করেন। নিজ হাতে গড়া মসজিদটির পার্শ্বেই তাকে সমাহিত করা হয়। বৈশাখীতে বাঁধ ভাঙ্গায় ঐ স্থান দিয়ে একটি খাল বেরিয়েছে। কবরটির কিছু অংশ খালের মধ্যে যাওয়াতে মরদেহের কাফনের কাপড় বেরিয়ে পড়ে। ঐ গ্রামের জনৈকা মহিলা কাপড়টি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টার কালে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। মরদেহ বা কাপড়ের কিঞ্চিৎ পরিমাণ নষ্ট হয় নি। শত শত কৌতূহলী জনতা প্রকৃতির কুদরতী রহস্য দেখার জন্য ভীড় জমাচ্ছে।

আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা এর কারণ কি ল্যাবরেটরী থেকে অনুসন্ধান করে বিশ্বাসীকে জানিয়ে দিন।

শৈশব থেকেই এরূপ বাস্তব ঘটনার কথা শুনেছি। তখন বিশ্বাস করতে পারি নি। বলতাম নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইচ্ছে হতো কবর খুঁড়ে দেখি মৃতব্যক্তিদের কি অবস্থা। কিন্তু উপায় নেই। ইসলামী মতে এটা সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ। নইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা এ অভিযান চালাত এবং দেখত–বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেহ ও কাফনের কাপড় পচে না কেন?

অনেক মানবদেহ কবরে অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়। এরূপ ঘটনার কথা একটি দুটি নয়, শত শত। তাদের একটি লোম পর্যন্ত শরীর থেকে ঝরে পড়ে না। দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যায় না। শরীরের রক্তপ্রবাহও বিদ্যমান থাকে। নিচের উদ্ধৃতি এর প্রমাণ।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (দঃ) হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত ঃ

"ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী দু'জন আনসারকে একই কবরে রাখা হয়। হঠাৎ একদিন উপরিস্থিত জায়গা হতে পানি প্রবাহের কারণে কবরটি ফেটে যায়। এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অন্য কবরে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা! দেখা গেল লাশ দুটি সম্পূর্ণই অপরিবর্তনীয় ও জীবিত অবস্থায় রয়েছে। মনে হলো যেন এইমাত্র তাদের দাফন করা হয়েছে। এই ঘটনা উদঘাটন হয় ওহুদ যুদ্ধের ৪৬ (ছেচল্লিশ) বছর পরে।"

একই কবরে দুজন শহিদ ছিলেন। দু'জনেরই একই অবস্থা। কেউ পোকা-মাকড়ে দংশিত হন নি। ৯৯টি সাপও (কাফেরদের কবরে) কবরে দেখা যায় নি রক্তের লাল রং-এ কবর রঞ্জিত হয় নি। এখান থেকে কোন কান্নার শব্দও কেউ শুনতে পায় নি। বরং দেখা গেল অতি সম্মানের সঙ্গেই মৃতদেহ দুটিকে রাখা হয়েছে। এরা মৃত নয় জীবিত।

দেখুন ঐ ওহুদের যুদ্ধের এরূপ আর একট ঘটনা। "তৎকালীন শাসনকর্তার আমির মুবাইয়া (দঃ) মদিনা শরীফে একটি নহর খুলিতে আরম্ভ করেন। ঘটনাচক্রে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধে শহিদগণের সমাধিস্থান খননকার্যের মুখে পড়ল। তখন আমির মুবাইয়া প্রত্যেককে জানিয়ে দিলেন এখানে যাদের পূর্বব্যক্তিদের সমাধিস্থ করা হয়েছে তাদের অতি সত্বর সরানোর ব্যবস্থা করা হোক। ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ বংশীয় বা আত্মীয়-স্বজনদেরকে উঠিয়ে অন্যত্র নেবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু কি অপূর্ব কেরামত! মহান আল্লাহর বাণী অনুযায়ী দেখা গেল প্রত্যেকটা লাশই যেন সদ্য দাফন করা। আর ইহাও উল্লেখ আছে যে হযরত হামজার (রাঃ) পা মোবারক ওঠানোর সময় একটু অস্ত্র লাগাতেই তাজা রক্ত বের হইতেছিল।"

এ ঘটনা বিশ্লেষণ করবার কোন প্রয়োজন আছে? পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহ হতে দেখেছি কবরে প্রশ্ন-উত্তর হচ্ছে–ফেরেস্তাদের আজাব হচ্ছে, শান্তির বিছানা রচিত হয়েছে, লেখাপড়া হচ্ছে, কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে, দেহ তাদের পচে নি, কাফনের কাপড়ও নষ্ট হয় নি। এবার দেখলাম দেহ তো অক্ষত আছেই, শরীরের পশম পর্যন্ত ঝরে পড়ে নি। অস্ত্রের আঘাতে দেহ হতে তাজা রক্ত ঝরছে! ম্যাজিকের মত বিস্ময়কর খেলা নয় কি? তবুও ম্যাজিক নয়। ভেল্‌কিবাজির খেলা নয়। এ ঘটনার উদ্ভাবক কোন জ্বেন -পরী নয়। মানুষ নয়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ! তাই বোঝা, অনুভব করা, স্বীকার করা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কি কোন যুক্তি আছে?

চলুন, আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা দেখে নেই।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঃ

যে ঘটনাটি লিখতে চলেছি তা যেমন বাস্তব তেমনি চমকপ্রদ। শুধু মুসলমানের নিকটই নয় দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি যারা স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখেছে তারাই অবাক হয়েছে। এ ঘটনা উপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহের সাক্ষ্য দান করে। আল্লাহ ও রসুল (দঃ)-এর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার চোখকে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কোরআনের পৃষ্ঠার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত মহাবাণী এবং রসুল (দঃ) -এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কথা চোদ্দশ বছর পর মাটির অভ্যন্তরের দুটি মৃতদেহ **'মরেও মরে নাই'**–ঘোষণা দিয়ে তা সত্য বলে প্রমাণ করবে কেউ কি তা ভাবতে পারে? যা চিন্তা করা যায় না–যা কল্পনায় আসে না, –যার সত্যতা বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে খুঁজে পায় না–তাই ধরা পড়ল এক অপরূপ দৃশ্য নিয়ে ১৯৩২ ইং খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের মাটিতে। টেলিভিশন ছবি তুলল, রেডিও প্রচার করল, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরে উঠল, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাণে আনন্দ, আতঙ্ক ও রহস্যের ভাণ্ডার তুলে ধরল। পুরাতন হলেও এ ঘটনা তাই নতুন। এজন্যই হয়ত তুলে ধরেছেন আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান সাধক,—চার তরিকার কামেল পীর হযরত মৌলানা শাহ সূফী সাজ্জাত আহম্মদ, বি. এ.। প্রাক্তন হেডমাষ্টার নাচোল হাইস্কুল, নবাবগঞ্জ রাজশাহী। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘ আটটি বছর থেকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথায় অতিরঞ্জিত নেই। সততায় তুলনা নেই। তপস্যায় বিরাম নেই। সত্য প্রচারে ভীতি নেই। অথচ আচরণে নম্র, ভদ্র ও নিরহঙ্কার। শুধু আরবী শিক্ষাতেই ব্রতী নন-ইংরাজী, বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্দূ অনেকগুলো ভাষাতেই তাঁর যথেষ্ট দখল রয়েছে এবং এসব ভাষার মাধ্যমে চরম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর মহান চরিত্রে ও আধ্যাত্মিক শক্তির দৌলতে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করেন।

যে ঘটনা তুলে ধরতে যাচ্ছি সেটা তাঁর নিজের তৈরি নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার বিকাশ করতে নয়-জগতের মানুষকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম কৌশল দেখাতেই পুরাতন ঘটনা নতুন করে সবার সম্মুখে এই হেডিং দিয়ে তুলে ধরেছেন ঃ

'ইসলামের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন'

(ফকির আহকার সাজ্জাদ আহম্মদ)

কোন ঘটনার সত্যতার প্রমাণে সবচেয়ে সঠিক বড় মাপকাঠি হচ্ছে বিশ্বাসের সত্যতা মানবের চর্ম চোখে দেখা।

আল্লাহ্-পাক (আহাদ) অদ্বিতীয়, স্রষ্টা এবং তাঁর হাবিব মাহবুব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'আহম্মদ' অর্থাৎ সৃষ্টির অদ্বিতীয়। আর মানবজাতির সৃষ্টির সেরা জাতি এবং উম্মতে মহাম্মদী, সমস্ত উম্মতের সেরা উম্মত। মানব-সৃষ্ট কিন্তু তার আত্মা অমর। যেসব মানব সৃষ্টির সার্থকতার সাথে এন্তেকাল অর্থাৎ রূপান্তর হয়ে পরকাল গমন করেন তাঁদের আত্মা তো সার্থক, অমর এবং তাঁদের দেহও তদ্রূপ। তাই আল্লাহ্-পাক এরশাদ করেন ঃ

'এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।" (সূরা বাকারা আয়াত ১৫৪)

যারা ন্যায়,সত্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মৃত নন বরং শহিদ ও অমর। তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

"যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছেন তাদের মৃত ধারণা করো না, বরং তারা জীবিত। তাঁরা তাদের প্রভুর নিকট হতে রুজী পেতে আছেন। আল্লাহ্-পাক তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করতে আছেন তাতে তারা আনন্দে আত্মহারা।"

(সূরা আল-ইমরান)

পীয়ারে পাঠকবৃন্দ আসুন, সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্-পাক যে হক তাঁর পাক কালাম কোরআন মজিদ, দীন ইসলাম যে হক তাদের মোজেজা যে হক, আউলিয়া কেরাম ও তাঁদের কারামত যে হক আর শয়তান লায়ীন আর তার এস্তেদোরাজ যে বাতিল তার প্রমানে বর্তমান যুগেরই চর্ম চোখে দেখা একটা ঘটনার বিবরণ আপনাদের খেদমতে পরিবেশন করছি।

বাগদাদ হতে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পুরাতন শহর **'সালমান পার্ক'**-এর পুরাতন নাম ছিল **'মাদায়েন'** সেখানে অনেক সাহাবায়ে কেরামকেই শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাল কাটাতে হয়েছিল।

সেখানে এক শান শওকাত পূর্ণ কবর স্থানে দাফন হয়ে আছেন মাশহুর সাহাবী হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)। তাঁর মাজার শরীফের পার্শ্বে আরও দুইজন সাহাবী হযরত হোজায়ফাতুল ইয়ামীনী (রাঃ) ও হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) এর মাজার। তাঁদের দুজনের মাজার ছিল সালমান পার্ক হতে প্রায় সিকি মাইল দূরে এক অনাবাদী স্থানে।

হযরত হুজায়ফাতুল ইয়ামীনী (রঃ) এই বিংশ শতাব্দীর ১৯৩২ ইং সনে তদানীন্তন ইরাকের বাদশা প্রথম ফয়সালকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন-"আমাদের দুইজনের কবরকে দজলা নদী হতে দূরে অন্য স্থানে দাফন করে দেওয়া হোক, কারণ আমার কবরে পানি আসতে আরম্ভ করেছে এবং যাবেরের কবর অত্যধিক স্যাঁৎসেতে হয়ে গেছে।"

পরপর দুই রাতি বাদশা এ স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও যখন কোন ব্যবস্থা করলেন না,-তৃতীয় রাত্রে তিনি ইরাকের মুফতিয়ে আজমকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন যে পরপর দুই রাতি বাদশাকে জানান সত্বেও যখন তিনি কোন ব্যবস্থাই করছেন না তখন মুফতিয়ে আজম হিসাবে তাঁর কর্তব্য যথাশীঘ্র বাদশার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর যে কোন একটা এন্তেজাম করে দেওয়া।

ফলতঃ সকালবেলা মুফতিয়ে আজম প্রধানমন্ত্রী নূরউস সাইদ পাশাকে সাথে নিয়ে বাদশার সাথে সাক্ষাৎপূর্বক আনুপূর্বিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। বাদশা তখন বললেন যে যদি তিনি কবরগুলি খুলবার ফতোয়া দেন তা হলে তিনিও মাজার সরানোর জন্য প্রস্তুত। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুফতিয়ে আজম কবর খুলবার ফতোয়া দিলেন। ফতোয়া এবং শাহী ফরমান এই ঘোষণা নিয়ে সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হলো যে ঈদুল আজাহার দিন জোহরের নামাযের পর হুজুর পাক (দঃ)-এর দুজন সাহাবার কবর খুলে অন্যস্থানে সরানো হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই এই সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে সমগ্র মুসলিম জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং 'রয়টার' এবং অনান্য সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিও এই সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচার করে দিল।

ঘটনাক্রমে সে সময়ে পবিত্র হজ্ব অনুষ্ঠান পালনে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ মক্কায় সমবেত হয়েছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরাও সবাই শাহে ইরাকের নিকট অনুরোধ জানালেন যে মাজার দুটি যেন হজ্বব্রত সুসম্পন্ন হওয়ার কিছু দিন পর খোলা হয়-যাতে তাঁরাও হাজির হবার সুযোগ পান। কারণ এতে তাঁরাও বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। এমনিভাবে হেজাজ, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, তুর্কীস্তান, ইরান, বুলগেরিয়া, আফ্রিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে অসংখ্য তারবার্তায় শরীক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বিলম্ব করণের আবেদন জানানো হলো-শাহ ইরাকের নিকট।

বস্তুত সারা জাহানের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে পুনঃ ফরমানের ঘোষণা হলো যে পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন হওয়ার দশ দিন পর উক্ত মুবারক কার্য সুসম্পন্ন করা হবে। আপরদিকে কবরস্থিত সাহাবাদের তাগিদের কারণে আপাতত এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো যাতে মাজারের ভিতরে পানি আর প্রবেশ করতে না পারে।

ঘোষিত নির্দিষ্ট তারিখে সোমবার দিন বেলা ১২ টার পর লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে মাজার দুটি খুলে ফেলা হলে দেখা গেল যে সত্য সত্যই হযরত হুজাইফাতুল ইয়ামীনী (রাঃ) -এর কবরে কিছুটা পানি ঢুকেছে। আর হযরত যাবের বিন আবদুল্লার (রঃ)-কবর অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে হয়ে গেছে। অথচ দজলা নদী হতে কবর দুটি দু-ফার্লং অর্থাৎ সিকি মাইল দূরে অবস্থিত। যাই হোক, আগত সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, ইরাক সরকারের সম্পূর্ণ সভাষদগণ এবং বাদশা ফয়সালের উপস্থিতিতে প্রথমে হযরত হুজাইদার লাশকে ক্রেনের সাহায্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে ওপরে উঠানো হলো যে –ক্রেনে স্থাপিত স্ট্রেচারে তাঁর লাশ মুবারক আপনা-আপনি উঠে গেল। তারপর ক্রেন থেকে স্ট্রেচার বিচ্ছিন্ন করে শাহ ইরাক ফয়সল, ইরাকের মুফতি আজম, স্বাধীন তুর্কীর জনৈক মন্ত্রী আর মিশর মসনদের ভাবী উত্তরাধিকরী প্রিন্স ফারুক প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাঁধে তুলে নিলেন এবং তাজিমের সাথে তাঁর লাশ একটি কাচের তাঁবুর মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর অনুরূপভাবেই হযরত যাবের (রাঃ) লাশ মুবারকও বের করা হলো।

মুবারক লাশ দুটির কাফন এমনকি দাড়িগুলো পর্যন্ত সদ্য অবিকৃত অবস্থায় ছিল। লাশ দুটি দেখে এটা আদৌ ধারণা করা সম্ভব ছিল না যে তেরশ বছরের পূর্বেকার মৃতদেহ এ দুটি লাশ; বরং ধারণা হচ্ছিল যে,–যেন এদের মৃত্যুর পর দু-তিন ঘণ্টা সময়ও কাটে নি আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল যে তাদের চুলগুলি তখনও খোলা অবস্থায় ছিল। অনেকে চেয়েছিলেন যে তাদের চক্ষুতে নিজেদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেন; কিন্তু তাদের অমর চক্ষুর চমকানো দীপ্তির তেজে কারো দৃষ্টি সেদিকে তিষ্টিতে পারল না। আর কি করেই বা তা পারত! বড় বড় ডাক্তার এ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। জনৈক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্মান চক্ষু তত্ত্ববিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসুকের সাথে তিনি এ সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। মৃত দেহের চক্ষুর এত সজীবতা ও দীপ্তি দেখে এতই আত্মহারা হয়ে পড়লেন যে লাশগুলি সবেমাত্র তাঁবুতে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায়, গিয়ে এসে মুফতিয়ে আজমের হাত ধরে বলে ফেললেন ঃ

"আপনাদের দ্বীন ইসলামের সত্যতা এবং সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্যে এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে! আমি এক্ষুনি মুসলমান হচ্ছি।"

এক প্রসিদ্ধ জার্মানী ফিল্ম কোম্পানী এ বিষয়ে সমাগত দর্শকের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শাহে ইরাকের অনুমতিতে নিজ ব্যয়ে ঠিক মাজারের ওপর দু-শত ফিট লম্বা চারটি ইস্পাতের পোস্টের ওপর ত্রিশ ফিট লম্বা এবং ত্রিশ ফিট প্রস্থ একটি টেলিভিশন স্ক্রীন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

পোস্টের চারদিকে ছাদ সংলগ্ন আরও চারটি স্ক্রীন লাগানো হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক দর্শক নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে বা বসেই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপ দেখতে পেলেন। সেখান হতে নিয়ে গিয়ে লাশ দুটিকে সালমান পার্কের প্রাচীন কবরস্থানে হযরত সালমান ফারেসীর পাশে দাফন করা হলো।

দ্বিতীয় দিনে বাগদাদের সিনেমাগুলিতে এই ঘটনার চিত্র প্রদর্শনী পরিবেশিত হলো। সারা বাগদাদে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। অসংখ্য ইহুদি ও নাসারা এসে স্বেচ্ছায় দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলেন।

পুরাতন যুগের কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এ নয়। এই বিংশ শতাব্দীর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেরই একটি জলন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্ব মানবের সম্মুখে অপূর্ব মহিমা নিয়ে দেখা দিল এবং অপূর্ব আহ্বান জানালো সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীকে সত্য সনাতন ধর্ম ইসলামের দিকে। বড় আপসোস! আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ তবুও এগিয়ে আসছে না; বরং ছুটে চলেছে অন্ধকার হতে আরও অন্ধকারের দিকে। অধুনা বিশ্বের এই হলো সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ সমস্যা।[১]

উপরে বর্ণিত ঘটনা নিয়ে যদি কোন বৈজ্ঞানিক বা শারীর বিদ্যা বিশারদ কোন রিসার্চ করতে চান তাহলে দেখতে পাবেন জাগতিক কোন বস্তুর নিয়ম পদ্ধতির এটা সম্পূর্ণই পরিপন্থি। কোন

টীকা ঃ ১ । প্রমাণ পঞ্জী শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ লেখক দেখিয়েছেন। আদ-দাওয়াত পত্রিকায় প্রাকাশিত।
(১) উর্দ্দ পত্রিকা নেদায়ে মিল্লাত।

নিয়মের মধ্যেই পড়ে না। তবু কেন এ লাশ দুটির দেহের এমন আশ্চর্যজনক অবস্থা। তেরশ বছর পার হয়ে গেল যে দেহের ওপর, সে দেহ অবিকৃত থাকে কি করে? কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীও খাদ্যরূপে এ দেহ পেটে পুরে নি। কাফনের কাপড় তেরশ বছরেও গলে পচে মাটিতে মিশে যায় নি। জলবায়ু, গ্যাস এ দেহের ওপর কোন রাসায়নিক ক্রিয়া করতে পারে নি। লাশের দৃষ্টি শক্তি নিভে যায় নি। বরং চক্ষু থেকে যে জ্যোতি স্ফুরণ হচ্ছিল তা এক্স-রে, গামা-রে, কসমিস-রে এর চেয়েও শক্তিশালী। শুধু তাই নয়। মৃতদেহ তার নিজস্ব গতিতে স্ট্রেচারে স্থান লাভ করলেন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের চক্ষুকে স্থির করে দিলেন। এমন ঘটনা শুনে বা দেখে কেউ কি বলবেন, 'মানুষ মরে যায়'? চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এ নিদর্শনে প্রচুর খোরাক রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য প্রচুর খোরাক রয়েছে।" (৩ : ১৩)

"চক্ষুষ্মানদের জন্য অভিজ্ঞতা রহিয়াছে"–আল্লাহ্র এ মহবাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষ এ রহস্যজালে বেষ্টিত হলেও এর স্বরূপ বুঝতে অক্ষম। বুঝবে শুধু তাঁরাই যাঁদেরকে আল্লাহ্-পাক নিজ হাতে জ্ঞানদান করেছেন তাঁর মহারহস্যের দ্বারা উন্মোচন করতে এই বলে ঃ

"ইউতিল হেকমাতা মাইয়া-শা'ও ওয়া মাইউতাল হেকমাতা ফাকাদ উতিয়া খাইরান কাছিরান।"[২] (কোরআন)

অর্থাৎ ঃ

"আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞানদান করেন, এবং যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় সে অশেষ কল্যাণের অধিকারী হয়।"

আসুন, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ওপর একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। মহাসাগরের তলদেশে নয়–মহাকালের মহাশূন্যে নয়–অতি ক্ষুদ্রতম একটি কবররূপ গুহায় ঢুকে পড়ি–যে গুহায় আমরা অতি স্বচ্ছনেদ ও নিরাপদে স্থান লাভ করেছিলাম একটি পরমাণু আকারে। এ পরমাণু হতে একটি অণু। অণু হতে এক বিন্দু রক্ত কণিকা, সেখান থেকে মাংসপিণ্ড। তারপর অস্থি-মজ্জা। এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু। এই যে একটি জগতে ছিলাম যে জগত ছিল তরুলতা, ফল-মূল, জল-বায়ু, খাদ্য-শস্য বিবর্জিত। অথচ এগুলোই প্রাণীর খাদ্য জোগায়। এসব বস্তু ব্যতিরেকে কে কোন্ অলক্ষ্য হতে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে খাদ্য সরবরাহ করেছে এবং নির্জীব বস্তুকে সজীব প্রাণীরূপে রূপান্তরিত করে দৃশ্য জগতে বহিষ্কার করেছে? চিন্তা করেছেন কি?

যে মহান সৃষ্টিকর্তা জরায়ু অভ্যন্তরে অতি সংগোপনে বিশুদ্ধ খাদ্য দিয়ে বর্ধিত করতে পারেন, প্রাণের সংযোগ করে নির্জীব বস্তুকে শক্তিশালী, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান করে অন্য জগতে প্রেরণ করতে পারেন–তিনিই কি কবরের মাঝে মুমেন ও শহিদদের খাদ্য জোগাতে পারেন না? যিনি মায়ের গর্ভে অন্ধার প্রকোষ্ঠে জীবিত রাখতে পারেন তিনিই কি কবরের মাঝে জীবিত রাখতে পারেন না?

(২) কোরআন প্রচার–১৭ বর্ষ ১০ম সংখ্যা শ্রাবণ/১৩৭২

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা এ যাবৎ যে আলোচনা করলাম এর মূলে রয়েছে একটি প্রধান বস্তু। এর ওপরই সব খেলা। এর উপস্থিতিতে বস্তু হয় সজীব আর অনুপস্থিতিতে হয় নির্জীব। এ বস্তুটির বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই, স্থিতিকাল নেই, ধ্বংস নেই, এ বস্তুটিকে আমরা বলি 'আত্মা'। সে 'আত্মা'–মৃতদেহে আবার ফিরে আসে তাঁরই আদেশে যাঁর আদেশে পার্থিব জড়-দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়, যার আদেশে মায়ের পেটে শিশুর দেহ ঠাঁই পায়। আত্মা ফিরে আসার ফলেই মৃতদেহ সব কিছু বুঝতে পারে, এর ওপর কঠিন শাস্তি হয়। অথবা উৎফুল্ল ও প্রশান্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র জেকের করে, কোরআন পাঠ করে, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে *A। মৃত দেহে আত্মা ফিরে না আসলে এসব ঘটনা ঘটত না। চলুন মৃত দেহের এ আত্মার কি অবস্থা তা রসুল (দঃ) -এর বাণী হতে দেখে নেই।

আত্মার শান্তি ও অশান্তি

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পাপী-তাপী, ওলি-গাউস, নবী-পয়গম্বর, জ্ঞানী-মূর্খ চোর-ডাকাত, বাদশা-ফকির, ধনী-দরিদ্র, দাতা-কৃপণ,শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাই বিছানা নেয় ঐ কবরের কোলে। যেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। একই সমাজ, একই স্থান। এখানে ধনের প্রভাব খাটে না। মানের বড়াই স্থান পায় না। কৌলিন্যের বাহাদুরী টেকে না। রূপের আলো ঝলমল করে না। সৌন্দর্যের গর্বে বুক আলোড়িত হয় না। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই যে-দুনিয়ায় যারা বিনীত ছিল, নম্র ভদ্র ছিল, মহান দাতা ছিল, প্রেমিক ছিল, পরোপকারী ছিল, আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত ছিল, কবরের শাস্তির কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেছিল, সুধীজনের সম্মান দিয়েছিল, দেশ ও জাতির জন্য অকাতরে জীবন দান করেছিল, পরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে এগিয়ে এসেছিল, পিতা-মাতার সেবায় রত ছিল, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিল, আল্লাহ-রসুলের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে দেহ-মন সঁপে দিয়েছিল, তাঁরাই ধন্য। কবরে তাদের আত্মা চরম সুখী। পায় তারা পরম শান্তি। ছোট শিশু যেমন মায়ের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে–এ মুমেন বান্দারাও তেমনি চির সুখের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে। আর যেসব মানুষ দুনিয়ার বুকে এর বিপরীত করে পরের ধন গুটিয়ে নেয়, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে না, অসহায়দের নির্যাতন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ধনের গৌরবে এ মাটির ওপর আস্ফালন করে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কটূক্তি করে, রূপের বাহার দেখিয়ে অহঙ্কার করে, নামায-রোজাকে বাতুলতা মনে করে, জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের উপহাস করে, কবরের কথা, হিসাব দিবসের কথা, মৃত্যুর যন্ত্রণাকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর বাণীকে অবজ্ঞার ছলে উড়িয়ে দেয় তাদের আত্মার ওপর হয় শাস্তি। ভোগ করে চরম অশান্তি। কবর তাদের জন্য যন্ত্রণা, দুঃখ ও কষ্টের বিছানা।

টীকা - *A পূর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে।

পাপীদের আত্মা কিভাবে নিস্তার পায়

পাপীদের আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবার পর ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে কিন্তু আকাশের দ্বারা বন্ধ থাকায় আবার তা ফিরে আসে মৃত দেহে একথা আমি পূর্বে লিখেছি। দেহে আত্মা পুনরায় প্রবেশ করার পর ফেরেস্তারা প্রশ্ন করতে থাকে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে চরমভাবে আঘাত করতে থাকে। এ থেকে নিস্তার পাবার কোন পন্থা কবরে নেই। তার ইচ্ছে হয় আবার এ দুনিয়ায় ফিরে এসে সৎকাজ করে। কিন্তু এ ইচ্ছে তার পূরণ হয় না।

মৃত ব্যক্তির এ অশান্ত আত্মাকে শান্তি দেবার একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যদি তার আপনজন দান-খয়রাত করে। এতিম দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করে ক্ষুধার্তের আহার্য দিয়ে তৃপ্তি দান করে। নিয়মিত কবর জিয়ারত করে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য মুক্তি চায়, শিক্ষার্থীদের জন্য কোরআন-হাদিস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বমূলক বই পুস্তক বিতরণ করে মানব কল্যাণে এগিয়ে আসে। মসজিদ পাঠাগার বিদ্যালয় স্থাপন করে ঐ মৃত ব্যক্তির নামে সঁপে দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। কেননা রসুল (দঃ)-এর বাণীসমূহ এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন ঃ

"মৃত ব্যক্তির কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখন কোন মানুষ কবর স্থানে যায় এবং সালাম ও দোয়া করে তখন মৃত ব্যক্তি সব কিছুই অনুভব করতে পারে এবং খুশি হয়ে জিয়ারতকারীকে সালাম মুবারকবাদ জানায়।"[১]

কবরবাসী যে আমাদের সালাম, সম্ভাষণ, নিয়াত এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা বুঝতে পারে ও শান্তি পায় এর একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দিচ্ছি। হাশেম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ–

"একদা আমার পিতার সাথে মদিনা শরীফের কবর স্থানে গেলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমার পিতা এভাবে সালাম দিলেন ঃ 'আচ্ছালামো আলায়কুম বিমা সবারতুম ফা-নিয়মা ওয়াকবাদ-দার।'

তখন কবর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল–

"ওয়া আলায়কুমুচ্ছালামো ইয়া আবা আবদুল্লাহ'।

কবর হইতে প্রত্যুত্তর শুনিয়া পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

'তুমি সালামের কি জবাব দিয়েছ?' আমি বলিলাম –'না'।

অতঃপর পিতা আমাকে ডানদিকে দাঁড় করাইয়া আরও দুইবার কবরবাসীদের জিয়ারতের সালাম জানাইলেন। আর প্রত্যেকবারই জবাব পাওয়া গেল।[২]

উপরে বর্ণিত তত্ত্বটি হাদিসের মত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এ ঘটনাকে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা অবাস্তব বলতে পারেন না। এটাকে প্রমাণ করতে হলে নিজকে ডুবিয়ে রাখতে হবে আধ্যাত্মিক সাধনায়। যারা এ সাধনা করেন তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে কবরবাসীর অবস্থা দেখতে পান তাদের সঙ্গে কথার আদান-প্রদানও করতে পারেন। শুধু মুসলমানই না অন্য জাতির মহান সাধক ও নবীরাও এ তত্ত্ব জানেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত। মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় কবর হতে তুলে আনা।

কবরবাসী যে মৃত নয়–তার আত্মা যে গতিশীল, ধাবমান ও সুখ-দুঃখ বুঝতে সক্ষম এটার প্রমাণ মেলে রসুল (দঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেছেন ঃ–

১ টীকা ঃ১ –২। হাদিস। সংগৃহীত–'মরণের পরে'। কৃত–পূর্বে বর্ণিত। পৃঃ নং ৫৮-৮৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"মৃত ব্যক্তির আত্মা একমাসকাল তার ঘরবাড়ি ঘুরে দেখে যে তার পরিবার-পরিজন কিভাবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতেছে। একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর এক বৎসর পর্যন্ত কবরের মাঝে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে কে তাহার জন্য দোয়া করিতেছে।"[১]

মৃত ব্যক্তি যে আমাদের দোয়াপ্রার্থী –আমাদের প্রার্থনায় ও দানে যে তার আত্মার শান্তি হয় এ কথাই পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিস প্রমাণ করে। এ বাণীর আরও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি বলেছেন ঃ

"ঈদের দিন অথবা আশুরার দিন অথবা জুমার রাতে, অথবা রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে, অথবা সাবান মাসের পঞ্চদশ দিবসে মৃত ব্যক্তির আত্মা কবর হইতে বাহির হইয়া স্বীয় পরিবার-পরিজনের দ্বারে আসিয়া বলে–হে আমার আপনজন! এই পবিত্র দিনে দান-খয়রাত করিয়া আমার উপকার কর। যদি দান-খয়রাত করার সামর্থ না থাকে তবে দুই রাকাত নামায পড়িয়া আমার জন্য দোয়া কর।"

অতঃপর আত্মা বিলাপ করিয়া বলে–হায় আমাদের জন্য কি কেহ দোয়া করার নাই। হে আমার গৃহের অধিবাসী! হে আমার পুত্র-কন্যাগণ! হে আমার বিষয়-সম্পতির অধিকারীগণ! আজ আমি কবরে আবদ্ধ। তোমাদের মধ্যে আমার অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা এবং ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করার মত কেহই কি নাই? আমাদের আমল চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমাদের পথ আজও খোলা রহিয়াছে। তোমরা দান-খয়রাত কর। মৃতব্যক্তি যদি কোন প্রকার দান-খয়রাত বা পুণ্য লাভ করিতে পারে তবে আনন্দের সাথে অন্যথায় বিমর্ষ অবস্থায় কবরে ফিরিয়া যায়।"[২]

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অপর একটি বাণীতে বলা হয়েছে ঃ

(হযরত আবু হোরাইরা হতে বর্ণিত)

"তোমরা পূর্ব মৃতদের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করিও। আমি আরজ করিলাম –ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) কি উপঢৌকন পাঠাইব?

নবী (দঃ) বলিলেন–'হে আবু হোরাইরা (রাঃ) জানিয়া রাখ তোমাদের পূর্ব মুমেনগণের রূহ (মৃতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের) প্রত্যেকের নিজ নিজ ঘরের দরজায় শুক্রবার দিন আগমন করে। এই অবস্থায় রূহ ফরিয়াদ করিয়া আবেদন জানায়–'হে আমার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ, হে আমার আদরের সন্তান-সন্ততি, আমার বংশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ তোমরা এই দুর্দশাগ্রস্তকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট কর। তোমরা যে সম্পত্তির ওপর বসবাস কর এগুলি সবই আমার আয়ত্বে ছিল এবং সব কিছুকেই আমার বলে ধারণা করেছি। আজ আমি তোমাদের দরজায় একটুখানি পুণ্যের আশায় ফকিরের ন্যায় কাঁদিতেছি। যদি দুনিয়ায় থাকিতে এই অন্ধকারময় এই নির্জনবাস ঘরের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নামায, রোজা করিতাম, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্তকে বিভিন্ন রকমের সহানুভূতি ও সাহায্য করিতাম তাহলে নিশ্চয়ই এই কঠিন বিপদের দিনে সুখে বসবাস করিতাম। এখন আর তোমাদের দরজায় ভিখারির মত আসিতাম না। তোমরা অবশ্যই সময় থাকিতে গরীব-দুঃখীকে দান-খয়রাত কর আর নামায ও দোয়া-দরুদ পড়িয়া আমাদের রূহের ওপর বকশিয়া দাও। হে দুনিয়ার মানুষ মনে রাখিও তোমাদের নেক আমলের ছওয়াব আমাদের জন্য বকশিয়া দিলে তোমাদের ছওয়াব কমিবে না বরং পুরাপুরিই পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

টীকা ঃ ১ –২। হাদিস। সংগৃহীত–দাকায়েকুল আখবার।
কৃত–ইমাম গাজ্জালী। পৃঃ নং ৫৪।

পুনরায় তিনি বলিলেন–"অবশ্যই তোমরা যার যা সম্ভব সাধ্যানুসারে অন্তত দুই রাকাত নফল নামাজ হইলে আর একটি রুটি হইলেও দীনদরিদ্রকে দিয়া তোমাদের নিজ নিজ পূর্বপুরুষ মোমেনদের রূহের মাগফিরাত চাও (মুক্তি)। এই দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনা করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজে ক্রন্দন করিলেন এবং আমরাও ক্রন্দন করিলাম।"[১]

এ বিষয়ের ওপর আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের গভীর তত্ত্ব হতে আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে কবরে মানুষ মরে না। তারা সেখানে শান্তি ও অশান্তি অনুভব করে। পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে ইচ্ছামত মানুষ যা কিছু ভাল মন্দ করতে পারে কিন্তু কবরে সে ইচ্ছার মৃত্যু হয়। এজন্যই বলা হয়েছে আল্লাহর বাণীতে–'কুল্লু নাফছুন জায়েকাতুল মাউত'। অর্থাৎ :-জীবমাত্র প্রত্যেকের প্রবৃত্তিই মৃতপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষমতাহীন। আর এ কথাই ব্যক্ত করেছে মৃত কবরবাসী।

শুধু তাই নয়, মৃতব্যক্তি দুঃখ করে বলছে–'যদি এসব কাজ করতাম (নামায-রোজা-দান-সহানভূতি ইত্যাদি) তাহলে নিশ্চয়ই এই কঠিন বিপদের দিনে সুখে বসবাস করতাম'–এটা জীবিত ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও সতর্কতার বাণী।

এছাড়া জীবিতদের মৃত্যুর পর সুখে বসবাস করার জন্য পথ নির্দেশ করেছেন যেন কবরে তাদের অশান্তি না ঘটে।

কি আশ্চর্য! মৃতব্যক্তি শিক্ষক হয়ে জীবিত ব্যক্তিদের শিক্ষা দিচ্ছেন–অদৃশ্য, অপার্থিব জগতে শান্তির নীড় রচনা করার অপূর্ব কৌশল।

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তাপস, শিক্ষাবিদ পণ্ডিত, সৃজনশীল প্রতিভাধর হযরত মৌলানা রুহুল আমিন (রাঃ) কবরবাসীদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার ফলেই ঠিক অনুরূপ বাণী দিয়েই আমাদের ভুল ধারণার অবসান করেছেন এই বলে ঃ-

"জীবিত পীরদের থেকে যেমন রূহানী ফায়দা পাওয়া যায় অনুরূপ অধিকতর ফায়দা মৃত ওলী-আল্লাহদের থেকেও পাওয়া যায়।"[১]

চলুন আমরা জীবিত ব্যক্তিরা কবরের পাশে গিয়ে অশ্রুসজল নয়নে দু হাত তুলে আল্লাহর নিকট দোয়া করি এই বলে ঃ-

"হে কবরবাসীগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। তোমাদের কার্যাবলী শেষ হয়েছে। আমাদেরও শীঘ্রই শেষ হবে। তোমাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারছি না। শুধু মুনাজাত করছি——যেন আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি মুছিয়ে দেন। বিচার দিবসের পূর্ব পর্যন্ত যেন শান্তিতে ঘুমাও।"

"হে আল্লাহ! তুমি এ মহাবিশ্বের মালিক ও পাপ-পুণ্যের বিচারক; জীবন ও মৃত্যু দানকারী; আমাদের দেহ-মন ও আত্মা দিয়ে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি। আমরা চরম পাপী ও নির্বোধ। তুতি শাস্তি দেবার মালিক। তুমি আবার একমাত্র ক্ষমাকারী। তোমার দয়ার শেষ নাই। এ দয়ার গুণে তুমি জীবিত-মৃত, পাপী–তাপী, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, নারী-পুরুষ সবাইকে ক্ষমা কর। কবরের কঠিন আজাব-রোজ, হাশরের মহাপরিক্ষা, দোজখের ভীষণ শাস্তি হতে আমাদের তুমি মুক্ত করো। আমাদের প্রার্থনা কবুল কর। আমাদের সালাম নবী (দঃ) ও অন্যান্য পয়গম্ব, ওলি-গাউস সবার ওপর পৌছিয়ে দাও। (আমিন)।" [লেখক]

১। হাদিস সংগৃহীত–'মরণের পরে'। কৃত–পূর্বে বর্ণিত পুস্তক হতে :
টীকা ঃ ১। সংগৃহীত –আয়েশা স্মৃতি। কৃত আজিবুল হক, এম. এ. বি. এড, লালবাজার, বাঁকুড়া, পশ্চিম বাংলা। যিনি 'চিরহরিৎ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শহিদরা মরে না । কবরে খাদ্য পায় ।

এবারে আমরা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়ের ওপর হাত বাড়াতে চললাম । এর ওপর আলোচনা সহজ নয় । বিজ্ঞানের প্রমাণ নেই । যুক্তিতর্কেরও স্থান নেই । তবু লিখতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে শহিদ ব্যক্তিরা মরে না, কবরে তাঁরা নিয়মিত খাদ্য পায় ।

কোন খামখেয়ালী চিন্তার বশবর্তী হয়ে আমি কোন সময় কলম ধরি নি । একটি মহাসূত্রকে কেন্দ্র করেই চিন্তায় পড়েছি । আর সে চিন্তা বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে–বাস্তব দৃষ্টির নিরীক্ষণে যখন সত্য বলে উপলব্ধি করেছি তখনই তা আমার সামান্য লেখনীর মাধ্যমে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি । এখানেও আলোচনা করবার পূর্বে সেই মহাসূত্রটি তুলে ধরছি । পাঠকবৃন্দ খুব গভীর চিন্তায় এ সূত্রটি বিচার করবেন ।

"ওয়ালা তাকুলু লেমাইয়ুকতালু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াতুন বাল্ আহ্‌ইয়াউন । ওয়া লাকেন্ লা তাশ্‌উরুন ।" (২ ঃ ১৫৪)

অর্থাৎ ঃ

"এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিও না; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা তাহা অবগত নহ ।"

এটা মহান সৃষ্টিকর্তার অপরূপ নিদর্শনের একটি বাণী যে বাণীতে রয়েছে গভীর তত্ত্ব, সুসংবাদ ও জটিল প্রশ্নের সমাধান । আর সমাধান মেলে চারটি মাত্র শব্দে ঃ (১) ফি (২) সাবিলিল্লাহ (৩) বাল্ (৪) আহ্‌য়ি-য়াউন :

ফি সাবিলিল্লাহে-এর অর্থ-আল্লাহর পথে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে । অর্থাৎ যে সব মহান ব্যক্তি ন্যায়, সততা, ধৈর্য, বিশ্বাস, দান, পবিত্রতা, শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞান আহরণে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন অথবা ধর্ম, জাতি ও দশের কল্যাণে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ।

বাল্-আহয়ি-য়াউন–অর্থাৎ ঃ বরং তাহারা জীবিত ।

উপরে বর্ণিত আল্লাহ ও রসুল (দঃ) প্রেমিকদের সুসংবাদ স্বরূপ এ শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে । 'তাহারা জীবিত'-এর পূর্বে 'বরং' শব্দ দিয়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়েছেন এবং অবশ্যম্ভাবী সত্যতারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন ।

এতদিন আমরা কোরআনের বাণীকে আধ্যাত্মিক ও দৃষ্টান্তের অর্থে ফেলে শাব্দিক অর্থ হতে দূরে রেখেছি । কিন্তু শাব্দিক অর্থের সঙ্গে যে রূপক ও আধ্যাত্মিক ও মহাসত্যের যোগসূত্র রয়েছে তা চিন্তা করবার অবকাশ পাই নি । এজন্যই জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী, আলেম-ওলামা, ফকির-দরবেশ–শহিদদের 'অমর' আখ্যায়িত করেছি । আর এ 'অমরের' অর্থে বুঝেছি নামে ও গুণে মরে না । অর্থাৎ মানুষ যাদের চিরস্মরণীয় করে রাখে ইতিহাসে, বই-পুস্তকে ও আলোচনায় । আজ দেখছি 'অমর' অর্থ রূপক নয়–দৃষ্টান্তমূলক নয়–সত্য অর্থেই 'যে মরে নাই' । কেননা আল্লাহর ভাষাতেই ভুল চিন্তাধারার অবসান করা হয়েছে এবং 'জীবিত' অর্থকে জোরদার ও সত্য বলে প্রমাণত করা হয়েছে ।

'শহিদগণ জীবিত'–এ অর্থ সত্য বলে মেনে নিতে গিয়ে অনেককেই আবার ধাঁধাঁয় পড়তে হয় । ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় । যেমন–জীবিত ব্যক্তি বা প্রাণীর খাদ্য প্রয়োজন । খাদ্য ছাড়া কিভাবে জীবন ধারণ করে? কবরের মাঝে কে খাদ্য দেবে? এ প্রশ্নের সমাধান আমাদের হাতে নেই । কেউ আজ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি । পাবার কথাও নয় । কেননা এ রহস্যের সৃষ্টিকারী নিজেই বলেছেন–'ওয়া লাকেন-লা-তাশ্ উরুন অর্থাৎ 'তোমরা তা অবগত নও' ।

উপর্যুক্ত মহাবাণী ধরে চলুন আমরা একটু চিন্তা করি ও দেখি দৃশ্য জগতে এ বাণীর

সত্যতা মেলে কিনা । মায়ের পেটে সুদীর্ঘ ১০ মাস আমরা ছিলাম । এটা ছিল কবরসম অন্ধকার । গভীর অন্ধকার । আলো-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, খাদ্য-পানীয়, সাগর-নদী, হাট-বাজার, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, চাকর-চাকরাণী, সেবক-সেবিকা বলে কেউ ছিল না । সেখানে কি খাদ্য মেলে নি? কে দিয়েছে? এ কবরের মাঝে কে প্রাণের সংযোগ ঘটিয়েছে? কে মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বুকে জড়িয়ে রেখেছে? কোন্ সেবক-সেবিকা রাত-দিন ধরে আমাদের সেবায় রত ছিল? এ কবর আর শহিদদের কবরের মাঝে কোন পার্থক্য দেখেছেন? এ কবরে যদি দেহ না পচে তবে শহিদদের দেহ পচবে কেন?

এ কবরে যদি সুষম খাদ্য মেলে তবে মাটির কবরে মিলবে না কেন? একই সৃষ্টিকর্তারই তো লীলা-খেলা । তাঁরই তো মহাবৈজ্ঞানিক কৌশল । এ কৌশল আমরা জানি না । বুঝতেও অক্ষম । তবুও কি সত্য নয়? বাস্তব নয়? এ কৌশল কি দেখছি না? স্বীকার করছি না? যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না তারাও বলতে বাধ্য মায়ের পেটে যে কবর–সেখানে এই মানবশিশুই জন্মলাভ করে, বেঁচে থাকে–প্রাণ পায়–খাদ্য পায় । এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় । মায়ের পেট থেকে বের হবার পরই শিশু চিৎকার শুরু করে । এ চিৎকার শুধু গরিবের ছেলেরই নয়–রাজা-মহারাজা, ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিদের নবজাত শিশুর একই সুরে কান্না । কারণ কি? বলতে হয়–যে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে শিশু বের হলো সে প্রকোষ্ঠ থেক এ পৃথিবী সুন্দর নয় । এর আবহাওয়া ঐ শিশুর জন্য হঠাৎ করে সহনীয় নয় । অসহ্যের জ্বালাতেই হয়ত ঐ ব্যথার কান্না ভেসে ওঠে ।

শিঙ্গায় ফুৎকার করার পর কবর থেকে সমস্ত মনব সন্তান উত্থিত হবে । শহিদ, মোমেন এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা কবর মায়ের পেটের মতই সুখে ঘুমিয়ে থাকে নরম বেহেস্তের বিছানায় । ঘুম হতে ওঠে অথবা ঘুমের ঘোরেই মেলে তাদের খাদ্য । এজন্যই শিঙ্গার ফুৎকার শুনে অস্থির হয়ে যায় । বলে ওঠে–কে তাদে ঘুম ভাঙ্গালো? সূরা ইয়াসিনের একটি বাক্য সাক্ষ্য দেয় ।

বাক্যটি নিম্নরূপ ঃ

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে–তখন স্ব-স্ব সমাধি হতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে প্রধাবিত হইবে । তাহারা বলিবে–হায় আমারেদ জন্য পরিতাপ! কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার হইতে উত্তোলিত করিয়াছে?" (৩৬ ঃ ৫১)

উপরে উদ্ধৃত মহাবাণী হতে বুঝা যায় কবরে তারা সুখে ও শান্তিতে থাকে । সুখ ও শান্তি যদি জীবনের সাথে জড়িত থাকে–তবে সে জীবন তো মৃত নয় । প্রাণের অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজমান ।

যে দুটি কঠিন প্রশ্ন আমাদের চিন্তাধারায় তালগোল পাকিয়েছিল চলুন দেখি কোরআন থেকে এর সমাধান পাই কিনা? প্রথম প্রশ্ন ঃ কে তাদের খাদ্য সরবরাহ করে?

কোরআন বলে, "ওয়া লা তাহসাবান্নাল্লাজিনা কুতেলু ফি সাবিলিল্লাহে আমওয়াতান । বাল্ আহ্‌য়ি-য়াউন । এনদা রাব্বিহিম ইউরজাকুম ।"[১] [৩ ঃ ১৬৯]

অর্থাৎ ঃ "যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না । বরং তাহারা জীবিত । তাহাদের প্রতিপালক হইতে তাহারা খাদ্য পায় ।"

উপরে বর্ণিত মহাবাণী হতে আমরা প্রশ্নের জবাব পেলাম । (১) আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিরা মৃত নয়–জীবিত । শিশু যেমন অলৌকিকভাবে পেটে খাদ্য পায় তদরূপ শহিদগণ খাদ্য পায় কবরে ।

টীকা ঃ ১ । কোরআন । সূরা আল-ইমরান । আয়াত ১৬৯ ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) এ খাদ্য তাহাদের প্রতিপালক হইতে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিজেই দান করেন।

উপরে উল্লিখিত আল্লাহ ও রসুল (দঃ)-এর বাণী হতে আমরা নিশ্চিত হলাম যে **'মানুষ মরে না'**। আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিরা সসম্মানে কবরে অবস্থান করে। তাদের শরীর পচে না। নিয়মিত খাদ্য পায়। কবরের মাঝেই আল্লাহর আরাধনা করে। জীবিতদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়। জীবিতদের নিকট হতেও অনুরূপ দোয়া তাদের জন্য কামনা করে।

অবিশ্বাসী ভাইয়েরা চলুন চোখ খুলুন। বাস্তব দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টি মহিমা লক্ষ্য করুন। আপনাকেও যেতে হবে ঐ কবরে, সাগরে অথবা ঐ অগ্নি ভষ্মীভূত ভষ্মের স্তুপে। রেহাই পাবেন না। সাহায্যকারী মিলবে না। পালাবার জায়গা পাবেন না।

বিশ্বাসী ভাইয়েরা আসুন আমরা প্রার্থনা করি–"হে আল্লাহ্! আমরা যেন তোমার পথেই জীবন দান করতে পারি। তোমার প্রিয়, শহিদ, মোমেন, হাজী, গাজী ও দানকারীদের সঙ্গে একত্রে কবরে বাস করতে পারি। চির শান্তির বেহেশতে পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ চিত্তে তোমার প্রশংসা করতে পারি।" আমিন–(লেখক)

উত্থান দিবস

(১) "সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করা হইবে। তৎপর তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে।"[১] (৭৮ ঃ ১৮)

(২) "তাহারা বলিতেছে–আমরা কি সত্যই পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইব? যখন আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব?"[২] (৭৯ ঃ ১০-১১)

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে কবরবাসীর অবস্থা বর্ণনা করেছি। সেখানে এ কথাই বুঝিয়েছি যে 'মানুষ মরে না'–এক জগত থেকে অন্য জগতে প্রস্থান করে মাত্র। অর্থাৎ অস্থায়ী জগৎ হতে স্থায়ী জগতে পাড়ি জমায়। অবশ্য কবরকে স্থায়ী জগত বলা ঠিক না। একে 'বরজক' বা মধ্য জগৎ বলা হয়। সেখান থেকে আবার সৃষ্টিকর্তার আদেশে উত্থিত হতে হবে বিচারের জন্য। বিচার শেষে চিরস্থায়ী জগতে পদার্পণ করতে হবে। দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ কোটি কোটি বছর যেহেতু কবরে অবস্থান করতে হবে সেহেতুই স্থায়ী জগৎ বললাম।

উপরে বর্ণিত আল্লাহর বাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাঁর নির্দেশে শিঙ্গা ফুৎকার করা হবে। এ ফুৎকারের পরই কবরে অবস্থিত ৩য় ফুৎকারের পর মানব-দানব সবাই সচেতন হবে এবং কবর হতে উঠে পড়বে। শুধু মানব-দানবই নয় জীবজন্তু মাত্রই পূর্ণ আকৃতিতে পুনর্জীবন লাভ করবে।

ধুলিতে-বালিতে মিশে যাওয়া মানুষ জীবজন্তু কিভাবে কোটি কোটি বছর পরে আবার পুনরুত্থিত হবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা সম্ভব কিনা তা আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি আমার রচিত **'বিজ্ঞান না কোরআন?'** –পুস্তকে। স্বজাতি-বিজাতি চিন্তাশীল মনীষীরা আমার সে বক্তব্যকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আর না হয়ে উপায় কি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মহাজ্ঞানীরা বাস্তব প্রমাণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছেন যে অতি ক্ষুদ্রতম একটি বীজকণা হতে প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষ মাথা উঁচু করে উঠছে। শাখা-প্রশাখা মেলছে। ফলদান করছে। ঐ ফল পশু-পক্ষী খাচ্ছে।

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা নবা। আয়াত–১৮।
২ । ঐ " নাজেয়াত। : – ১০–১১।

বাকি থাকছে শুধু ফলের আঁটি। ঐ আঁটি মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। জল-বায়ু, সূর্যতাপ,মাটির জৈব পদার্থ কেউ এ আঁটিকে নিঃশেষ করতে পারে না। এর ভিতর থেকেই গজে ওঠে অঙ্কুর। মাটিকে ভেদ করে আবার আত্মপ্রকাশ করে পত্র, শাখা ও প্রশাখায়। আর ঠিক সময়মত ফিরে আসে সেই ফল যার রূপ, গুণ ও আকৃতিতে থাকে না কোন প্রভেদ পূর্বে পরিত্যক্ত বা ভক্ষিত ফলটির সঙ্গে। অতি ক্ষুদ্রতম সরিষার কণাটিও মাটির চাপে, জলের আর্দ্রতায়, কীটের দংশনে প্রাণ হারায় না। গজিয়ে ওঠে তার মাথা। সরিষা বীজে ভরিয়ে তোলে তার দেহ। ভাবুকরা, চিন্তাবিদরা কি এ অপরূপ কৌশল দেখে জ্ঞানলাভ করছেন না? শুধু সরিষাই নয় সারা পৃথিবীর তরুলতা, ফলমূল ইত্যাদির বেলাতেই এ ঘটনা সত্য।

নিজের জন্মবৃত্তান্ত চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের সমাধান মেলে। খাদ্যের সারাংশ হতে রক্তের সৃষ্টি হয়। রক্তের নির্যাস থেকে তৈরি হয় বীর্য যার মধ্যে থাকে কোটি কোটি বীর্যকীট। এ বীর্যকীট দিয়েই মায়ের পেটে আস্তে আস্তে গড়ে উঠে মানবশিশু। এ মানবশিশু প্রাণবন্ত হয়েই বেরিয়ে আসে মায়ের পেট থেকে। কে অলক্ষ্যে থেকে খাদ্য জোগায়? কে ভিটামিন যোগে বর্ধিত করে তোলে পূর্ণাঙ্গ শিশু অন্ধকারের ঐ জরায়ুতে? অজৈব পদার্থকে জৈব–জৈবকে প্রাণ দিয়ে মাটি যেমন জীবনের সৃষ্টি করে এক মহাশক্তির ইচ্ছায় তেমনিভাবে সৃষ্ট হয় মানব তথা বিশ্বের যত জীবকুল। তাইতো দেখি ভাঙ্গা-গড়া, মরণ ও জীবন। এরা পাশাপাশি থাকে। সময় ও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। এর ব্যতিক্রম কেউ কি দেখেছে? সাগরের জল বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প থেকে গাঢ় মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ থেকে ঝরে পড়ে সেই জল–যে জল বিদায় নিয়েছিল সাগরের বুক থেকে। মৃত হতে জীবন–জীবন হতে মৃত এটা যেমন বাস্তব তেমনি সত্য। এ সত্যে কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, ভুল নেই। এ জন্যই চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ মহাসত্যের ধারক বলেছেন ঃ

(১) 'ইউখরেজোল হাইয়া মিনাল মাইয়েতে ওয়া ইউখরেজোল মাইয়েত। মিনাল হাইয়ে ওয়া ইউহিল আব্দা বায়দা মাউতিহা ওয়া কাজালিকা তুখরাজুন।"[১] (৩০ ঃ ১৯)

অর্থাৎ, "তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বহির্গত করেন এবং জীবিত হইতে মৃত নির্গত করেন এবং পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন এবং এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে।"

চলুন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র এরূপ চ্যালেঞ্জের আরও কয়েকটি বাণী দেখি। (২) "নিশ্চয় তিনি উত্থান দিবসে তোমাদিগকে একত্রিত করিবেন। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"[২] (৬ ঃ১২)

(৩) "উহা এই হেতু যে নিশ্চয় আল্লাহ্ই সত্য এবং যেহেতু তিনিই মৃত্যুকে সঞ্জীবিত করিবেন এবং যেহেতু তিনিই সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।"[৩] (২২ ঃ ৪-৭)

(৪) "এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদের ন্যায় সমুন্নত করিয়াছেন। অনন্তর তোমাদিগকে তন্মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করিবেন এবং পুনরায় বহির্গমনে বহির্গত করিয়া দিবেন।"[৪] (৭১ ঃ ১৭-১৮)

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা রুম। আয়াত–১৯৯ পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লেখিত টীকাটি)
২ । ঐ । " আনআম। " – ১২ এর অংশ।
৩ । ঐ। " হজ্ব। : ৪০৭।
৪ । ঐ। " নূহ। : ১৭-১৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরূপ অসংখ্য বাণী আমরা কোরআনে দেখতে পাই। এ মহাবাণী অন্য কারো নয় যিনি এ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন তাঁরই। শুধু কোরআনেই নয় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও একই প্রকার বাণী দেখতে পাই। এসব বাণী পাবার পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে কি আর কোন সন্দেহ আছে? বিশ্বাসী, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষীদের থাকবার কথা নয়। তবু যদি কোন বৈজ্ঞানিকের এ ধারণা জন্মে যে ফলের বীজের মত মানুষের কোন বীজ থাকে না। সব কিছুই মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিরূপে সে বীজকণার মত মাথা গজাবে?

এবারে আসুন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মহান তত্ত্ববিদ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী দেখি। আল্লাহ্‌র মহবাণীর কি বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছেন? কি তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন? কোন্ বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে তিনি এ মহাবাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন ঃ

"মানুষের সব কিছুই পচিয়া যাইবে লেজের হাড় ব্যতীত। উহা হইতেই জোড়া হইবে সমস্ত অঙ্গ।"[৫]

যে চিন্তা কেউ করতে পারে না,-যে ধারণা কারো মস্তিষ্কে আসে না-সেই ধারণা দিয়েছেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। কত বড় চিন্তাবিদ, কত বড় জ্ঞানী, কত বড় বিজ্ঞানী যাঁর চিন্তা, কল্পনা ও প্রমাণ নিখুঁত, বাস্তব ও খাঁটি। এই বাস্তবতার ভিত্তিতেই তিনি সমাধান করেছেন যুগ যুগের ফেলে আসা কঠিন ও জটিল সব প্রশ্ন। কথা নষ্ট হয় না। পৃথিবী তার বক্ষে ধরে রাখে। সময়মত আবার তা প্রকাশিত হবে। রসুল (দঃ)-এর এ কথা কেউ বিশ্বাস করতাম না যদি গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার আবিষ্কৃত না হতো। প্রতিটি বস্তুর প্রাণ আছে-সবাই আল্লাহ্‌র জয়গানে মত্ত। কোরআনে বর্ণিত এ মহাবাণী সত্য বলে কেউ ধারণা করত না যদি বৈজ্ঞানিকরা জড় বস্তু ভেঙ্গে ইলেকট্রন ও প্রটোনের ধারণা আমরাদের না দিতেন। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে রসুল (দঃ)-এর এ রূপ মূল্যবান বাণীসমূহ আমি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি-**'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'**-পুস্তকের ১ম ও ৩য় খণ্ডে। তিনি যা বলেছেন সবই সত্য। যেগুলো আজও বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পারেন নি সেগুলোও সত্য। একথা আজ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতে বাধ্য। কেননা তাঁর পবিত্র বাণীর একটিও ভুল প্রমানিত হয় নি। যতই দিন যাবে ততই তাঁর বাণীর গুরুত্ব বাড়বে।

চলুন, রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এ বাণীর সত্যতা কোরআন হতে দেখে নেই। দেখি পুনরুত্থানের ওপর সৃষ্টিকর্তার আরও কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মহাবাণী।

(১) "তবে কি আমি প্রথম সৃষ্টিতেই পরিশ্রান্ত হইয়াছি?-যেহেতু তাহারা নুতন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে।"[১] (৫০ ঃ ১৫)

(২) "যে দিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে সমুত্থিত করিবেন তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে পরিজ্ঞাপন করিবেন-যাহা আল্লাহ গণনা করিয়াছেন এবং তাহারা উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য রহিয়াছেন।"[২] (৫৮ ঃ ৬)

---

৫ । হাদিস। সহীহ বুখারী। তর্জমা আব্দুর রহমান। খাঁ। হাঃ নং ৬১/৫৮৮।

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা ক্বাফ। আয়াত -১৫।

২ । ঐ " মোজাদেলা। " -৬

(৩) "অবিশ্বাসীরা কি ধারণা করে যে- তাহারা পুনরুত্থিত হইবে না। তুমি বল,-'হাঁ'-। আমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হইবে। তৎপর তোমরা যাহা করিতেছ তাহা অবশ্যই তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হইবে এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।"[৩] (৬৪ ঃ ৭)

(৪) "সেদিন তাহারা সমাধি হইতে নির্গত হইবে -যেন তাহারা কোন লক্ষ্য পথে প্রধাবিত হইতেছে।"[৪] (৭০ ঃ ৪৩)

কোরআনে এরূপ অসংখ্য প্রতিশ্রুতি ও শপথ আল্লাহ্ দিয়েছেন। পুনরুত্থান সত্য। এক নির্দিষ্ট সময়ে যখন সৃষ্টিকর্তা ডাক দিবেন তখন জীবিত ও মৃত মানববৃন্দ সকলেই তাঁরই দিকে প্রধাবিত হইবে। দেখি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এ বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার চ্যালেঞ্জ কি?

পুনরুত্থানের একটি বাস্তব ঘটনা

আল্লাহ মৃতকে যে জীবিত করতে পারেন এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতেই আছে যা হযরত মূসা (আঃ) -এর সময় ঘটেছিল। কোরআন এর সাক্ষী। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

সুম্মা বায়াসনাকুম মিম্ বায়দে মাওতিকুম লা-আল্লাকুম তাশ্ কুরুন।"[১] (২ ঃ ৫৬)

অর্থাৎ, 'তৎপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

হযরত মূসা (আঃ) যখন বনি ইসরাইলদের অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতে বলেন তখন তাহারা বলে-আমরা আল্লাহ্‌কে না দেখে বিশ্বাস করি না। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদের প্রস্তুত হতে বলেন আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য। যখন তারা প্রস্তুত হলো তখন আল্লাহর অতি ক্ষীণ জ্যোতিরেখা তুর পাহাড় হতে বিশ্ব বিদারি বজ্রধ্বনি সহ বিদ্যুতের ন্যায় তাদের ওপর পতিত হলো। এতে সবাই মৃত্যু বরণ করল। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় এই মৃত ব্যক্তিরা জীবন ফিরে পেল।

আল্লাহ্‌র পক্ষে মৃতকে জীবিত করা ও জীবিতকে মৃতদান করা কেমন সহজ তা সহজেই অনুমেয়।

এজন্যই তিনি তাঁর মহাক্ষমতার বিকাশ করতেই জ্ঞানীদের প্রতি এ বাক্য দিয়েছেন যেন তাঁরা সক্ষম অনুধাবন করতে পারেন ঃ-

"আল্লাহুল্লাজি খালাকাকুম, সুম্মা রাজাকাকুম, সুম্মা ইউমেতুকুম, সুম্মা ইউহ্ইকুম, হাল্ মেন শুরায়াকায়েকুম-মাইয়াফআলু মিন জালেকুম-মিন শাইয়েন, সুব্ হানাহু ওয়া তায়ালা আম্মা ইউশিরেকুম।"[২] (৩০ ঃ ৪০)

---

৩ । ঐ " তাগাবোন। " ৭

৪ । ঐ " মারেজ। " -৪৩

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা বাকারা। আয়াত -৫৬

২ । ঐ। " আয়াত -৪০

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ঃ "তিনিই আল্লাহ- যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—তৎপর উপজীবিকা প্রদান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন তৎপর তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন; ফলতঃ তোমাদের অংশী উপাস্যগণের মধ্যে এমনকি কেহ আছে যে, ইহার কোন বিষয় করিতে পারে? তিনি পবিত্রতম এবং তোমরা যে অংশী স্থির কর—তিনি তাহা হইতে সমুন্নত।"

জীবন মৃত্যু, রেজেক দানকারী, পুনর্জীবিত করা একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই আয়ত্বাধীন। অন্য কোন উপাস্য, অংশীদাতা বা শক্তিশালী রাজা-মহারাজা বা কোন নরপতির নেই। এ জ্ঞান, এ বিজ্ঞান, এ কৌশল আর কেউ জানে না। এ চ্যালেঞ্জই দিয়েছেন তিনি একাধিকবার তাঁর মহাবাণীর মাঝে। এ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি আমার **'বিজ্ঞান না কোরআন'** পুস্তকে। এখানে আর দু' একটি বাণী তুলে ধরছি চিন্তাবিদদের জন্য। তাঁরা দেখুন গভীর চিন্তা করুন কেন আল্লাহ বার বার এ কথা তুলে ধরে সমগ্র মানব জাতিকে সাবধান করে দিচ্ছেন ঃ

(১) "ফলতঃ কে এই সৃষ্টির আদি স্রষ্টা; তৎপর উহা পুনঃ সৃষ্টি করিবেন? এবং কে তোমাদিগকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হইতে উপজীবিকা প্রদান করেন? অতএব আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তুমি বলিয়া দাও আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় কেহই অবগত নহে এবং তাহারা ইহাও জানে না যে কবে সমুত্থিত হইবে। হাঁ, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান সংকীর্ণ বরং তাদ্বিষয়ে তাহারা সন্দেহাচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরন্তু এতদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ।"[১] (২৭ ঃ ৬৪)

(২) "তুমি বল তোমাদের অংশী উপাস্যগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে প্রথমে সৃষ্টি করিয়া উহা পুনরায় করিতে পারে? তুমি বলিয়া দাও যে আল্লাহই প্রথমে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহা করিয়া থাকেন।"[২] (১০ ঃ ৩৪)

(৩) "অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও সেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন বিষয়ের দিকে আহ্বান করিবে। তাহাদের নয়নসমূহ অবনমিত হইবে। তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবরসমূহ হইতে বহির্গত হইবে।"[৩] (৫৪ ঃ ৬ -৭)

(৪) "নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে উত্থান দিবসে একত্রিত করিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"[৪] (৬ ঃ ১২)

(৫) "এবং সেদিন তিনি তোমাদিগকে একত্রিত করিবেন যেন তাহারা এক দিবসের মুহূর্ত ব্যতীত অবস্থান করে না। সেদিন তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং তাহারা সুপথগামী ছিল না।'[১] (১০ ঃ ৪৫)

কোরআনে এরূপ অসংখ্য বাণী আমরা দেখতে পাই। সূরা আনকুবত, সূরা মায়েদা—আঃ ৩৬, সূরা আন্‌আম—আঃ ৬২, সূরা হাদিদ—আঃ ১৭, সূরা ইয়াসিন—৭৮, সূরা সাফফাত—আঃ

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা নমল। আয়াত –৬৪

২ । " । " ইউনুস। " –৩৪

৩ । কোরাআন। সূরা কমর। আয়াত-৬-৭

৪ । " " আনআম " ১২

টীকা ঃ ১ একারআন। সূরা ইউনুস। আয়াত–৪৫।

১৬, সূরা ওয়াকেয়া—আঃ ৬০, সূরা আদিয়াত—আঃ ৯, এ পুরুত্থান সম্বন্ধে এজন্য বার বার প্রতি সূরাতেই বলা হয়েছে। আমার **'বিজ্ঞান না কোরআন?'** পুস্তকে পুনর্জীবন পরিচ্ছেদে এসব বাণীর কিছুটা তুলে ধরেছি।

এবারে আসুন, আমরা উপরে বর্ণিত বাণীকে সম্বল করে কিছু বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি।

আল্লাহর বাণী হতে দেখা যায় যে শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে মহা ধ্বংস-ধ্বনি উপস্থিত হবে। এ ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রই সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ধ্বংস-ধ্বনির স্বরূপ কি হবে চলুন আমরা দেখে নেই।

(১) হযরত ইস্রাফিল প্রথম শিঙ্গাধ্বনি দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব কেঁপে উঠবে। প্রাণীজগৎ আতঙ্কিত হবে। পৃথিবীতে মহাকম্পন উপস্থিত হবে। পর্বতমালা বিচলিত হবে। সমুদ্র সকল অগ্নিময় হবে। বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় মানবকুল বিভ্রান্ত হবে। চন্দ্র, সূর্য আপন আপন আলোক হারাবে। চরম অনিয়ম, মহা আলোড়ন এবং উচ্ছৃঙ্খল এক পরিবেশ জীবজগৎ ও বিশ্বজগৎকে ধ্বংসের পথে জড়িয়ে নেবে। কি ভয়াবহ সে দিন। এ দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তা তাঁর মহাবাণীতে এই বলে ঃ–

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত হইবে; এবং যখন সমুদ্র সকল উদ্বেলিত হইবে; এবং যখন সমাধিসমূহ সমুত্থিত করা হইবে; তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইবে।"[২] (৮২ ঃ ১-৫)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

হযরত হোযয়ফা রসুলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইয়া রসুলুল্লাহ শিঙ্গা ফুৎকারে মানুষের অবস্থা কেমন হইবে?'[৩] রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ওহে হোযায়ফা! আমার আত্মা যাহার অধিকারে তাঁহার শপথ। শিঙ্গা বাজানোর সাথে সাথেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। তখন এমন অবস্থা হইবে যে মুখের নিকট উঠানো লোকমা খাইবার ক্ষমতা থাকিবে না, হাত হইতে পড়িয়া যাইবে; পরিধেয় বস্ত্র সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও পরিধান করার সাহস হইবে না।"

"শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের আওয়াজ শুনিয়া প্রাণীজগৎ অস্থির হইয়া উঠিবে। কিন্তু আল্লাহ যাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন তাহারা নিরাপদে থাকিবে। প্রথম ফুৎকারেই পাহাড়-পর্বত উড়িয়া যাইবে। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল নদীর বুকে ঢেউ -এর আঘাতে আন্দোলিত নৌকার ন্যায় দুলিতে থাকিবে। গর্ভবতী গর্ভপাত করিবে। মা দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলিয়া যাইবে। শয়তানের দল পলায়ন করিতে থাকিবে। নক্ষত্ররাজী তাহাদের ওপর নিক্ষিপ্ত হইবে। চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগিবে। তাহাদের ওপর আকাশকে টানিয়া দেওয়া হইবে। বালক বৃদ্ধে পরিনত হইবে।"

(২) দ্বিতীয় বার ঃ শিঙ্গা ফুৎকারে সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রাণীজগৎ নিশ্চিহ্ন হবে। এর পর চল্লিশ দিন যাবৎ শুধু মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকবে। এই বৃষ্টির জলে সমগ্র জীবজন্তু সজীব হবে।

আল্লাহর বাণী নির্ভুল এবং বিজ্ঞানসম্মত। প্রলয়কাণ্ডের মূলে নিহিত প্রলয় ধ্বনি। আমরা পৃথিবীর বুকেই এ নিদর্শন দেখতে পাই। সমান্য বজ্রধ্বনিতে কত প্রাণী যে পাণ হারায়,

---

২ । কোরআন। সূরা এনফেতার। আয়াত ১–৫।

৩ । হাদিস। সংগৃহীত—দাকায়েকুল আখবার কৃত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) অনুবাদ—আবদুল জলিল পৃঃ নং ৬১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংজ্ঞাহীন হয়, বিকল হয়, বোধশক্তি হারায়, জ্ঞানশক্তি লোপ পায়, কর্ণ বধির হয়, চক্ষু অন্ধ হয় তার ইয়ত্তা নেই। কামানের শব্দ, এটম বোমা বিস্ফোরণের শব্দ একই কাণ্ড ঘটায়। সামান্য মহিষের শিঙ্গার ধ্বনিতে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তা সবাই জানেন।

দ্বিতীয়ত ঃ বৃষ্টির জল যে সুপ্ত, লুপ্ত প্রাণকে জীবন্ত করে; মৃতকে সজীব করে এর দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীর বক্ষেই রয়েছে। জ্ঞানীরা তাকালেই দেখতে পায়। তাদের চোখে ধরা পড়ে। মাটির নিচে যে সব বস্তু মৃত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে সারা বছর–বৈশাখের বজ্রধ্বনিসহ আকাশের পানি অর্থাৎ বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লে লুপ্ত বীজকণা গজিয়ে ওঠে চোখ ঝলসানো শ্যামল-সুন্দর রূপ নিয়ে। বিজ্ঞানী ও অবিশ্বাসীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ একথা বলেছেন ঃ

"এই নির্জীব পৃথিবীও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন; আমিই উহাকে সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপাদন করি; তৎপর তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে।"[১] ১ (৩৬ ঃ ৩)

(৩) তৃতীয় বার ঃ হযরত ইস্রাফিল আল্লাহর আদেশে শিঙ্গায় ফুৎকার করিবে। এ সময় উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে ঃ

"হে বিদ্রোহী আত্মাসমূহ, গলিত দেহসমূহ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিরা-উপশিরা সমূহ তোমরা হিসাব-নিকাশ ও বিচারের জন্য এখনই উঠ। এ ঘোষণা শুনিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইবে। পুনর্জীবন লাভ করিয়া তাহারা আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তিত অবস্থায় দেখিবে। সেদিন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অবস্থা বুঝিতে ও অনুমান করিতে পারিবে।"

তৃতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে 'দলে দলে মানুষ কবর হতে উত্থিত হবে'। এই দলে দলের কথাটির মধ্যে বেশ গুরুত্ব রয়েছে। কোরআনে অনেক জায়গায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন ঃ

"এবং তখন তোমরা তিন শ্রেণী হইবে। অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল; দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গদিল কি? এবং বাম পার্শ্বের সঙ্গীদল; বম পার্শ্বের সঙ্গীদল কি? এবং অগ্রবর্তীগণ অগ্রবর্তী হইবে। ইহারাই সন্নিকটবর্তী।"[১] (৫৬ ঃ ৮ -১১)

মহাপ্রলয় সংঘটিত হবার পর মৃত মানবসমূহ পুনরায় জীবিত হবে এবং উত্থিত হবে। এই পুনরুত্থানের সময় মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দলটিকে বলা হয়েছে–'দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল'। দ্বিতীয় দলটি–'বাম পার্শ্বের সঙ্গীদল'। আর তৃতীয় দলটি–'অগ্রবর্তী দল'।

(১) দক্ষিণ পার্শ্বের সঙ্গীদল ঃ বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান সম্প্রদায়।

(২) বাম পার্শ্বের সঙ্গীদল ঃ অবিশ্বাসী অনাচারী, দুষ্কর্মশীল অপরাধী সম্প্রদায়। এরাই বিচার আসনের বাম পার্শ্বে স্থান পাবে।

(৩) অগ্রবর্তী দল ঃ উন্নত শ্রেণীর নবী, রসুল, ওলি-আল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট মানব সম্প্রদায়। তাঁরা বিচার আসনের সম্মুখে থাকিবেন।

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা ইয়াসিন। আয়াত –৩৩।
টীকা ঃ ১ । কোরআন । সূরা ওয়াকেয়া। আয়াত –৮-১১।

কি অবস্থায় মানুষ উত্থিত হইবে?

উত্থিত হবার ব্যাখ্যা রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ভাবে দিয়েছেন ঃ

(১) "সমাজে গোলযোগকারী ব্যক্তি উত্থান দিবসে বানরের আকৃতিতে উঠিবে।

(২) হারাম বা নিষিদ্ধ খাত দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধনকারী শুকরের আকৃতি লইয়া উঠিবে।

(৩) অন্যায় বিচারকারী অন্ধ হইয়া উঠিবে।

(৪) ইবাদত বন্দেগীতে যাহারা গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে তাহারা অন্ধ ও বোবা হইয়া উঠিবে।

(৫) যে আলেমের কথা ও কাজে কোন সামঞ্জস্য ছিল না তাহার মুখ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং তাহার স্বীয় দাঁত দ্বারা জিহ্বা কামড়াইতে থাকিবে।

(৬) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর দেহ আগুনে দগ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় উঠিবে।

(৭) কু-প্রবৃত্তি এবং লালসাবৃত্তি চরিতার্থকারীর পদদ্বয় মাথার চুল দ্বারা কপালের ওপর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় তাহাদের দেহ হইতে দারুন দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে।

(৮) আল্লাহ্‌র আদেশ আদায়ে অলসতা ও অবহেলাকারী মাতালের মত ডানে-বামে উঠাপড়া অবস্থায় উঠিবে।

(৯) পর-নিন্দাকারী, পর-ছিদ্রান্বেষী চোগলের এবং দুর্নাম রটনাকারী গন্ধকের জামা পরিহিত অবস্থায় উঠিবে।

(১০) চোগলখোরদের জিহ্বাকে মুখ হইতে বহুদূর হইতে প্রসারিত করিয়া উঠান হইবে।

(১১) যাহারা মসজিদে বসিয়া দুনিয়ার কথা বলিবে তাহারা মাতাল অবস্থায় উঠিবে।

(১২) সুদখোর শুকরের আকৃতিতে উঠিবে।"

উপরে উদ্ধৃত বাণীসমূহ পাঠ করে প্রতিটি বিশ্বাসী নর-নারীই আতঙ্কিত হবে। উত্থান দিবসে যে ব্যক্তি যে আকৃতি ধারন করে উত্থিত হবে সে ব্যক্তি সে রূপ প্রতিফলই বিচার দিবসে প্রাপ্ত হবে। তবে ধর্মভীরু, বিশ্বাসী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পুণ্যাত্মা-মনীষী,আলেম -ওলামা, উপরে বর্ণিত আকৃতি ধরে উত্থিত হবে না। বরং সম্মানিত অতিথিরূপে সু-সজ্জিত পোশাক পরে সুন্দর আকৃতিতে কবর হতে উত্থিত হবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না। যেমন থাকবে অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিকারীদের। আল্লাহর বাণী এ কথার সাক্ষ্য দেয়ঃ

(১) "যেদিন আমি ধর্মভীরুদিগকে সর্বপ্রদাতার দিকে অতিথিরূপে সমুত্থিত করিব এবং অপরাধীদিগকে নরকের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় প্রধাবিত করিব।"[১]

(১৯ ঃ ৮৫-৮৬)

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা মরিয়ম। আয়াত –৮৫-৮৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) "অপরাধীরা আকৃতি দ্বারাই পরিচিত হইবে, তখন তাহারা কেশ-গুচ্ছ পদসমূহ যোগে ধৃত হইবে।"[২] (৫৫ ঃ ৪১)

এই মহাসঙ্কটের দিনে কারো কোন মর্যাদা থাকবে না। কারো কোন বাহাদুরী থাকবে না। রাজকীয় পোশাকে ভূষিত হয়ে কেউ গর্বভরে পরিচয় দিতে যাবে না। স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত মুকুট পরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না। শক্তির বাহাদুরী দেখিয়ে, সেনাপতির বেশে বুটের পদাঘাতে মাটি কম্পিত করবে না। যে নগ্ন দেহে মায়ের পেট হতে বের হয়েছিল–সেই নগ্ন দেহেই মানুষ উত্থিত হবে। সৃষ্টির শুরুতে যে সাম্য বজায় ছিল মাটির অভ্যন্তরে যে কায়দায় লুকিয়ে ছিল –ঠিক সেই মহাসাম্যের রজ্জুতেই আবদ্ধ হয়ে সবাই উঠবে সেদিন হাহাকার নিয়ে, শঙ্কা ও ভীতি নিয়ে, অশ্রুভরা চাখ নিয়ে, ব্যথাভরা হৃদয় নিয়ে, পোশাক ছাড়া দেহ নিয়ে। দেখুন কথাগুলো সত্য কি না ঃ

হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

নবী (সঃ) বলিলেন ঃ

"তোমাদের উত্থান দিবসে একত্র করা হইবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে, খতনা ব্যতিরেকে।"[১]

তৎপর পড়িলেন এই আয়াত ঃ

"যে রূপ আমি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছি সেইরূপ পুনরায়ও করিব। এই প্রতিশ্রুতি আমার দায়িত্ব এবং আমি উহা নিশ্চয় পূর্ণ করিব।"[২] (২১ ঃ ১০৪)

কে সর্বপ্রথম উত্থিত হইবে?

প্রাণীজগৎ ও মানব-দানবের মধ্যে উত্থান দিবসে সর্বপ্রথম মাথা তুলবার হুকুম পাবেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ চ্যালেঞ্জ অন্য কোন নবী বা পয়গম্বর দিতে পারেন নি। হযরত বলেছেন ঃ

"রোজ কিয়ামতে আমিই সর্বপ্রথমে মাথা তুলিবার হুকুম পাইব এবং আমিই সর্বপ্রথমে সেজদা করিতে আদিষ্ট হইব।"[২]

তৃতীয়বার শিঙ্গা ফুৎকার করার পর সমস্ত জীবজন্তু মাটির অভ্যন্তরে সজীব হয়ে উঠবে। কিন্তু কেউ মাটি ভেদ করে ওপরে উঠে আসবে না যতক্ষণ না বিশ্বনবী মাথা তুলে বেরিয়ে আসবেন। দেখুন কি অবস্থায়, কার নির্দেশে তিনি মাথা তুলে কবর হতে উঠে আসবেন। যখন সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও জীবিত থাকবে চার জন ফেরেস্তা। আল্লাহ এই ফেরেস্তাদের আদেশ করবেন বেহেশতের পোশাক ও প্রশংসার পতাকা নিয়ে হযরত

২ । " । " রহমান । " ৪১ ।

টীকা ঃ ১ সহীহ বুখারী তজরীদ, ২য় খণ্ড। তর্জমা আঃ রহমান খাঁ।

হাঃ নং ৫৯/২২৯।

২ । কোরআন সূরা আম্বিয়া। আয়াত–২১।

৩ । বোরাক ঃ বেহেশতে রক্ষিত চতুষ্পদ জন্তু। আগুনের তৈরি এ জন্যই বোরাক বলা হয়। আকৃতিতে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়। সবুজ ও হলুদ পোশাক দ্বারা একে সজ্জিত করা হবে এবং জ্বিন-পোষ হবে সবুজ ইয়াকুত পাথরে তৈরি আর লাগাম যবরজদ পাথরের তৈরি। এই বোরাকে উঠেই হযরত যাবেন হাশরের ময়দান ও পুলসেরাতে।

মুহাম্মদের কবরের পাশে যেতে। সসম্মানে তাঁকে সম্বোধন করে কবর হতে উঠে আসবার অনুরোধ জানাতে। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পর পাহাড়-পর্ব্বত, জল-স্থল একাকার হয়ে গিয়েছে। তখন বিস্তীর্ণ এ সমতল প্রান্তরে হযরতের কবর কোথায় তা কিভাবে তারা বুঝতে পারবে? ফেরেস্তারা যখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন দেখতে পাবে এক স্থান হতে **'নূরে মুহাম্মাদী'** –অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর আলোক উজ্জ্বল দীপ্তি স্তম্ভাকারে আকাশ সীমা অতিক্রম করছে। এ দীপ্তি দেখে তাঁরা বুঝতে পারবেন এটাই মুহাম্মদের কবরস্থান তখন এই চারজন ফেরেস্তা এই কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু কে তাঁকে সম্বোধন করবেন? কারো সাহস জুটছে না। সবাই লজ্জিত, ভীত ও শঙ্কিত। অবশেষে সবার অনুরোধে হযরত মিকাইল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অতি বিনম্র সুরে বলবেন ঃ

"আচ্ছালামো আলায়কুম ইয়া মুহাম্মদ" কিন্তু কোন উত্তর নেই। আজরাইলের একই সম্বোধনেও সাড়া মিলল না। সর্বশেষে হযরত ইস্রাফিলকেই এ দায়িত্ব নিতে হলো!

তিনি বলেন ঃ "হে পবিত্রতার অধিকারী! হিসাব -নিকাশ ও আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের সময় আগত। উঠিয়া আসুন।"

হযরত ইস্রাফিলের এ আহ্বানে রসুলুল্লাহ (দঃ)-কবরের মধ্যে উঠে বসবেন এবং পবিত্র মাথা ও দাড়ি হতে মাটি ঝাড়তে থাকবেন। হযরত জিব্রাইল তখন তাঁকে সালাম জানিয়ে **"বোরাকে'** আরোহণ করতে অনুরোধ করবেন। বেহেশতের পোশাকে তাঁকে সুসজ্জিত করা হবে। এরপর তিনি কবর হতে মাথা তুলে উঠে আসবেন এবং আল্লাহকে সেজদা করবেন।

উত্থান দিবসের অবস্থা

(কোরআন)

পুনরুত্থানের পূর্বে কি ঘটনা ঘটবে, কিরূপে মৃত মানব ও জীবজন্তু ধুলি হতে পূর্ণ আকৃতিতে উত্থিত হবে এর কোন থিওরী আমরা বিজ্ঞানীরা দিতে জানি না। কার ইশারায়, কোন মহাবৈজ্ঞানিকের নির্দেশে এক প্রলয়ধ্বনি অকস্মাৎ এ মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে ধ্বংস করবে, আবার তাঁরই নির্দেশে জীবজন্তু ও জ্বেন-ইনসান ভীতি -বিহ্বল চিত্তে তাঁরই দিকে ধাবমান হবে এর কোন সমাধান আমরা অন্ধ ব্যক্তিরা খুঁজে পাই না। পান শুধু তাঁরাই যাঁরা নিম্নের এ বাণীসমূহকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন আর নিজের জ্ঞান-গরিমা ও বাহাদুরীর আস্ফালনকে ঘৃণাভরে কবর দেন।

(১) "অনন্তর যেদিন সেই ধ্বংসধ্বনি উপস্থিত হইবে। সেদিন মানুষ তাহার ভ্রাতা হইতে পলায়ন করিবে; এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা; এবং তাহার সঙ্গিনী ও তাহার সন্তানবর্গ হইতেও। সেদিন তাহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের এরূপ অবস্থা হইবে যে কেহ কাহারো উপকারে আসিবে না। **সেদিন বহু আনন দীপ্তিমান হইবে;–হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল এবং সেদিন বহু মুখ ধুলি -ধূসরিত হইবে; কালিমাময় সমাচ্ছন্ন। ইহারাই অবিশ্বাসী দুষ্কৃতিকারী।"**[১] (৮০ ঃ ৩৩-৪২)

টীকা ঃ ১ । কোরআন সূরা আবাসা। আয়াত –৩৩-৪২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) "যখন পৃথিবী উহার পূর্ণ কম্পনে প্রকম্পিত হইবে, এবং পৃথিবী স্বীয় ভারসমূহ বহির্গত করিয়া দিবে। এবং মানুষ বলিবে উহার কি হইয়াছে, সেদিন স্বীয় সংবাদসমূহ ব্যক্ত করিবে।"[২] (৯৯ ঃ ১-৪)

(৩) "যেদিন কম্পমান প্রকম্পিত হইবে, পরবর্তী উহার পশ্চাদানুসরন করিবে; সেদিন অন্তরসমূহ স্পন্দিত হইবে। তাহাদের নয়নসমূহ অবনত হইবে। তাহারা বলিতেছে আমরা কি সত্যই পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইব? যখন আমরা বিগলিত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব? তাহারা বলে যে ইহা তো এক অনিষ্টকর প্রত্যাবর্তন। অনন্তর উহা এক তিরস্কারধ্বনি ব্যতীত কিছু নহে। তৎপর অকস্মাৎ তাহারা এক সমতল প্রান্তরে উপস্থিত হইবে।"[৩] (৭৯ ঃ ৬১৪)

(৪) "অনন্তর যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব-যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা সম্যকরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।[১] (২ ঃ ৬-১২)

(৫) "সে জিজ্ঞাসা করে যে উথান দিবস কবে হইবে। ফলতঃ যখন দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইবে এবং চন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে। সেদিন মানুষ বলিবে যে পলায়নের স্থান কোথায়? কোথাও নহে; কোথাও আশ্রয় নাই। সেদিন তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই বিশ্রামস্থল।"[২] (৭৫ ঃ ৬-১২)

বাইবেল

[তৌরাত-করিন্থিয় পরিচ্ছেদ]

১৫ (১) "মৃতেরা জীবিত হইবে। আমার শব সমূহ উঠিবে। হে ধুলি নিবাসীরা তোমরা জাগ্রত হও; আনন্দ গান কর; কেননা তোমার শিশির দীপ্তির শিশির তুল্য এবং তুমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে।"[৩]

১৫ (২) ৩৫-৩৬ "কেহ বলিবে মৃতেরা কিভাবে উথাপিত হয়? কি প্রকারে দেহ ধারণ করিয়াইবা আসে? নির্বোধ তুমি, তুমি যাহা বপন কর; তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না।

৩৭। আর যাহা বপন কর তাহাতে যে দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহা তুমি বপন কর না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কিছুরই হোক বীজ একটিমাত্র বপন করিতেছ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি দেন। তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজস্ব দেহ দেন। সকল মাংস একই প্রকারের নয়। কিন্তু মানুষের মাংস এক প্রকার-পশুর মাংস অন্য প্রকার ও মৎস্যের অন্য প্রকার। স্বর্গীয় পার্থিব উভয় প্রকারের দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির প্রভা এক প্রকার ও পর্থিব দেহগুলির প্রভা ভিন্ন প্রকার। সূর্যের এক প্রকার প্রভা-চন্দ্রের অন্য

২ । " " জেলজাল " ১-৪।
৩ । কোরআন সূরা নাজেয়াত। আয়াত -৬ হতে ১৪।
টীকা ঃ ১ । কোরআন সূরা বাকারা আয়াত-২৫।
২ । " " কেয়ামাহ। আয়াত -৬-১২।
৩ । বাইবেল। যিমাইর-২৬/১৯।

প্রকার ও নক্ষত্রের আর এক প্রকার প্রভা; কারণ প্রভা সম্বন্ধে একটি নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন। মৃতদের পুনরুত্থানও সেইরূপ। যাহা বপন করা হয় তাহা নশ্বর। যাহা উত্থাপন করা হয় তাহা অবিনশ্বর। অনাদরে বপন করা হয় তাহা নশ্বর, যাহা উত্থাপন করা হয় তাহা অবিনশ্বর। অনাদরে বপন করা হয়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়। জড়দেহ বপন করা হয়-আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়। যখন জড়দেহ আছে তখন আত্মিক দেহও আছে। এইরূপ লেখাও আছে-প্রথম মানুষ আদম সজীব প্রাণী হইল। শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন। কিন্তু যাহা আত্মিক তাহা প্রথম নয়-বরং যাহা জড় তাহাই প্রথম। যাহা আত্মিক তাহা পরবর্তী। প্রথম মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে মৃন্ময়; দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে। মৃন্ময় ব্যক্তিরা সেই মনুষ্যের তুল্য এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়ের তুল্য। আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছি-তেমনই সেই স্বর্গীয় মনুষ্যের প্রতিমূর্তিও ধারণ করিব।

আমি এ বলি-ভ্রাতৃগণ! রক্ত-মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। দেখ আমি তোমাদের এক নিগূঢ় তত্ত্ব বলি-'আমাদের সকলের মৃত্যু হইবে না কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হইব। এক মুহূর্তের মধ্যে। চক্ষুর পলকে, শেষ তুরধ্বনিতে তাহা হইবে। (তৃতীয় বার শিঙ্গা ফুৎকারে)। কারণ **তুরী বাজিবে তাহাতে মৃতেরা অবিনশ্বর হইয়া উত্থাপিত হইবে এবং আমরা রূপান্তরিত হইব**। কারণ এই নশ্বরকে অবিনশ্বরতা পরিধান করিতে হইবে এবং এই মর্তকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে আর এই নশ্বর যখন অবিনশ্বরতা পরিহিত হইবে এং এই মর্ত যখন অমরতা পরিহিত হইবে তখন এই যে কথা লেখা আছে-'মৃত্যুজয়ে কবলিত হইল' তাহা সফল হইবে। 'মৃত্যু'-তোমার স্থল কোথায়? 'মৃত্যু'-তোমার জয় কোথায়? মৃত্যুর স্থল পাপ ও পাপের বল বিধি-ব্যবস্থা।"[১]

বাইবেল-তৌরাত -সফনীয় পরিচ্ছেদ

১/১৪ "সদাপ্রভুর মহাদিন নিকটবর্তী। তাহা নিকটবর্তী, অতি শীঘ্র আসিতেছে; ঐ সদাপ্রভুর দিনের শব্দ; সেখানে বীর তীব্র আর্তরব করিতেছে।

১৫ সেইদিন ক্রোধের দিন; সঙ্কটের ও সঙ্কোচের দিন, নাশের ও সর্বনাশের দিন; অন্ধকারের ও তিমিরের দিন।

১৬ মেঘের ও গাঢ় তিমিরের দিন; তুরধ্বনি রণনাদের দিন তাহা প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উচ্চ দূর্গ সকলের বিপক্ষ।

১৭-১৮ আমি মনুষ্যদিগকে দুঃখ দিব; তাহারা অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিবে; কারণ তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাদের রক্ত ধুলির ন্যায় ও তাহাদের মাংস মলের ন্যায় ঢালা যাইবে। সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তাহাদের রৌপ্য কি তাহাদের সুবর্ণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দেশ অগ্নি ভক্ষিত হইবে, কেননা তিনি দেশ-নিবাসী সকলের বিনাশ; হাঁ ভয়ানক সংহার করিবেন।

২/২-৩ হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা একত্র হও; হাঁ একত্র হও, কেননা দণ্ডাজ্ঞা সফল হইবার সময় হইল। দিন তো তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি তোমাদের

টীকা ঃ ১ । বাইবেল। করিন্থিয়-১৫/৩৫-৫৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওপরে আসিয়া পড়িল। সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের ওপর আসিয়া পড়িল। হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক তাঁহার শাসন পালন করিয়াছ যে তোমরা:–তোমরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর: ধর্মের অনুশীলন কর; নম্রতার অনুশীলন কর: হয়ত সদাপ্রভুর দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাইবে।"[1]

বাইবেল–মার্ক পরিচ্ছেদ

"সেইদিন বা সেই মুহূর্তের বিষয় কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও না; পুত্রও না কেবল পিতাই জানেন। সতর্ক হও, জাগিয়া থাক কারণ সেই কাল কখন আসিবে তাহা তোমরা জান না।"[2]

বাইবেল [তৌরাত –গীত সংহীতা]

১১৩.১ তোমরা সদা প্রভুর প্রশংসা কর।
হে সদাপ্রভুর দাসগণ প্রশংসা কর।
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর।
২ ধন্য সদাপ্রবভুর নাম
এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত,
৩ সূর্য উদয় স্থান অবধি তাহার অস্তস্থান পর্যন্ত
সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়।
৪ সদাপ্রভু সর্ব জাতির উপরে উন্নত,
তাঁহার গৌরব আকাশমণ্ডলের উপরে উন্নত,
৫ কে আমাদের সদাপ্রভুর তুল্য?
তিনি উর্দ্ধে সমাসীন;
৬ তিনি অবনত হইয়া দৃষ্টিপাত করেন
আকাশে ও পৃথিবীতে
৭ তিনি ধুলি হইতে দীনহীনকে তুলেন,
সারের ঢিবি হইতে দরিদ্রকে উঠান,
৮ যেন তিনি তাহাকে বসাইয়া দেন কুলিদের সঙ্গে
আপন প্রজাদের কুলিদেরই সঙ্গে।

বাইবেল

(তৌরাত–সুফনীয় পরিচ্ছেদ)

১/২-৩ "আমি ভূতল হইতে সকলই সংহার করিব। ইহা সদাপ্রভু বলেন। আমি পশুগণকে সংহার করিব। আমি আকাশের পক্ষীগণকে, সমুদ্রের মৎস্যগণকে ও দুষ্টগণ শুদ্ধ

টীকা: ১ বাইবেল। সফনীয়–১/১৪-১৮ একা ২/২-৩।
২ । " মার্ক–১৩/৩২-৩৩।

বিঘ্ন সকল সংহার করিব। হাঁ, আমি ভূতল হইতে মনুষ্যকে উখিত করিব। ইহা সদাপ্রভু বলেন।"

বাইবেল (ইঞ্জল–মার্ক পরিচ্ছেদ)

১২/১৮ "যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই সেই সদ্দুকীদলের কয়েকজন যীশুর নিকট আসিল ও এই প্রশ্ন করিল–

১৯) গুরু, মোশী আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, যদি কাহারো ভ্রাতা স্ত্রী রাখিয়া মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তান না থাকে, তবে মৃত লোকের ভ্রাতা সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিবে এবং আপন ভ্রাতার জন্য বংশধর উৎপন্ন করিবে।

২০) সাত ভাই ছিল। প্রথম জন একটি স্ত্রী লোককে বিবাহ করিল এবং সন্তান না রাখিয়া মরিয়া গেল।

২১) দ্বিতীয় জন তাহাকে বিবাহ করিল। সেও সন্তান না রাখিয়া মরিয়া গেল।

২২) তৃতীয় জনও সেইরূপ করিল। এইরূপে সাত ভাই তাহাকে বিবাহ করিল ও কাহারো সন্তান রহিল না।

২৩) সকলের শেষে স্ত্রী লোকটিও মরিয়া গেল। পুনরুত্থানে যখন তাহারা জীবিত হইয়া উঠিবে তখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? কারণ তাহারা সাতজনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।

২৪) যীশু তাহাদের বলিলেন,–তোমাদের ভ্রান্তির কারণ কি? এই নয়–তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের শক্তি!

২৫) কারণ যখন লোকে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হয় তখন তাহারা বিবাহ করে না এবং তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয় না। তাহারা স্বর্গদূতের ন্যায়।"[1]

২৬) মৃতেরা যে উত্থাপিত হয়–এই সম্বন্ধে তোমরা মোশীর পুস্তকে সেই কোপের বৃত্তান্ত কি পাঠ কর নাই? যেখানে ঈশ্বর তাহাকে বলিয়াছিলেন–"আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর।

২৭) তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর।[2] তোমরা অতি ভ্রান্ত হইয়াছ।"

টীকা ঃ ১ । স্বর্গদূতের ন্যায়–মুসলমানদের পরিভাষায় ফেরেস্তাদের ন্যায় যারা চিরজীবন অবিবাহিত। উত্থান দিবসে প্রত্যেকেই অবিবাহিত অবস্থায় অর্থাৎ নিঃসঙ্গভাবে বেহশতে বা স্বর্গে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত থকাবে। এরপর স্বামী-স্ত্রী, পরিবার-পরিজন একত্রিত হবে।

২ । জ্ঞানীদের জন্য এ বাক্য উপহার স্বরূপ। এখান থেকে বুঝা যায় মৃত বলে কোন জীব নেই। ঈশ্বরের নিকট সবাই জীবিত। সাময়িকভাবে কবরের মাঝে বা ধুলিকণায় মিশে থাকলেও তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় না। চেতন-অচেতন অবস্থায় প্রতিটি বস্তু বিশ্বের বুকে মিশে আছে। ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই জাগ্রত হবে পুনরুত্থিত হবে। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচার দিবস

(কোরআনের মতে)

পুনরুত্থান শেষে যে দিবসে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের বিচার হবে সে দিবসকেই বলা হয় বিচার দিবস। এ দিবসের মালিক মহান প্রভু, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব গ্রহণকারী-যিনি তাঁর সূক্ষ্ম পরিমাপে মানব-দানবের পার্থিব কার্যাবলীর হিসাব গ্রহণ করবেন। যাঁর বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রভাবান্বিত হবার কোন সুযোগ নেই। অন্যায়ের আশ্রয় নেই। আছে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার অপূর্ব কৌশল। এটাই হলো প্রতিদান দিবস। এটাই হলো প্রতিফল দিবস। বিচার মীমাংসার দিবস। এ বিচার দিবসে প্রত্যেককেই ধরা দিতে হবে-স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। এ দিবসকে অতিক্রম করার বুদ্ধি কারো নেই। এ দিবস থেকে দূরে পালিয়ে যাবারও কোন পন্থা নেই। এ জন্যই মহাবিচারক বলেছেন ঃ-

"ইন্না এলায়না ইয়াবাহুম। সুম্মা ইন্না আলায়না হিসাবাহুম।"[৩] (৮৮ ঃ ২৫-২৬)

অর্থাৎ

"নিশ্চয় আমার দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন। তৎপর নিশ্চয় আমার দিকেই তাহাদের হিসাব।"

ন্যায়ের তুলাদণ্ডে না হলেও পার্থিব জীবনে আমাদের হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হয়। হত্যা করলে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠতে হয়। চুরি করলে জেলহাজত খাটতে হয়। প্রতারণা করলে জরিমানা দিতে হয়। গালি দিলে কানমলা খেতে হয়। ব্যভিচার করলে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়। অপমান করলে অপমানিত হতে হবে। এসব ঘটনা তো পৃথিবীতেই হয়ে থাকে। তাহলে পরকালে কেন হবে না? সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান যে সত্য এটা পূর্বের পরিচ্ছেদে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রমাণে প্রমাণ করা হয়েছে। পুনরুত্থানের কারণই হলো বিচারের। আর এ শেষ বিচারের ফলাফলই হলো চিরশান্তির স্বর্গ চির অশান্তির নরক। এ দিবসের সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ জ্ঞানী ব্যক্তিদের থাকবার কথা নয়। কেন না বাস্তব ক্ষেত্রেই তারা এটা দেখতে পায়। এছাড়া সৃষ্টিকর্তার বাণীকেও ভক্তি ভরে বিশ্বাস করে। দেখুন আল্লাহ এ দিবসের কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! তিনি বলেছেন ঃ

(১) 'এই দিন সত্য। অতএব যাহার ইচ্ছা সে তদীয় প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করুক।"[১] (৭৮ ঃ ৭৯)

(২) "তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য; নিশ্চয়ই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি পুনর্বার করিবেন-যদ্দারা তিনি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে সৎকার্য করিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিদান

৩। কোরআন। সূরা গাশিয়া। আয়াত-২৫-২৬।
টীকা ঃ১। কোরআন। সূরা নবা। আয়াত -৭৮-৭৯।

প্রদান করিবেন এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে-তজ্জন্য যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।"[২]

(১০ ঃ ৪)

আল্লাহ্‌র বাণী হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বাসী ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা তা যে কোন দেশ বা জাতিরই হোক না কেন পুরস্কৃত হবে। আর অবিশ্বাসীদের হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি। কোরআন একাধিকবার এ পুরস্কার ও শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

রোজ হাশরের এ বিচার দিনে কারো কনো বাহাদুরী থাকবে না। ধন-দৌলত, স্বর্ণ -রোপ্য প্রভৃতির বিনিময়েও শাস্তির হাত থেকে কোন অবিশ্বাসী, দুষ্কৃতিকারী বা অহঙ্কারী নিষ্কৃতি পাবে না। কথা বলার শক্তি কারো হবে না। মুখে সিল মারা হবে। হাত-পা অঙ্গসমূহ কথা বলবে এবং সৎ-অসৎ কাজের সাক্ষি দেবে। নতজানু হয়ে, নতশীরে, সসম্মানে নিজ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে বিচারের অপেক্ষায় দিন কাটাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি মানুষের কর্মফল বা আমলনামা তাদের দেখানো হবে পার্থিব জীবনে কি তারা করেছিল। সৃষ্টিকর্তা এ গ্রন্থখানি তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বলবেন-"ইহাই আমার গ্রন্থ যাহা তোমাদের সম্বন্ধে সত্যভাবে বিবৃতি করিতেছি।'

চলুন আল্লাহর এরূপ মহাবাণীগুলো দেখে নিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করি ও বিচার দিনের সত্যতাকে স্বীকার করি।

(১) "সেদিন লোক সকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে; যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মসমূহ প্রদর্শন করা হইবে। অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং যে পরমাণু পরিমাণ দুষ্কার্য করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে।"[১] (৯৯ ঃ ৬-৭)

(২) "আজ আমি তাহাদের আনন সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব, এবং তাহাদে হস্তসমূহ আমার সমক্ষে কথা বলিবে এবং তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দান করিবে।"[২] (৩৬ ঃ ৬৫)

(৩) "এবং আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য, এবং যেদিন সেই সময় সমুপস্থিত হইবে সেদিন অসত্যারোপকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু অবস্থায় অবলোকন করিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হইবে; তোমরা যাহা করিয়াছিলে তজ্জন্য আজ তোমাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে। ইহাই আমার গ্রন্থ-যাহা তোমাদের সম্বন্ধে সত্যভাবে বিবৃত করিতেছি; **তোমরা যাহা করিয়াছিলে নিশ্চয় আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।"[৩]**

(৪৫ ঃ ২৭-২৯)

পার্থিব জীবনে অসৎ ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ফলাফল কি হতে পারে তা পূর্বে দু'একটি

২। কোরআন। সূরা ইউনুস। আয়াত -৪।
১ টীকা ঃ১। কোরআন জেলজাল। আয়াত -৬-৭।
২। কোরআন। সূরা ইয়াসিন। আয়াত -৬৫।
৩। ঐ। " জাসিয়া। " ২৭-২৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দৃষ্টান্তে বর্ণনা করেছি। এবার দেখি যারা মর্যাদার আসন এ পৃথিবীতে গ্রহণ করে তাঁদেরও কি হিসাবের খাতায় নাম লিখতে হয়? আসুন বাস্তব ক্ষেত্রে কি ঘটে এটা দেখে নেই।

পড়াশুনা করে প্রমোশন নিতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। মর্যাদাশীল হতে হয়। মর্যাদাশীল হতে হলে শ্রমের ও ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কর্মফল অনুযায়ী এ ধরাতেই সে তার প্রতিফল পায়। প্রতিদান পায়। সম্মানের উচ্চতর শিখরে সমাসীন হয়। এখান থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাই সৎ-অসৎ প্রতিটি শ্রেণীর, প্রতিটি সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষকেই এ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কেউ রেহাই পাবে না। কারো বাহাদুরী খাটবে না। তোষামোদ-খোষামোদ চলবে না। এ মহাবিচার দিবসে কোন ব্যারিস্টার-উকিল-মোক্তার মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস পাবে না। সবাই সবার জন্য থাকবে ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত। নিজেরাই নিজেদের সৎ-অসৎ কর্মের জন্য সাক্ষী হবে মহাবিচারের কি অপূর্ব কৌশল? দেখুন আমার এ কথাটি সত্য কি না।

(৪) "বালেল এনসানো আলা নাফ্‌সিহি বাসিরা।

ওয়া লাউ আলকা মাজিরাহু।"[১] (৭৫ ঃ ১৪-১৫)

"বরং মানুষ তাহার নিজের সম্বন্ধেই সাক্ষী হইবে এং যদিও তাহারা উহাতে ওজরাপত্তি করিবে।"

একবার দু-বার নয় –বার বার সৃষ্টিকর্তা পুনরাবৃত্তি করেছেন তাঁর মহাবাণীতে বিচার দিবসের বর্ণনায়। মানুষ নিজকে বড় অসহায় বোধ করবে। কেউ কারো উপকারো আসবে না। কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। নিজ কর্মফলের হিসাব নিজকেই দিত হেব। নিম্নের এ বাণীটি আরও পারিষ্কার করে দিয়েছে।

"আমি প্রত্যেক মানুষের স্কন্ধেই তাহার কৃতকর্মসমূহ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি, এবং আমি উত্থান দিবসে তাহার জন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিব–যাহা সে অনাবৃত প্রত্যক্ষ করিবে। তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর–তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমি যথেষ্ট। যে পথ প্রাপ্ত হয় বস্তুতঃ সে নিজেরই জন্য সুপথ পাইয়া থাকে, এবং যে বিপথগামী হয় ফলতঃ সে কেবল নিজেরই সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হইয়া যায়, এবং কোন বহনকারী অপরের ভার বহন করিবে না, এবং আমি রসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না।"(১৭ ঃ ১৩-১৫)

বিচার দিবসে প্রতিটি মানুষ তার কর্মফল যা লিখিত হয়েছে দেখতে পাবে। এছাড়া তাদের সমগ্র জীবনের পাপ-পুণ্য সূক্ষ্ম দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হবে। এ ওজনে কম-বেশির সম্ভাবনা নেই। অতি সূক্ষ্ম চুল পরিমাণ ওজন করার শক্তিও থাকবে এ দাঁড়ি-পাল্লায়।

মোতাজিলা, খাবেজিয়া, মারজিয়া সম্প্রদায় দাঁড়ি-পাল্লার এ ওজনকে স্বীকার করে না। তারা ঐ গ্রন্থে বর্ণিত অর্থাৎ **'আমলনামা'**–কেই -নিক্তি বা **'মিজানে -আদল'** বলে। কিন্তু কোরআনে এ দুটোই আমরা দেখতে পাই। 'কর্মফল' বা আমলনামার কথা পূর্বে বর্ণিত সূরা সমূহে উল্লেখ করেছে। এবারে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজনের কথা কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

টীকা ঃ১ । কোরআন। সূরা কেয়ামাহ। আয়াত–১৪-১৫।

"অতঃপর যাহার ওজন ভারি হইবে; ফলতঃ সে আনন্দময় জীবনে অবস্থান করিবে; অনন্তর যাহার ওজন লঘু হইবে; ফলতঃ তাহার অবস্থিতি হাবিয়া এবং তুমি কি জান যে, হাবিয়া কি? উহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"[১] (১০২ ঃ ৬-১০)

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও দাঁড়ি-পাল্লার ওজন সম্বন্ধে সাক্ষী দিয়েছেন এই ভাবে ঃ–

"শেষ বিচার দিবসে যখন দাঁড়ি-পাল্লায় কর্মফল (আমলনামা) ওজন করা হইবে, তখন বিসমিল্লার বরকতে ও মহত্বে **নেকীর পাল্লা ভারী হইবে।**[২]

(৫) "এবং তোমরা সেই দিবসকে ভয় কর যে দিন কোন ব্যক্তি হইতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইবে না ও কাহারো নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কাহারো অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না এবং তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।"[৩] (২ ঃ ১২৩)

(৬) "অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, তৎপরে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে নরকের চতুষ্পার্শ্বে নতজানু অবস্থায় উপস্থাপিত করিব। তৎপর নিশ্চয় আমি তাহাকে প্রত্যেক শ্রেণী হইতে বহির্গত করিব–যে সর্ব প্রদাতার প্রতি অধিকতর বিরুদ্ধাচরণকারী। অতঃপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত আছি–যে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার অধিকরত উপযুক্ত এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে উহার দিক হইতে অতিক্রান্ত না হইবে, ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য নির্দেশ। অনন্তর যাহারা ধর্মভীরু আমি তাহাদিগকে প্রমুক্ত করিব এবং আমি অত্যাচারীদিগকে তন্মধ্যে নতজানু অবস্থায় পরিত্যাগ করিব এবং যখন তাহাদের মধ্যে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী পঠিত হয়, তখন অবিশ্বাসকারীরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগকে বলে–আমাদের দুই দলের মধ্যে কে অবস্থানে উৎকৃষ্টতর এবং সৎসর্গে শ্রেষ্ঠতর।[৪] (১৯ ঃ ৬৮-৭৩)

উপরে বর্ণিত (৬) সূরা মরিয়ম হতে দেখা যায় যে বিচার দিনে কোন জাতির কোন মানুষই পরিত্রাণ পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ না হয়। সবাইকে নরকের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় অবস্থান করতে হবে। এরপর আল্লাহ প্রত্যেক জাতির মধ্য হতে যারা অত্যাচারী, অবিশ্বাসী, ব্যভিচারী, দুরাচারী তাদের বেছে নিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেবেন। কেউ সাহায্যকারী থাকবে না। কোন উপাস্যও এগিয়ে আসবে না। নিজেকে দোজখের অগ্নি ও ভয়াবহ তর্জন গর্জনের হাত থেকে পরিত্রান পাবার চিন্তায় পাগল হয়ে পড়বে।

উপরে বর্ণিত বাণী পাঠ করে বিশ্বাসীদের মনেও একটি ভীতির সঞ্চার হচ্ছে যে দোজখের চতুর্দিকে সবাইকে নতজানু হয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিচার শেষ না হয়।

সূরা আম্বিয়ার নিম্নোক্ত বাণী বিশ্বাসীদের জন্য এ ভীতির অবসান করেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুখ ও শান্তির। দোজখ বা নরকের ভয়াবহ রূপ ও কঠিন গর্জনের কিছুই অনুভব করবে না।

টীকা ঃ১ । কোরআন। সূরা কারেয়া। আয়াত –৬-১০।
২ । গুনিবাতুত-তালেবীন–কৃত বড়পরি হযরত আবদুল কাদের জিলানী। ২য় খণ্ড পৃঃ নং ৩।
৩ । কোরআন। সূরা বাকারা। আয়াত–১২৩।
৪ । কোরআন। সূরা মরিয়ম। আয়াত –৬৮-৭৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৭) "নিশ্চয় আমা হইতে যাহাদের জন্য কল্যাণ অগ্রবর্তী হইয়াছে তাহারাই উহা হইতে দূরে থাকিবে। তন্মধ্যে উহারা ক্ষীণ স্বরও শ্রবণ করিবে না এবং তাহাদের অন্তর যাহা আকাঙ্ক্ষা করিত তাহাতেই তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে। সেই মহাতঙ্কে তাহারা বিষণ্ণ হইবে না এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে ইহাই তোমাদের সেই সুদিন যদ্বিষয়ে তোমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে।"[১]

(২১ ঃ ১০১-১০৩)

বিচার দিবস

(বাইবেলের মতে)

তৌরাত–দ্বিতীয় বিবরণ। ৩২/৩৫-৩৯

ঈশ্বর বলেন ঃ

(৩৫) "প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কর্ম, –যে সময়ে তাহাদের পা পিছলাইয়া যাইবে; কেন না তাহাদের বিপদের দিন নিকটবর্তী, তাহাদের জন্য যাহা-যাহা নিরূপিত শীঘ্রই আসিবে।

(৩৬) কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার করিবেন, আপন দাসদের ওপর সদয় হইবেন; যেহেতু তিনি দেখিবেন, তাহাদের শক্তি গিয়াছে; বদ্ধ কি মুক্ত কেহই নাই।

(৩৭) তিনি বলিবেন কোথায় তাহাদের দেবগণ, কোথায় সেই শৈল, যাহার শরণ লইয়াছিল।

(৩৮) যাহা তাহাদের বলির মেদ ভোজন করিত, তাহারাই উঠিয়া তোমাদের সাহায্য করুক; তাহারাই তোমাদের আশ্রয় হউক।

(৩৯) এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি, আমি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; আমিই বধ করি, আমিই সঞ্জীব করি; আমি আঘাত করিয়াছি, আমিই সুস্থ করি; আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই।"

ইয়োব পরিচ্ছেদ

১৯/২৯ "তোরমা খড়্গ হইতে ভীত হও কেননা খড়্গের দণ্ড ক্রোধময়। বিচার আছে ইহা তোমাদের জানা উচিত।"

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা আম্বিয়া। আয়াত–১০১-১০৩।

যিশাইয়

৫/১৮-১৯ "লোকদের কার্য যেমন তদানুসারেই তিনি প্রতিফল দিবেন; আপন বিপক্ষদিগকে ক্রোধরূপ, আপ শত্রুদিগকে প্রতিশোধরূপ দণ্ড দিবেন; উপকূল সকলকে অপকারের প্রতিফল দিবেন।"

উপদেশক–উপসংহার–১২/১৩

(১৩) "আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করি। ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর; কেননা ইহাই সকল মানুষের কর্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক কি মন্দ হউক সমস্ত গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন।"

উপদেশক–পরিচ্ছেদ

(৯/১২ এবং ৭/২৫-২৮)

(১২) "বাস্তবিক মনুষ্যও আপনার কাল জানে না; যেমন মৎস্যগণ অশুভ জালে ধৃত হয় কিংবা যেমন পক্ষীগণ ফাঁদে ধৃত হয় তেমনি মনুষ্য সন্তানেরা অশুভ কালে ধরা পড়ে তাহাও হঠাৎ তাহাদের ওপর পড়িয়া থাকে।"

উপদেশক-প্রজ্ঞার অন্বেষণ

(৭-২৫-২৮)

৭/২৫-২৮ "আমি ফিরিলাম ও মনোনিবেশ করিলাম যেন জানিতে ও অনুসন্ধান করিতে পারি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারি যে দুষ্ট হীনবুদ্ধিতা মাত্র, আর অজ্ঞানতা ক্ষিপ্রতা মাত্র। তাহাতে মৃত অপেক্ষাও তীব্র পদার্থ পাইলাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোক–যাহার অন্তঃকরণ ফাঁদ ও জাল ও হস্ত শৃঙ্খল স্বরূপ। যে বক্তি ঈশ্বরের প্রীতিজনক সে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে; কিন্তু পাপী তাহার দ্বারা ধৃত হইবে। উপদেশক কহিতেছেন–দেখ তত্ত্ব পাইবার জন্য একটির পরে আর একটি বিবেচনা করিয়া আমি ইহা পাইয়াছি। আমার মন এখনও যাহার অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে তাহা আমি পাই না। সহস্রের মধ্যে এক পুরুষকে পাইয়াছি কিন্তু সেই সকলের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককেও পাই নাই।"

উপদেশক

৩/১৭ "ঈশ্বরই ধার্মিকের ও দুষ্টের বিচার করিবেন, কেননা সেখানে সমস্ত ব্যাপারের নিমিত্ত এং সমস্ত কর্মের নিমিত্ত বিশেষ কাল আছে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

গীত সংহিতা

(৯৬/১০-১৩)

৯৬.১০) "জাতিগণের মধ্যে বল, সদাপ্রভু রাজত্ব করেন:
জগৎও অটল, তাহা বিচলিত হইবে না;[১]
১১) আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক,
পৃথিবী উল্লসিত হউক;
সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থিত সকলই গর্জন করুক;
১২) ক্ষেত্র ও তথাকার সকলই উল্লসিত হউক
তখন বনের সমস্ত বৃক্ষ আনন্দে গান করিবে;
১৩) সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করিব;
কেননা তিনি আসিতেছেন;
তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন ;
-তিনি ধর্মশীলতায় পৃথিবীর বিচার করিবেন,
আপন বিশ্বস্ততায় জাতিগণের বিচার করিবেন।"

আরোহণ গীত

(১২৫/৫-৬ এবং ১২৮/১-৪)

১২৫/৫) "যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে;
তাহারা আনন্দ গান সহ শস্য কাটিবে।
৬) যে ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে বপনীয়
বীজ লইয়া বাহিরে যায়-সে আনন্দগান
সহ আপন আঁটি লইয়া আসিবেই আসিবে।
১২৮/১) ধন্য সেইজন যে সদাপ্রভুকে ভয় করে
সে তাহার সকল পথে চলে;
২) বাস্তবিক তুমি স্বহস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে
তুমি ধন্য হইবে ও তোমার মঙ্গল হইবে।
৩) তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী
ফলবতী দ্রাক্ষা লতার ন্যায় হইবে;
তোমার মেঝের চারিদিকে তোমার সন্তানগণ
জিত বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে।
৪) দেখ যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে
সেই ঐ রূপই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"

১ টীকা ঃ ১ । পৃথিবী স্থির-নড়চড় করে না, বিচলিত হয় না, সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে না। গীত সংহীতার ১০৪/৫ নং বাক্যেও এ কথাই বলা হয়েছে। এছাড়া হিতোপদেশ ১৬/৩০ নং বর্ণিত হয়েছে। আমার রচিত-'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'-পুস্তকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে-কোরআন-হাদিস, বেদ-বাইবেল,জিন্দা-বেস্তা-উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এছাড়া এর মধ্যে রয়েছে-বিজ্ঞানের প্রমাণ, ভৌগোলিক প্রমাণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রমাণ। পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি বইখানি পড়তে।

নহম –ভাববাদীর পুস্তক

(১/২-৩)

[আপন শত্রুদের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার]

১/২) "সদাপ্রভু সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; তিনি প্রতিফলদাতা; সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা ও ক্রোধশালী; সদাপ্রভু আপন বিপক্ষগণকে প্রতিফল দেন, আপন শত্রুগণের জন্য ক্রোধ সঞ্চয় করেন।

সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান এবং তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন; ঘূর্ণীবায়ু ও ঝড় সদাপ্রভুর পথ। মেঘ তাহার পদধূলি।"

সফনীয়

(৩/৮-৯)

৩/৮) সদাপ্রভু কহেন তোমরা সেইদিন পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় থাক-যেদিন আমি হরণ করিতে উঠিব; কেননা আমার বিচার এই। আমি জাতিগণকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর আমার ক্রোধ, আমার সমস্ত কোপাগ্নি ঢালিয়া দিব; বস্তুতঃ আমার অন্তর জ্বালার তাপে সমস্ত পৃথিবী অগ্নি ভক্ষিত হইবে।

৯) আর তৎকালে আমি জাতিগণকে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ দিব, যেন তাহারা সকলেই মহাপ্রভুর নামে ডাকে ও একযোগে তাঁহার আরাধনা করে।

মথি

(১৯/২৩-২৬)

(ইঞ্জিল-নতুন বাইবেল)

১৯/২৩) যীশু বলিতেছেন শিষ্যদের ঃ

"তখন যীশু তাহার শিষ্যদের বলিলেন-আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি ধনী লোকদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর হইবে।"

২৪-২৫) তোমাদের আবার বলি-স্বর্গরাজ্যে ধনীর প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্রপথে উটের যাওয়া সহজ। ইহা শুনিয়া শিষ্যরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন-তাহা হইলে কে পরিত্রান পাইতে পারে?

২৬) যীশু তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সমস্তই সাধ্য।"

বিচার দিবসে নবীদের প্রার্থনা

এবার আসুন আমরা বিচার দিবসে এই পতিশ্রুতিবদ্ধ নবীদের কার্যবিধি দেখি ঃ

হযরত ইব্রাহিম

(১) হোযাইফা হতে বর্ণিত -রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন ঃ

"বিচার দিবসে 'হযরত ইব্রাহিম (আঃ)'-আল্লাহর নিকট অভিযোগ করে বলবেন—'ইয়া এলাহী! আদম সন্তানদের তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছ।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্ তাঁর মনোভাব বুঝে তাঁর প্রার্থনা কবুল করে বলবেন-'যে মানুষের অন্তঃকরণে একটি গম বা যবের দানা পরিমাণ ঈমানও আছে আমি ক্ষমা করিলাম তাহাকে।":

হযরত আদম

(২) আবু সাইদ খুদবী (রাঃ) হতে বর্ণিত -রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন ঃ

মঙ্গলময় ও উন্নত খোদা বলবেন-'হে আদম'! আদম বলবেন-'হাজির আছি তোমার খেদমতে ও আদেশ পালনে এবং তোমারই হাতে সব কল্যাণ।'

খোদা বলবেন,-'বাহির কর দোজখের ফৌজ।'

তিনি বলবেন-কি পরিমাণ দোজখের ফৌজ?

খোদা বলবেন-'প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন।' (ইহা শুনিয়া লোক তেমনি ভয় পাইবে) বালক বৃদ্ধ হইবে, গাভী নিক্ষেপ করিবে গর্ভ এবং তুমি মানুষদের দেখিবে মাতাল যদিও তাহারা মাতাল নয়। খোদার শাস্তিই হইবে কঠিন।"

তাহরা বলিল-যে রসুলুল্লাহ্! আমাদের কে হইবে সেই একজন?

তিনি বলিলেন-'সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের মধ্যে হইবে একজন আর ইয়াজুজ ও মাজুজের হইবে এক হাজার।' তারপর বলিলেন-'কসম তাহার -যাহার হস্তে আমার জীবন। আমিও আশা করি, 'তোমরা হইবে বেহেশতবাসীদের এক চতুর্থ।' ইহা শুনিয়া আমরা তকবীর ধ্বনি করিলাম। তারপর তিনি বলিলেন-'তোমরা তো সমস্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে সাদা ষাড়ের গায়ে একটি কাল পশমের মত অথবা একটি কাল ষাড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত।"[১] (ক্ষুদ্র সংখ্যক)

উপরে বর্ণি হাদিসটিতে মতান্তর রয়েছে। কেননা এক হাজারের মধ্য হতে নয়শত নিরানব্বই জনকে দোজখ হতে বের করা হযরত আদমের কৃতিত্ব যেহেতু তিনি মানবজাতির আদি পিতা। সমগ্র মানব সন্তান তাঁরই বংশধর। এ কৃতিত্বের কথা শুনে বালকের বৃদ্ধ হওয়া, গাভীর গর্ভপাত করা, মানুষ সব মাতাল হওয়া ইত্যাদি যুক্তি বিরুদ্ধ। তর্জমাকারী এখানে বিরাট ভুল করেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম গাজ্জালী রচিত **'দাকায়েকুল আখবার'**-পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় জনাব আব্দুল জলিল উপরের হাদিসটি এইভাবে বলেছেন ঃ-

আল্লাহ্ হযরত আদমকে (আঃ) বলিলেন ঃ হে আদম উঠ এবং তোমার পাপী বংশধরকে দোজখে পাঠাও। আদম (আঃ) বলিবেন-প্রভু! প্রতি হাজারে কতজন পাঠাইব? হুকুম হইবে-নয়শত নিরানব্বই জন। অবশিষ্ট একজনকে বেহেশতে পাঠাও।

এই কথা সাহাবীদের নিকট অতি কঠিন বলিয়া মনে হইল। সুতরাং তাঁহারা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (ওপরের কথাগুলো যুক্তিযুক্ত)

হুজুর (দঃ) আল্লাহ্র নিকট আরজ করিয়া বলিবেন-"আমি আশান্বিত যে তোমাদের এক-চতুর্থাংশ বেহেশতী হইবে। পুনরায় বলিলেন-"আমি আশাবাদী যে তোমাদের অর্ধাংশ বেহেশতী হইবে। এ কথায় সাহাবীদের মুখের বিষণ্ণতা কাটিয়া গেল।"

টীকা ঃ ১। হাদিস। সংগৃহীত-গুনিবাতুত তালেবীন-কৃত বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী। বঙ্গানুবাদ-নুরুল আলম রইসী। ১ম খণ্ড, পৃঃ নং ১৭২।

টীকা ঃ ১ । সহীহ্ বুখারী-(তজরীদ) -২য় খণ্ড। হাঃ নং ৫৮/২২৯ সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ।

হযরত ঈসার প্রার্থনা

[কোরআনের মতে]

বিচার দিবসে আল্লাহ্ প্রতিটি নবীকেই একত্রিত করিবেন এবং তাদের উম্মতদের সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার অনুমতি দেবেন। তাঁরা জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্র বাণী পৌছে দেবার পর লোকেরা তা বিশ্বাস করে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল না, অবিশ্বাস করে নবীদের অপমান করেছিল—? এ কথা জানতে চাইবেন। তখন তাহারা বলিলেন ঃ—

"হে আল্লাহ্! তাহারা কে কতজন কি পরিমাণে তোমার আদেশ প্রতিপালন করেছিল,—কে উহা কিরূপে গ্রহণ করেছিল তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বরং নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"

কোরআন উপরে বর্ণিত কথাগুলোর সাক্ষ্যদান কর এই বলে :—

"যেদিন আল্লাহ্ রসুলগণকে একত্রিত করিবার পর বলিবেন-তোমাদিগকে কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল? তাহারা বলিবে-আমরা অবগত নই। নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[১] (৫ ঃ ১০৯)

বিচার দিবসে হযরত ঈসাকে (যীশুখ্রীষ্টকে) আল্লাহ্ যখন জিজ্ঞাসা করবেন-

"হে মরিয়ম -নন্দন ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে-আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে দুই উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে-তুমি পরম পবিত্র। আমার কি হইয়াছে যে যাহাতে আমার অধিকার নাই আমি তাহাই বলিব? যদি আমি তাহাদিগকে বলিয়া থাকি তবে নিশ্চয়ই তুমি তাহা অবগত আছ; আমার অন্তরে যাহা আছে তাহা তুমি জান এবং তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। আমি তাহাদিগকে এতদ্ব্যতীত বলি নাই যাহা তুমি আমাকে আদেশ করিয়াছিলে যে- **আমার প্রতিপালক আল্লাহ্রই** আরাধনা কর। এবং আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করা পর্যন্ত তহাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অনন্তর যখন তুমি আমাকে লোকান্তরিত করিলে তখন তুমিই তাহাদের ওপর লক্ষ্যকারী ছিলে। এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর তবু তাহারা তোমারই দাস এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। আল্লাহ্ বলিবেন -অদ্যকার দিবসে সত্যপরায়ণগণ তাহাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান যাহার নিচে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা ও তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট। ইহাই মহান সফলতা। আল্লাহ্র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থিত বিষয়ের আধিপত্য এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (৫ ঃ ১১৬-১২০)

১ টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা মায়েদা । আয়াত ১০৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাইবেলের মতে (ইঞ্জিল)

মথি পরিচ্ছেদ ২৫/৩১-৪৬

বিচার দিনের বিষয়ে উপমা ও শিক্ষা।

২৫/(৩১) "যখন 'মনুষ্যপুত্র'-সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন তখন তিনি আপন গৌরব সিংহাসনে বসিবেন;

(৩২) আর সমস্ত জাতিকে-তাঁহার সম্মুখে একত্র করা হইবে। পরে মেষপালক যেমন ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে, তেমনি তিনি তাহাদের দুই ভাগে পৃথক করিবেন।

(৩৩) আর তিনি মেষদের আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে ও ছাগদের আপনার বাম পার্শ্বে রাখিবেন।[১]

(৩৪) তখন 'রাজা'-তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদের বলিবেন-'এস আমার পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্তেরা'-জগৎ সৃষ্টি হইতে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অধিকারী হও।

(৩৫) কারণ আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে খাইতে দিলে, আমি তৃষিত হইলে আমাকে পান করিতে দিলে, আমি অতিথি হইলে আমাকে আশ্রয় দিলে।

(৩৬) আমি বস্ত্রহীন হইলে আমাকে বস্ত্র পরাইলে; আমি অসুস্থ হইলে আমার তত্ত্বাবধান করিলে; আমি কারারুদ্ধ হইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে।

(৩৭) তখন ধার্মিকেরা তাহাকে উত্তরে বলিবে-প্রভু, কখন আপনাকে ক্ষুধিত হইলে খাইতে দিলাম কিংবা তৃষিত হইলে পান করিতে দিলাম।

(৩৮) কখনই বা অতিথি দেখিয়া আপনাকে আশ্রয় দিলাম।

(৩৯) কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া আপনাকে বস্ত্র পরাইলাম। কখন বা আপনাকে অসুস্থ কিংবা কারারুদ্ধ দেখিয়া আপনার কাছে আসিলাম?

(৪০) আর উত্তরে 'রাজা' তাহাদের বলিবেন-আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি-আমার এই ভ্রাতাদের ক্ষুদ্রতম একজনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছ-তখন তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ?

(৪১) তখন তিনি বাম পার্শ্বের লোকদের বলিবেন-'অভিশাপের পাত্রেরা আমার নিকট হইতে দূর হও। দিয়াবল (শয়তান) ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাও।

(৪২) কারণ আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে খাইতে দাও নাই।

(৪৩) আমি অতিথি হইলে আমাকে আশ্রয় দাও নাই। আমি বস্ত্রহীন হইলে আমাকে বস্ত্র পরাও নাই। আমি অসুস্থ ও কারারুদ্ধ হইলে আমার তত্ত্বাবধান কর নাই।

(৪৪) তখন উত্তরে তাহারাও বলিবে-'প্রভু কখনও আপনাকে ক্ষুধিত, কি তৃষিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি অসুস্থ, কি কারারুদ্ধ দেখিয়া আপনার সেবা করি নাই?'

(৪৫) আর তিনি উত্তরে তাহাদের বলিবেন-আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি-এই ক্ষুদ্রতমের একজনের প্রতি যখন ইহা কর নাই তখন তাহা আমারই প্রতি কর নাই।

১ টীকা ঃ ১। কোরআন। সূরা মায়েদা। আয়াত-১১৬-১২০।

(৪৬) পরে ইহারা অনন্ত শাস্তির উদ্দেশ্যে কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে চলিয়া যাইবে।"

উপরে বর্ণিত 'নতুন বাইবেল-অর্থাৎ ইঞ্জিল'-হতে হযরত ঈসার (যীশুখ্রীষ্টের) কার্যাবলী ও বাণী দেখে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় জাগল।

প্রথমত ঃ যীশুখ্রীষ্টকে 'মনুষ্য পুত্র'[১] বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি তো কোন মানবের দ্বারা অর্থাৎ কোন পিতার ঔরষে জন্মলাভ করেন নি। তারাই বলে থাকেন 'খোদার বেটা।' কোন কোন স্থলে 'প্রভু'-'খোদা'-বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে আবার 'মনুষ্য পুত্র'-বলা হলো কেন? হযরত 'মরিয়ম'-এর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন খোদার আদেশে। এ হিসাবে 'মনুষ্য পুত্র'-বলা যেতে পারে কিন্তু খোদার বেটা বা প্রভু বলা হয় কেন?

দ্বিতীয়ত ঃ 'তিনি আপন গৌরবে সিংহাসনে বসিবেন'-এ বাক্যটির মধ্যেও সন্দেহে নিপতিত হলাম। কেননা বিচার দিনে একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকার আপন গৌরবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে। অন্য কারো নয়। বিচারক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌। কোরআনের বাণী হতে (যা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে কোরআনের মতে পরিচ্ছেদে) দেখছি যীশুখ্রীষ্ট করজোড়ে প্রার্থনা করছেন এই বলে ঃ-যদি তুমি শাস্তি প্রদান কর তবু তাহারা তোমারই দাস এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি নিশ্চয়ই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (সূরা মায়েদা পূর্বে উদ্ধৃত)

সমগ্র জাতিকে উপস্থিত হতে হবে নতজানু হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে-যীশুখ্রীষ্টের সম্মুখে নয় একথা আমরা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই পাই। পূর্ব পরিচ্ছেদে কোরআন-পুরাতন বাইবেল (তৌরাত) এবং নতুন বাইবেল (ইঞ্জিল) হতে উদ্ধৃত করেছি। নবী-পয়গম্বরদেরকেও একত্রিত করা হবে ঐ বিচারকেরই সম্মুখে।

কোরআন একথাও সাক্ষ্য দেয় এই বলে ঃ

"ওয়া বারাজু লিল্লাহে জামিয়ান"[২] (১৪ ঃ ২১)

অর্থাঃ ঃ "এবং সকলকেই আল্লাহর সম্মুখীন হইতে হইবে।"

নবী-পয়গম্বরদের নির্দেশ দেওয়া হবে তাদের নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করতে। সমস্ত ধর্মের সমস্ত মানবই আল্লাহর দাস। আল্লাহই একমাত্র প্রতিফল ও প্রতিশোধ দাতা। একথা আল্লাহর বাণী হতেই দেখতে পাই। বাইবেলের বাণীসমূহ এব প্রমাণ যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কোরআন ও পুরাতন বাইবেলের (তৌরাত) বাণীসমূহ কি মিথ্যা? এ বাণীসমূহ কি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে নি যে মহাবিচার দিনে একমাত্র আল্লাহরই অধিকার? তাই যীশুখ্রীষ্ট (হযরত ঈসা (আঃ)) বিচার দিবসে সগৌরবে আসন গ্রহন করবেন এবং সমস্ত জাতির বিচার করবেন একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। কেননা কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঐ বিচার দিবস সম্বন্ধে ঃ

১ টীকা ঃ ১। নতুন বাইবেলে অনেক স্থলে যীশুখ্রীষ্টকে 'মনুষ্য পুত্র' বলা হয়েছে। যেমনঃ-"তাহারা 'মনুষ্য পুত্রকে' আকাশের মেঘযোগে পরাক্রম ও মহাযৌরবের সহিত আসিতে দেখিবে।" [লক /২৭/২৮]

২। কোরআন। সূরা ইব্রাহিম। আয়াত -২১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং সেই দিবসের ভয় কর–যে দিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে কিছুমাত্র উপকৃত হইবে না এবং তাহা হইতে কোন অনুরোধ গৃহীত হইবে না।

এবং তাহা হইতে বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।"[১] (২ ঃ ৪৮)

অবশ্য যদিও উপরের পবিত্র বাণীসমূহ প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য তবুও ঐ বিচার দিবসে নবী-পয়গম্বরদের প্রার্থনা ও সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করবেন একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হযরত আদম (আঃ), হযরত ইব্রাহিত (আঃ) প্রতি নবীদের বিচার দিনের কার্যাবলী দেখে। তাঁদের জন্য যে বিশেষত্ব রয়েছে একথা আমরা জানতে পাই আল্লাহরই প্রতিশ্রুতিতে ঃ

"এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে বিশেষত্বপ্রদান করেন। এবং আল্লাহ মহান কল্যাণের অধিকারী।"[২] (২ ঃ ১০৫)

"এবং যখন রসুলগণের জন্য সময় নির্ধারিত হইবে।"[৩] (৭৭ ঃ ১১)

তৃতীয়ত ঃ "যখন 'মনুষ্যপুত্র' সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন তখন তিনি আপন গৌরব সিংহাসনে বসিবেন"–এ কথাগুলোর মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে। কেননা বিচার দিনে 'সমুদয় দূত' অর্থাৎ ফেরেস্তারা আল্লাহরই আদেশ মাত্র পালন করবে অন্য কোন নবী বা পয়গম্বরদের নয়। আল্লাহর বাণী হতে একথা আমরা জানতে পাই ঃ

"সেদিন কোন ব্যক্তির ওপর কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না; এবং সেদিন একমাত্র আল্লাহরই আদেশ হইবে।"[৪] (৮২ ঃ ১৯)

উপরে বর্ণিত বাণী হতে আমরা দেখতে পাই যে সেই মহাসঙ্কটের দিনে কোন ব্যক্তিরই কোন অধিকার বা আধিপত্য থাকবে না। কেউ কারো সাহায্যে এসে উপকার করতে পারবে না। ক্ষতি করার সাধ্যও কারো জুটবে না হিংসা বা জেদের বশে। আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন প্রার্থনা বা অনুরোধ করবার শক্তিও কারো হবে না।

তাই হযরত ঈসার (আঃ) পক্ষে সগৌরবে সিংহাসনে বসে সমুদয় দূতের অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে বিচার করবেন একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা আল্লাহর বাণীর সম্পূর্ণ উল্টা। কেননা কোরআনে বলা হয়েছে "এবং তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ দলে দলে আগমন করিবেন।"A*

চতুর্থত ঃ 'তখন রাজা তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের'[১] লোকদের বলিবেন–এস, আমার পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্তরা জগৎ সৃষ্টি হইতে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অধিকারী হও।'–এ কথাগুলোর মধ্যেও রয়েছে সন্দেহের চরম অবকাশ (আমার মতে)। কেননা

---

১ টীকা ঃ১ । কোরআন। সূরা বকর। আয়াত-৪৮।

২ । কোরআন সূরা বকর আয়াত –১০৫।

৩ । " " মোরছালাত " – ১১।

৪ । " " এনফেতার " –১৯।

A । কোরআন। সূরা ফজর (৮৯ ঃ ২২) আয়াত ২২

১ । সূরা ওয়াকেয়া ৮ ও ৯ নং আয়াতে দক্ষিণ পাশের ও বামপাশের সঙ্গীদলের কথা বলা হয়েছে এবং বিচারে তাদের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং এর প্রতিফলদাতা। অন্য কেউ নয়।

এখান থেকে দেখা যায় যে বিচার দিবস যীশুখ্রীষ্টকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়েছে **'নতুন বাইবেল'** অনুযায়ী। এ বাক্যসমূহও পূর্বে উদ্ধৃত **'পুরাতন বাইবেল'**-এর দ্বিতীয় বিবরণ-এর পরিপন্থী। কেননা সেখানে বলা হয়েছে ঃ

ঈশ্বর বলেন ঃ "প্রতিশোধ ও প্রতিদান আমারই কর্ম–যে সময়ে তাহাদের পা পিছলাইয়া যাইবে।" (৩২/৩৫)

কোরআনের বাণীর সঙ্গে তৌরাতের অর্থাৎ পুরাতন বাইবেলের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

(১) "সতর্ক হও! নিশ্চয় অত্যাচারীরা স্থায়ী শস্তির মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কোনই অবিভাবক নাই এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন ফলতঃ তাহার জন্য কোনই পন্থা নাই।"[২] (৪২ ঃ ৪৪–৪৫)

(২) "সেদিন কোন ব্যক্তির ওপর কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না; এবং সেদিন একমাত্র আল্লাহরই আদেশ হইবে।"[৩] (৮২:১৯)

পঞ্চমত: ৩৫ হতে ৪৬ নং বাণীসমূহের মধ্যে দেখা যায় 'রাজা' অর্থাৎ বিচারক দক্ষিণ পাশের ও বামপাশের মনুষ্যদের কার্য বিচার করে স্বর্গ ও নরকে প্রবেশ করার নির্দেশ দিবেন। তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কি কোন কার্য নেই? 'রাজা' অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের নির্দেশেই সব বিচার কার্য সম্পন্ন হবে। এ ধারণাটাও পুরাতম বাইবেল অর্থাৎ তৌরাতের পবিত্র বাণীর সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নেই। কেননা সেখানে বলা হয়েছে:-

"ঈশ্বরই ধার্মিকের ও দুষ্টের বিচার করিবেন; কেননা সেখানে সমস্ত ব্যাপারের নিমিত্ত এবং সমস্ত কর্মের নিমিত্ত বিশেষ কাল আছে।"[১]

কোরআনে বলা হয়েছে:–

"সেদিন লোকসকল পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে; যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কৃত কর্মসমূহ প্রদর্শন করা হইবে। অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে। এবং যে পরমাণু পরিমাণ দুষ্কার্য করিবে সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে।"[২] (৯৯ ঃ ৬-৭)

ক্ষুধিতদের ভোজ্যদান, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান, তৃষ্ণার্তদের জল দান, অতিথিদের আশ্রয় দান, অসুস্থ ও কারারুদ্ধদের সহানুভূতি দান–স্বর্গে যাবার সম্বল সমস্ত জাতির, সমস্ত মানুষের। যারা এসব কর্ম দুনিয়াতে করে থাকে তাদের সহজ হিসাবে হিসাব নেওয়া হবে এবং বেহেস্ত বা স্বর্গে যাবার অনুমতি পাবে–সেই মহাবিচারক সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে কোন পয়গম্বর বা উপাস্যের নিকট হতে নয়।

তাই যীশুখ্রীষ্টের অর্থাৎ হযরত ঈসার (আঃ) এ বাণী তাঁর মুখ নিঃসৃত কিনা এ নিয়েও প্রচুর সন্দেহ জাগছে। কোরআনে উদ্ধৃত যীশুখ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে এ বাণীর মিল নেই। পুরাতম বাইবেলের মহাবাণীর সঙ্গেও সম্পূর্ণই গরমিল। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

---

২ । কোরআন। সূরা শুরা। আয়াত – ৪৪ – ৪৫

৩। কোরআন। সূরা শুরা। এনফেতার – ৪৪ –১৯

টীকা : ১ । তৌরাত। উপদেশক পরিচ্ছেদ। ৩/২১৭

২ । কোরআন। সূরা জেলজাল। আয়াত–৬-৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এমন কে আছে যে তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতে পারে?" (২ ঃ ২৫৫)

সৃষ্টিকর্তার এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থেকে বুঝা যায় যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন নবী-পয়গম্বরেরই কোন সুপারিশ, অনুরোধ বা কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ থাকবে না। সেখানে হযরত ঈসা (আ) 'রাজা' হয়ে সৎ-অসৎ মানুষের বিচার করবেন এটা বিশ্বাস করার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা–নাস্তিকের সিলমোহর কপালে নিয়ে বাহাদুরী করা। দেখুন, মানব জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ) মৃত্যুকালীন সময়ে ভীতির অন্তরে কি প্রার্থনা করেছে ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক–তুমি হিসাব প্রতিষ্ঠার দিবসে আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসীবৃন্দকে মার্জনা করিও।"[৩] (১৪ ঃ ৪১)

কোরআন হতে অনুরূপ প্রার্থনা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট হতেও দেখতে পাচ্ছি ঃ

"হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দেশাধিপত্য দান করিয়াছ এবং বাক্যাবলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিক্ষা দিয়েছ; যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মূল স্রষ্টা, তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের সংরক্ষক (আনতা ওয়ালি ফি দুনিয়া ওয়াল আখেরাত)। তুমি আমাকে মুসলমানরূপে মৃত্যুদান করিও এবং সৎকর্মশীলগণের সহিত সম্মিলিত করিও।"[১] (১২ ঃ ১০১)

হযরত ইব্রাহিমকে মানব জাতির পিতা বলা হয়। শুধু মুসলমানই নয়–ইহুদি, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির মতেও তিনি মানব জাতির পিতা। এর প্রমাণ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ (কোরআন-বাইবেল-বেদ)। সেই মহাবিচার দিনে তিনিও সিংহাসনে বসবেন না। বিচারক হয়ে স্বর্গ-নরকে যাবার নির্দেশ দিবেন না। উপরে বর্ণিত হযরত ইব্রহিমের প্রার্থনা হতে আমরা তাই দেখতে পাই। এ জন্যই আমাদের মনে দ্বন্দ্বের অবকাশ রয়েছে। খ্রীষ্টান ভাইদের ও ধর্মতত্ত্ববিদ পুরোহিতদের অনুরোধ করছি এ বাণীর বিশ্লেষণ করে প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে।

বিচার দিনে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং হযরত আদম (আঃ)-এর প্রার্থনা ও অভিযোগ থেকে দেখা যায় যে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। মানবের মুক্তির জন্য তাঁরা সুপারিশকারী ও অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী। তাঁদের বিনীত প্রার্থনার ফলেই আল্লাহ তাঁদের আদেশ দিবেন দোজখের ফৌজ বের করে আনতে এবং যব কণা পরিমান আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দোজখ হতে বে করে বেহেশতে প্রবেশ করাতে। কথাগুলো আমরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র বাণী হতেই পেয়েছি। কোন নবীর কৃতিত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি। কারো মর্যাদাকে খাটো করেন নি। বরং সম্মানিত আসনে বসিয়ে তাঁদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর মহানুভবতারই সাক্ষ্য দেয়।

চলুন, দেখি মহাবিচার দিবসে এ মহান নবীর কার্যবিধি কি? তিনি কি মহাপ্রতাপে সিংহাসনে বসবেন মানব জাতির বিচারের জন্য–না ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাপী-তাপী মানবগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য সেজদায় পড়ে সেই মহান বিচারকের করুণাপ্রার্থী হবেন? কোনটি?

৩। " " ইব্রাহিম " -৪১।
টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা ইউসুফ। আয়াত -১০১।

বিচার দিনে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

'উত্থান দিবস' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কবর হতে উত্থিত হয়ে সুসজ্জিত বোরাকে আরোহণ করবেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কি করবেন, এটা উল্লেখ করেন নি। তাই পাঠকবৃন্দ হয়ত ব্যাকুল হয়ে আছেন। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাই উকিল-মোক্তার ব্যারিস্টারের জেরায় মানুষের রূপ নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারছেন না। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, অন্তরজ্বালায় দেহ দাউ দাউ করে জ্বলছে, ক্ষুধার জ্বালায় পেটের নাড়ীভূড়ি ভস্মীভূত হচ্ছে তবুও কেউ সাহায্য নিয়ে আসছে না। এখানে মা নেই, রেডক্রসের সাহায্য নেই, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক পার্টির ফাঁকা আশ্বাসও নেই। দেখি কোন ভরসা আছে কিনা।

হযরত বোরাকে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তাঁর উম্মতদের কি অবস্থা! কোথায় তারা স্থান নিয়েছে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা মাথার ওপর। দাঁড়াবার জায়গা নেই। ছায়া দিবার তাঁবু নেই। আশ্রয় দেবার মানুষ নেই।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর আরশের নিচে গমন করবেন এবং সেজদায় রত হবেন। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ

"হে মুহাম্মদ। ওঠাও তোমার মস্তক; চাও দেওয়া হইবে তোমাকে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে তোমার সুপারিশ।"

তখন হযরত বলবেন ঃ

"প্রভু আমার! আমার উম্মত। আমার উম্মত।" তখন বলা হইবে–"যাও দোজখের দিকে এবং বাহির কর উহা হইতে যাহার অন্তরে আছে যবকণা পরিমাণ ঈমান। আমি যাইয়া তাহাই করিব। তারপর ফিরিয়া আসিয়া প্রশংসা করিব তাঁহার ঐ প্রশংসার বাণীযোগে এবং সেজদায় পড়িব তাহার সম্মুখে।"[১]

এভাবে উপর্যুপরি হযরত সেজদায় রত হবেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁকে দেওয়া প্রশংসা বাণীযোগে মিনতি জানাবেন। 'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)' পুস্তকে বিস্তারিতভাবে এ হাদিসটি তুলে ধরেছি। সেখান থেকে দেখতে পাবেন শেষ পর্যায়ে হযরত বলবেন ঃ

"প্রভু আমার! আমাকে অনুমতি দাও তাহাদের মধ্যে যাহারা বলিয়াছে–নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন–তাহাদের সম্বন্ধে সুপারিশ করতে।"

তখন তিনি বলিবেন–'কসম আমার ক্ষমতার ও আমার গৌরবের, আমার মাহাত্ম্যের ও মহিমার।'

আমি বাহির করিব দোজখ হইতে তাহাদের যাহারা বলিয়াছে 'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন।"[১]

যে কোন জাতির, যে কোন মানুষ যারা শুধু এ কথাই বলেছে –'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন'–তিনি তাদেরও মুক্ত করবেন দোজখের করাল গ্রাস থেকে। এ জন্যই তিনি সমগ্র মানুষের নবী–সমগ্র সম্প্রদায়ের নবী। সমগ্র জ্বীন ও ইনসানের নবী।

টীকা ঃ ১ । সহীহ বুখারী শরীফ (তজরীদ) বঙ্গানুবাদ–আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ৯/১০৪২
টীকা ঃ ১ । সহীহ বুখারী। কৃত ঐ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আদম হতে আরম্ভ করে কোন নবীরই এ ক্ষমতা হবে না সবাই তাঁরই পতাকা তলে সমবেত হবেন তাঁরই আশ্রয়ে ধন্য হবেন। একথা হযরতের মুখ-নিঃসৃত বাণী হতেই দেখতে পাই যা নিম্নরূপ ঃ

"রোজ কিয়ামতে আমি সমস্ত মানব সন্তানগণের নেতা হইব–এবং ইহার দ্বারা কোন গর্ব প্রকাশ করি না; এবং আমারই হস্তে প্রশংসা সূচক পতাকা থাকিবে এবং ইহা দ্বারা আমি গর্ব প্রকাশ করি না, সেই দিন আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পয়গম্বর আমারই পতাকা তলে সমবেত হইবেন এবং আমিই সর্বপ্রথমে কবর হইতে উত্থিত হইব এবং ইহা দ্বারা আমি কোন গর্ব প্রকাশ করি না।"[২]

অসীম ক্ষমতার অধিকারী হবেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ), অশেষ কল্যাণের অধিকারী হবেন তিনি। চরম খ্যাতি ও যশঃস্বীর অধিকারী হবেন তিনি। সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের নেতা হবেন তিনি। দুর্ভাগ্যবান মানবের ত্রানকর্তা হবেন তিনি–অন্য কেউ নন। আল্লাহর পবিত্র বাণীই এ কথার সাক্ষি দেয় ঃ

"ও-লা ছাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা।"[৩] (৯৩ ঃ ৫)

অর্থাৎ ঃ

'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ সম্পদ দান করিবে যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।'

উক্ত আয়াতের অর্থ বড় গভীর। এ আয়াত শুধু পরলৌকিক জীবনে রসুলুল্লার (দঃ) সন্তুষ্টি ও সুখ শান্তির কথা বলা হচ্ছে না। ইহলৌকিক অর্থাৎ এ পার্থিব জীবনেরও সফলতা, মর্যাদা ও সম্মান বুঝায়। কেননা সূরা দোহার প্রারম্ভেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

"দিবসের সাক্ষ্য এবং রজনীর যখন সমাচ্ছন্ন করে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং বিরূপও হন নাই। নিশ্চয়ই তোমার জন পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী অবস্থা কল্যাণকর।" (৯৩ ঃ ১-৪)

হযরতের প্রারম্ভিক জীবন বড় দুর্বিসহ ছিল। আপন দেশের আপন ব্যক্তিরা কেমন বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সে ইতিহাস সবারই জানা আছে। পুনরুক্তি করার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা যারা বিশ্বাসী, জ্ঞানী ও জ্ঞানপিপাসু তাঁরা এ মহান নবীর মহৎ জীবনের ছোট বড় বিশেষ করে প্রনিধানযোগ্য ঘটনার সঙ্গে পরিচিত। অমানুষিক অত্যাচার, অবিচার, কলুষিত চরিত্রের উক্তিই শুধু না–মুনাফেক ও শয়তান গোষ্ঠী তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করেছিল, পাথর মেরে পদযুগল ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, পাহাড়ের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন আটকে রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত জন্মস্থান কাবা থেকে বিতাড়িত করেছিল। ইসলাম প্রচারে শত শত বার বাধা দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। পবিত্র দন্ত মোবারক শহিদ করেছিল। বিষ প্রয়োগে হত্যার নির্মম জাল বুনেছিল। করে নি কি? এই অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হলে কার না মন ভেঙ্গে যায়। হয়ত বা রসুল (দঃ)-এর মনে এরূপ হতাশা ও উদ্বিগ্নতা জেগেছিল যার ফলে অবতীর্ণ হয়েছিল এ আশ্বাস বাণী–যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে।

এ বাণী অবতীর্ণ হবার মূলে যে কারন ছিল এতে বিভিন্ন তফসীর কারক বিভিন্ন মত

২। হাদিস-তিরমিজী। সংগৃহিত হাদিসের আলো।

৩। কোরআন সূরা দোহা। আয়াত-৫

প্রকাশ করেছেন। কারো মতে–'কতিপয় অবিশ্বাসী রসুলুল্লাহকে (দঃ) 'জুলকারনাইন' ও 'আসহাবে কাহাফ'-এর বৃত্তান্ত এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু হযরত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারেন নি। তাদের বলেছিলেন–'আমি আগামীকাল এ প্রশ্নের সর্বশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করব।' কিন্তু তিনি 'ইনশাহ্ আল্লাহ্' –শব্দটি এর সঙ্গে যোগ করেন নি। ফলে ৪০ দিন পর্যন্ত তাঁর ওপর অহি অর্থাৎ আল্লাহর বাণী নাজেল হয় নি। এ সুযোগে আবু জেহেল প্রমুখ কোরেশগণ বলে ঃ–

'তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে' এতে হযরত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

হাদিস শরীফ অনুযায়ী এ বিষয়ে আর একটি তত্ত্ব জানা যায়। সেটা নিম্নরূপ ঃ

একদা রসুলুল্লাহর (দঃ) একটি অঙ্গুলি প্রস্তরাঘাতে এরূপ আহত হয়েছিল যে উহার যন্ত্রণায় তিনি তিনদিন পর্যন্ত রাত্রিকালীন তাহাজ্জতের নামায পড়িতে পারেন নাই এবং এই সময় প্রচারকার্যও বন্ধ ছিল। ইহাতে দুর্মতি আবু জেহেলের উপযুক্ত স্ত্রী উম্মে জমিলা আসিয়া হযরতকে বলে ঃ "যে জ্বেন বা শয়তানটা আসিয়া তোমাকে শিক্ষা দেয় সে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" এই অসঙ্গত উক্তির জবাবেই আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হলো ঃ

"তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং বিরূপও হন নাই।"

যাহোক, হযরতের পূর্ববর্তী অবস্থা যে সুখের ছিল না একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। এখন চলুন, পরবর্তী অবস্থার কথা একবার দেখি।

হযরত জীবনে কোন কাজে ব্যর্থ হন নি। অসহ্য জ্বালা সহ্য করেছেন সত্যকথা কিন্তু কেউ কি তাঁর ওপর প্রাধান্য করতে পেরেছে? যে আবু জেহেল প্রধান শত্রু ছিল বদর যুদ্ধের সূচনাতেই সে নির্মম লজ্জাস্কর ভাবে সামান্য একটা বালকের হাতে নিহত হলো। অবিশ্বাসের স্বাদ, ক্ষমতার দাপট নিমিষেই ধূলিসাৎ হলো। আবু লাহাব, দুর্গন্ধযুক্ত, পচনশীল কাল রোগ অর্থাৎ বসন্তের নির্মম জ্বালায় এবং তার কলহীনি, কুটিলা, পরনিন্দাকারীনি অপবাদ দায়িনী, বিদ্বেষীণি স্ত্রী উম্মে জমিল কাঁটার বোঝা বহন করতে গিয়ে নিজেকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলেন। কি শাস্তি।[১]

জীবনের ছোট-বড় তিরাশীটা যুদ্ধে কোনটিতেই পরাজিত হননি। প্রতিটি যুদ্ধেই শত্রুকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন। যে মহান আদর্শে ব্রতী হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তা সফল হয়েছে। সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষপ্রান্তে আরোহণ করেছেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শাসন করেছেন। মজলুম জনতার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। জ্ঞানী-গুণী ও যোদ্ধার জন্ম দিয়েছেন। স্বজাতি-বিজাতির নিকট হতে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে প্রাণঢালা উপহার পেয়েছেন। বিশ্বের নিষ্পেষিত নারী জাতির মুক্তির পথ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আল্লাহর অমিয় বানী সারা দুনিয়ায় পৌছে

টীকা ঃ ১। কোরআন এর সাক্ষি দিচ্ছে এই বলে ঃ–

"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হউক এং সে বিনষ্ট হইবে। তাহার ধন-সম্পদ এবং সে যাহা উপার্জন করিয়াছে–তাহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে না। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট নরকানলে প্রবেশ করিবে। এবং তাহার কাষ্ঠ বহনকারিণী স্ত্রীও। তাহার গ্রীবাদেশে খোরমা বল্কলের রজ্জু রহিয়াছে।" (১১১ ঃ ১-৫)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়ে চির অমর হয়ে রয়েছেন। রাজা-মহারাজা, স্বজাতি-বিজাতি, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, দেশী-বিদেশী, নর-নারী,-এককথায় সমগ্র মানবের শ্রদ্ধা অর্জন করে এ ধরা হতে বিদায় নিয়েছেন। তাই পরবর্তী জীবন যে পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা কল্যাণকর তা এ পার্থিব জীবনেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হয়েছে তাঁর চিরসত্যের অমিয় বাণী। আর তা সংরক্ষিত হয়েছে অতি যত্ন সহকারে। যুগ যুগ ধরে চলেছে এবং চলবে এ নীতি। তাঁকে অমর এবং অক্ষয় করে রাখবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিশ্বের যত জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী। বিজাতীয়রাও আজ তারই নামে আনন্দমুখর ও ধন্য। এমন গৌরব কোন্ মহাপুরুষের ভাগ্যে জুটেছে? যতই দিন যাবে ততই আলোচিত হবে। ততই গুণগান প্রকাশ হবে এ মহানবীর। পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতেই চলবে তাঁর প্রতি প্রাণঢালা সম্মান ও শ্রদ্ধার অপূর্ব নিদর্শন।

পারলৌকিক কথা আমরা অনুমান করতে পারি না। ইচ্ছাকৃতভাবেও লিখতে পারি না। যে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে এত মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন-তাঁর মহাবাণী ধরেই আমরা আলোচনা করছি ও দেখছি কেমন গৌরব ও শক্তি নিয়ে তিনি রোজ হাশরে **'শাফায়াতকারী'** হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করবেন।

আল্লাহ্ বলেন:-

"ইয়াও মায়জেল্লা তান্-ফাউশ-শাফায়াতু ইল্লা মান্ আজিমা-লাহুর রাহমানু ওয়া রফিয়া লাহু কাওলান।"[১] (২০ ঃ ১০৯)

অর্থাৎ-"সেদিন সর্বপ্রদাতা যাহাকে আদেশ করিবেন এবং যাহার বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট তদ্ব্যতীত কাহারো অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না।"

(২) "যাহাকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট কাহারো অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না।"[২] (৩৪ ঃ ২৩)

(৩) "সেদিন আত্মা ও ফেরেশতাগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইবে তখন করুণাময় যাহাকে অনুমতি দান করিবেন এবং যে সুসঙ্গত কথা বলিবে-তদ্ব্যতীত কেহই বাক্য স্ফূরণ করিতে পারিবে না।"[৩] (৭৮ ঃ ৩৮)

(৪) "এবং আকাশে কত ফেরেশতা আছে-যাহাদের অনুরোধ কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।"[৪] (৫৩ ঃ ২৬)

উপরে উদ্ধৃত মহাবাণীসমূহ হতে দেখা যায় যে সেই মহাদুর্দিনে যখন মানুষ অসহায়, বিব্রত ও উন্মাদপ্রায় তখন মহান বিচারক আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট তাদের অনুরোধ রক্ষা করবেন। অন্য কারো নয়। কেউ তখন বাক্য স্ফূরণ করতে পারবে না। নিরাশা, হতাশা, দুরাশা ও ক্ষীণ আশায় তাকিয়ে রইবে সাহায্যের আশায়। চলুন, আমরা দেখি কোন সে মহান ব্যক্তিগণ যাদের পর আল্লাহ সন্তুষ্ট, যাদের অনুরোধ ফলপ্রদ হবে-যাদের শাফায়াতে অসহায় মানুষ মুক্তি পাবে।

টীকা-১। কোরআন। সূরা তা-হা। আয়াত-১০৯
২। ঐ। সূরা সাবা। আয়াত-২৩
৩। ঐ। সূরা নবা। আয়াত-৩৮
৪। ঐ সূরা নজম। আয়াত -২৬।

প্রতিটি নবী, প্রতিটি পয়গম্বরই আল্লাহর প্রিয়। তাদের কার্যপদ্ধতি, সুসঙ্গত আচরণ ও বাক্যেই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। এছাড়া তাঁদের অনুসরণকারীদের মধ্যেও এমন সব ওলি-গাউস, ঋষি-মহাঋষি ও মহাপুরুষ রয়েছেন যাঁদের ওপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। হিসাব নিকাশের দিন তাঁদের অনুরোধ ও প্রার্থনাই কবুল হবে। কেননা তাঁরা সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি পার্থিব জীবনে তাঁরা রক্ষা করছেন অক্ষরে অক্ষরে। অসীম কষ্ট বুকে নিয়ে। ঝড়-ঝাপটা মাথায় নিয়ে। জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে। ক্রুশের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। মাছের পেটে আশ্রয় নিয়ে। কুষ্ঠ ব্যাধিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে। সবারইত উদ্দেশ্য ছিল ঐ সৃষ্টিকর্তারই সন্তুষ্টি লাভ।

'সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'-কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কোন্ সময় এ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছিল? সৃষ্টির পূর্বে না পরে? সৃষ্টিকর্তা কি একথা ঘোষণা করেছেন? চলুন দেখি এ নিয়ে একটু গবেষণায় রত হই।

আল্লাহ স্বয়ং তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেছেন ঃ

"লা-ইমামলেকুনাশ্-শাফায়তা ইল্লা মানেত্ তাখাখায়েন দাররাহমানে আহদান।"

(১) অর্থাৎ ঃ "সে সর্বপ্রদাতার নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে তদ্ব্যতীত কাহারো অনুরোধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।" (১৯ ঃ ৮৭)

(২) ওয়া এ আখাজাল্লাহু 'মিসাকা নাবেইনা' লা-মা-আতায়তুকুম মিন কেতাবেও-ওয়া হেকমাতেন সুম্মা যায়াকুম লাছুলুম ছাদ্দিকুল-লেম্মা মায়াকুম লা তুমেনুন্নাবিহি ওয়া লাতান ছুরুন্নাহু কালা আ-আকরারতুম ওয়া আখাজতুম আলা জালেকুম ইসরি কালু আকরারনা; কালা ফাশহাদু ওরা আনা মায়াকুম মিনাশ-শাহেদিন।" (৩ ঃ ৮১)

অর্থাৎ ঃ

"এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে দান করিবার পর তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে-তাহার সত্যতা প্রমাণকারী একজন রসুল আগমন করিবেন-তখন তোমরা অবশ্য তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহার সাহায্যকারী হইবে; তিনি আরও বলিয়াছেন-তোমরা কি ইহাতে স্বীকৃত হইলে এবং আমার শর্ত গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিয়াছিল-আমরা স্বীকার করিলাম; তিনি বলিলেন তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।"

উপরে বর্ণিত **'মিসাকা-ন্নাবেইনা'**-শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও তফসীরকারকদের জন্য। 'আল্লাহ্ যখন নবীদের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন' -এ বাক্যটির মধ্যে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই নবীদের আত্মা সৃষ্টি করা হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য নবী ও রসুলদের সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নবীদের জানিয়ে তাঁদের নিকট হতে এ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ গ্রহণ করেন। আল্লাহর এ শর্তে সমস্ত নবী ও রসুলগণ বলেছিলেন—'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহর বাণী হতেই আমরা শর্ত দেখতে পাচ্ছি। তাই অস্বীকার করবার বা না মানবার কোন যুক্তি নেই। অনেক তফসীরকারক-অবশ্য এ মহাসত্য না বুঝে বলেছেন-

(১) 'আল্লাহ কর্তৃক লোকদের নিকট নবীগণ সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি' (হক্কানী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) 'নবীগণের দ্বারা তাহাদের অনুগামী লোকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি' (মওলানা মুহাম্মদ আলী)

এ তফসীরকারকদের সঙ্গে আমি একমত নই। কেননা প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যখন নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আর সন্দেহ থাকবার কথা নয় যে সমস্ত নবীই এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) **'সাইয়েদুল মুরসালিন'** বা নবী সম্রাট বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। পৃথিবীর বুকে এসে তাঁরা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গেই এই নবীর আগমন বার্তা ঘোষণা করেন। নিজেদেরকে নবী সম্রাট বা শেষ নবী বলেও ঘোষণা দেন নি। বরং জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিমও বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি এই কথা ঃ

"রাব্বানা ওয়াবাস ফিহিম রাসুলাম বিমহুম ইয়াতলু আলায়হিম আইয়াতিকা ওয়া ইউআল্লেমহুমুল কেতাবা ওয়াল হেকমাতা ওয়া ইউজাক্কিহিম। ইন্নাকা আনতা আলীমুল হাকিম।"[১] (২ ঃ ১২৯)

অর্থাৎ ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাহাদিগ হইতে তাহাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করিও–যিনি তাহাদের সমক্ষে তোমাদের নিদর্শনাবলী পাঠ করিবেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"

হযরত ঈসা (আঃ) অনুরূপভাবে এরূপ ঘোষণাই দিয়েছেন। ঃ

"তোমাদিগকে বলিবার আমার অনেক কথা আছে। কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা-যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[১]

চলুন, চির আকাঙ্ক্ষিত-এ নবী সম্রাটের বিচার দিবসের কার্যাবলী দেখি–আবু হোরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট কিছু পাকান গোশত উপহার আসিল। তাঁহার সামনে একটা হাতা ধরা হইল–কেননা উহা তাঁহার ভাল লাগিত। তিনি উহা হইতে এক টুকরা দাঁতে কাটিতে কাটিতে বলিলেন, 'আমি সকলের নেতা হইব কিয়ামত দিনে।' তোমরা জান, কেন? খোদা একত্রিত করিবেন অগ্রবর্তী, পশ্চাৎবর্তী সকলকে একই ময়দানে। প্রত্যেকে শুনিবে আহ্বানকারীর কথা এবং দৃষ্টি পৌছিবে প্রত্যেকের ওপর এবং সূর্য আসিবে নিকটে এবং মানুষের হইবে অসহ্য শোক ও যন্ত্রণা। তাহারা বলিবে–'দেখ না কি কষ্ট হইতেছে তোমাদের? তবে খোঁজ না কেন খোদার কাছে কোন সুপারিশকারী'। তাহারা পরস্পর

টীকা ঃ ১ । কোরআন। সূরা বাকারা। আয়াত –১২৯।

টীকা ঃ ১ । বাইবেল–নিউ টেস্টামেন্ট (ইঞ্জিল) যোহন পরিচ্ছেদ ৬/১২–১৪

আমার রচিত 'জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেয়ে নিশ্চয়ই পাঠকবৃন্দ আনন্দ পেয়েছেন, গর্বিত হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পবিত্র বাণী জানবার সুযোগ পেয়েছেন। এ বইটি পড়ে না থাকলে দয়া করে সংগ্রহ করুন। পড়ুন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আলোর পথ রচনা করুন।

বলিবে–'চল আদমের নিকট।' তখন সকলে মিলিয়া যাইবে আদম (আঃ)-এর নিকট এবং তাঁহাকে বলিবে–'আপনি মানবের পিতা। খোদা নিজ হস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন আপনাকে এবং ফুঁকিয়া দিয়াছেন নিজ হইতে আপনার মধ্যে আত্মা এবং তাঁহার আদেশক্রমে ফেরেস্তারা সেজদা করিয়াছে আপনার সম্মুখে। আপনি সুপারিশ করুন আপনার প্রভুর কাছে। আপনি কি দেখিতেছেন না–'আমরা কি কষ্টে আছি? আপনি কি দেখিতেছেন না কি কষ্ট হইয়াছে আমাদের?' আদম (আঃ) বলিবেন–'খোদা আজ এরূপ ক্রুদ্ধ যে পূর্বে আর কখনও সেরূপ হন নাই এবং পরেও হইবেন না। তিনি আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন গাছের ফল খাইতে কিন্তু আমি অবাধ্যতা করিয়াছিলাম তাঁহার। এবং বলিতে লাগিলেন–'বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে।' তোমরা যাও অপর কাহারো কাছে; তখন সকলে যাইবে নূহের কাছে এবং বলিবে–"হে নূহ! আপনি পৃথিবীতে প্রথম রসুল (দঃ)[১] এবং খোদা আপনাকে নাম দিয়াছেন–**'কৃতজ্ঞ ভৃত্য'**। আপনি সুপারিশ করুন–আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট। আপনি কি দেখিতেছেন না কি কষ্টে আছি আমরা। তিনি বলিবেন–'আমার প্রবল প্রতাপ মহিমাময় প্রভু আজ এরূপ ক্রুদ্ধ যে সেরূপ ইহার পূর্বে কখনও হন নাই এবং পরেও কখনও হইবেন না। আমার একটি বর ছিল। আমি উহা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে চাহিয়াছিলাম। 'বাঁচাও আমাকে। বাঁচাও আমাকে।' তোমরা যাও অপর কাহারো নিকট। তাহারা ইব্রাহিমের নিকট যাইয়া বলিবে–'হে ইব্রাহিম! আপনি তো খোদার নবী ও তাঁহার বন্ধু জগৎবাসীদের মধ্যে; সুপারিশ করুন আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে। দেখিতেছেন না আমরা কি কষ্টে আছি।' তিনি তাহাদের বলিবেন–'আজ আমার প্রভু এরূপ ক্রুদ্ধ যে সেরূপ পূর্বে কখনও হন নাই। পরে কখনও হইবেন না। আমি তিনবার মিথ্যা বলিয়াছি।'*১ বাঁচাও আমাকে। বাঁচাও আমকে। বাঁচাও আমাকে। তোমরা যাও কাহারো নিকটে। যাও মূসার নিকট। তখন তাহারা মূসার নিকট যাইয়া বলিবে–'হে মূসা! আপনি খোদার রসুল। খোদা আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন মনুষ্য জাতির ওপর কথোপকথন দ্বারা। আপনি সুপারিশ করুন আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট। দেখিতেছেন না কি কষ্টে আছি আমরা।' তিনি বলিবেন–'আজ আমার প্রভু এরূপ ক্রুদ্ধ যে সেরূপ পূর্বে কখনও হন নাই এবং পরেও কখনও হইবেন না। আমি হত্যা করিয়াছি এক ব্যক্তিকে যাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই আমাকে। বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে। তোমরা যাও অপর কাহারো কাছে। যাও ঈসার কাছে (যীশুখ্রীষ্টের কাছে)। তাহারা ঈসার (যীশুর) নিকট যাইয়া বলিবে–'হে ঈসা! আপনি খোদার রসুল ও তাঁর বাণী যাহা তিনি পাঠাইয়াছিলেন মরিয়মের নিকট এবং আপনি তাহার তরফ হইতে এক আদেশ এবং আপনি লোকের সহিত কথা বলিয়াছেন দোলনাতে শিশু

টীকা ঃ ১ । হযরত লূত (আঃ) -এর পূর্বে শেরেক (অংশীবাদিতা) ছিল না। তাঁহাকেই উহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন তাদের ধ্বংস করেত। বজ্রপাত ও মহাপ্লাবনে এ অংশীবাদী ও ব্যাভিচারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

* ১। তিন মিথ্যা এই ঃ-

(১) তিনি বলিয়াছিলেন–আমি পীড়িত যদিও তিনি পীড়িত ছিলেন না।

(২) তিনি বলিয়াছিলেন–মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়াছে উহাদের ঐ বড়টি। যদিও তিনি নিজে ভাঙ্গিয়াছিলেন।

(৩) নিজ স্ত্রী হাজয়াকে অত্যাচারের ভয়ে ভগ্নী বলিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থায়। আপনি সুপারিশ করুন আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট। দেখিতেছেন না কি কষ্টে আছি আমরা।' ঈসা (দঃ) বলিবেন-'আমার প্রভু আজ এরূপ ক্রুদ্ধ যে সেরূপ পূর্বে কখনও হন নাই এবং পরেও হইবেন না এবং তিনি উল্লেখ করিবেন না কোন গুণাহের শুধু বলিবেন-'বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও আমাকে। তোমরা যাও আর কাহারো নিকট। যাও মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট'। তখন তাহারা মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট যাইয়া বলিবে-'হে মুহাম্মদ! আপনি খোদার রসুল এবং শেষ নবী; এবং খোদা মাফ করিয়াছেন। আপনার পূর্বাপর সব গুণাহ। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন আপনার প্রভুর নিকট। দেখিতেছেন না কি কষ্টে আছি আমরা'। তিনি বলিবেন-'তখন আমি যাইব এবং আরশের নিচে যাইয়া সেজদায় পড়িব আমার প্রবল প্রতাপ মহিমাময় প্রভুর সম্মুখে এবং তিনি আমার নিকট প্রকাশ করিবেন নিজের প্রশংসার এক পদ্ধতি যাহা পূর্বে করেন নাই কাহারো নিকট'। তখন আমি মাথা তুলিয়া বলিব-'বাঁচাও আমার উম্মতকে। প্রভু আমার বাঁচাও উম্মতকে। বাঁচাও আমার উম্মতকে প্রভু।' তখন বলা হইবে- 'হে মুহাম্মদ! প্রবেশ করাও তোমার উম্মতকে বেহেস্তে যাহাদের হিসাব লওয়া হইবে না, দক্ষিণ দরজা দিয়া এবং তাহারা অপর সব দরজার লোকদের সহিতও শরীক করিতে পারিবে। তিনি বলিলেন- "বেহেস্তের এক এক দরজার প্রস্থ হইবে মক্কা ও হামির বা মক্কা ও বুসরার মধ্যে দূরত্বের সমান।"

উপরে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদের বাণী হতে আমরা গভীর একটি তত্ত্ব খুঁজে পেলাম যা ছিল গুপ্ত, অপ্রকাশিত। সেটা হলো এই ঃ

আল্লাহ তাঁর প্রশংসার এক পদ্ধতি এ মহানবীকে শিক্ষা দিবেন। আর ঐ প্রশংসার বাণীযোগে যখন তিনি সেজদায় পড়ে আল্লাহর নিকট পাপী উম্মতদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করার প্রার্থনা জানাবেন তখন মহাবিচারক তা কবুল করবেন। এ প্রশংসার বাণী শুধু তাঁকেই দিবেন-অন্য কোন নবী বা পয়গম্বরকে নয়। ঐ দুর্দিনে তাঁর ঐ সুপারিশে তাঁর সমস্ত উম্মত, পাপী-তাপী-গুণাহগার-পুণ্যবান অর্থাৎ সৎ-অসৎ সবাই মুক্তি পাবে। তাদের কোন হিসাব না নিয়েই আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেন। **এজ্যই তিনি নবী সম্রাট। কালজয়ী নবী। বিশ্ব মানুষের নবী। বিচার দিনের কাণ্ডারী। মুক্তির দিশারী। আল্লাহর প্রিয় প্রার্থণাকারী। সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশকারী। সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তৃতীয় ভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ)।**

চলুন, প্রিয় পাঠকবৃন্দ-জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমরা বিচার দিনের ঐ মহাসঙ্কট হতে মুক্তি পেতে ঐ সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মদের পবিত্র হাত ধরে তাঁর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন করে দরূদ ও সালাম পৌছাই ঃ

"আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া রসুলুল্লাহ্ (দঃ) "

"আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া হাবিবুল্লাহ (দঃ) "

"আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া রহমতুল্লাহ্ (দঃ) "

"আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া খাতেমুন্ নাবেইন (দঃ) "

"আচ্ছালাতো আস-সালামো আলায়কা ইয়া সাইয়েদুল মুরসালিন (দঃ) "

হযরতের মো'জেজা

(অলৌকিক ঘটনা)

যে সব অলৌকিক ঘটনা নবী-পয়গম্বরদের দ্বারা সংঘটিত হয় তাকে মোজেজা বলা হয়। মোজেজা ও যাদু এক জিনিস নয়। আল্লাহ প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মহাপুরুষগণ অসম্ভব কার্যকেও সম্ভবে পরিণত করেন। যাদুবিদ্যা বলেও অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত ক'রে মানুষের চোখে এক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করা হয়। যুগে যুগে যেমন নবী-পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে তেমনি তাঁদের পাশাপাশি এরূপ কপটবিশ্বাসী মোনাফেক ও যাদুকরেরও আবির্ভাব ঘটেছে যারা তাদের ধন-দৌলত, বাক্যবাণ ও যাদুমন্ত্রে ক্ষীণ বিশ্বাসী ও অজ্ঞ মানব সমাজকে বিভ্রান্তের পথে তুলে দিয়েছে। যে ঔষধে যে রোগের নিরাময় হয়, ডাক্তারগণ সে ঔষধেরই ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। মানুষের শরীরে যে ঔষধ বিষের ক্রিয়া করে সে ঔষধে বিষধর সাপের কিছুই হয় না। আবার যে ঔষধে সাপের মনে নৃত্যের বাসনা জাগে সে ঔষধ মানুষের মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এ বিশ্বের অগণিত সৃষ্টি, অগণিত দেহ ও মনেরই খোরাক যোগায়।

অজ্ঞ ও অবিশ্বাসীদের মনে যাদুর প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। হিতোপদেশ, ধর্মের তত্ত্ব এ প্রভাবের কাছে ম্লান হয়ে যায়। তাই অজ্ঞ সমাজকে সরল ও সঠিক পথের ধারণা দেবার জন্য প্রয়োজন যাদুর চেয়েও শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রভাব যে প্রভাবে যাদুকে হার মানিয়ে দেয় ও এক মহান অদৃশ্য শক্তিরই স্বীকৃতি বহন করে। এ শক্তিকেই বলা হয় অলৌকিক শক্তি। এ শক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-এ শক্তিই মহাপুরুষদের ক্ষমতা বিকাশকারী 'মোজেজা'।

এ মোজেজার কাছে যাদুর শক্তি পরাজিত। হযরত মুসার (আঃ) মোজেজা ছিল তাঁর লাঠি। এ লাঠি ছেড়ে দিলে প্রকাণ্ড অজগরের রূপ নিত। এ অজগর গিলে ফেলত যাদুকরদের যাদু প্রভাবে সৃষ্ট অসংখ্য সর্প। হযরত মুসা (আঃ) এ 'মোজেজা'-না পেলে হেদায়েতের বাণী বিফল হতো। যাদুকরদের প্রভাব বেড়ে যেত। অজ্ঞ ও নিরীহ মানব সমাজ থাকত মিথ্যার জালে বেষ্টিত।

হযরত ঈসার (আঃ) মোজেজা ছিল মৃতকে জীবিত করা, গলিত কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ইত্যাদি। যে যুগে হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম হয় সে যুগের ডাক্তার ও কবিরাজগণ মানুষের রোগ ব্যাধি সমূলে ধ্বংস করে এক নুতন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তবুও মৃতকে জীবিত করে, কুষ্ঠ রুগীকে আরোগ্য করে ও দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান করে কৃতিত্ব নিতে পারেন নি। সমগ্র দেশের সমগ্র জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের ওপরে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে কৃতিত্বের একমাত্র অধিকারী ছিলেন-এ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-যিনি তাঁর মোজেজা বলে পরাভূত করলেন সমগ্র মানবকে যারা বাধ্য হলো তাঁরই আনুগত্য অবশেষে স্বীকার করতে।

মাছের পেটে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর তিন দিন অবস্থান, অগ্নির বুকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর হাসিমুখে দিন যাপন,—এমন মোজেজা প্রায় প্রতিটি পয়গম্বরই দেখিয়েছেন। বিশ্বাসী সম্প্রদায় এমন সব অলৌকিক ঘটনা দেখামাত্রই আল্লাহকে ও পয়গম্বরকে স্বীকার করেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমন অলৌকিক শক্তি আমাদের প্রিয় রসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফাকেও (দঃ) দেওয়া হয়েছিল। এ শক্তি যদি আল্লাহ-পাক তাঁকে না দিতেন তা হ'লে অনেকেই বলত যে তিনি পয়গম্বর সর্বশ্রেষ্ঠ নন, জীবন তাঁর পরিপূর্ণ নয়। এ ফাঁকটুকু যেন না থাকে, মানুষের মনের মাঝে সন্দেহের কোন বীজ যেন না থাকে, সর্বগুণের আঁধার এ মহামানব হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) তাই পরিপূর্ণতা দান করতেই আল্লাহ-পাক তাঁর হাতেও দিলেন অলৌকিক ক্ষমতা যে ক্ষমতার বলে আকৃষ্ট হলো বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, পূজক-পূজারী, দেশী-বিদেশী, জ্ঞানী-মূর্খ, সাধু-ভক্ত –এ বিশ্বের সব মানব-দানব।

হযরতের মোজেজা ছিল স্বতন্ত্র, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা। বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা) লিখেছেন ঃ "কিছু সংখ্যক আলেমের অভিমত রসুলে করিম (সাঃ)-এর মোজেজার সংখ্যা এক হাজার। কোরানুল করিম তাহার অন্যতম একটি যাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হইয়াছে"। তাঁর মতে এটাই ছিল হযরতের সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা। এ মোজেজার ওপর আমরা কিছুটা আলোচনা করে পরে অন্যান্য কয়েকটি মোজেজার উল্লেখ করব। স্বধর্মী, বিধর্মী সবাই দেখুন কেমন অসাধারণ শক্তি হাতে নিয়ে এ ধরার বুকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ মহাপুরুষ। পয়গম্বর রূপে চিহ্নিত হবার পূর্ব থেকেই কেমন শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন–কেমন অসাধারণ জ্ঞান–ভাণ্ডারে ভর্তি হচ্ছিল তাঁর হৃদয়।

হযরতের জীবনী আলোচনা করে সবাই দেখেছেন যে, কোন স্কুল-কলেজ বা ইউনিভার্সিটির কোন ডিগ্রী তিনি পান নি। পিতৃমাতৃহারা বালক মেষপাল চরাতেন। কেউ তাঁর হাতে খাড়ি দেন নি। কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর দ্বারা কোন সাহিত্য, কোন ধর্মশাস্ত্র বা কবিতা রচনার কোন পদ্ধতি তিনি শিখেন নি। ভাষা সুন্দরভাবে ও নির্ভুলভাবে রচনা করার জন্য কোন শিক্ষকের নিকট হতে আরবী ব্যাকরণ পড়েন নি। ইতিহাসে পারদর্শী হবার জন্য কোন মহান ঐতিহাসিকের কাছেও বছরের পর বছর শিক্ষা লাভ করেন নি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিও অধ্যয়ন করেন নি। রসায়ন, বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, আকাশ বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করার জন্য দিনের পর দিন ল্যাবরেটরীর মাঝে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করতেও কাটাননি। অথচ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আদেশে ও উপদেশে এমন সব নির্ভুল বাণী কি করে দিয়ে গেলেন? বাক্য-বিন্যাস, অলঙ্কার, সৌন্দর্য, অর্থপূর্ণ, বক্তব্যের প্রবাহমান বাক্য শৃঙ্খলা, ব্যাকরণ শুদ্ধবাণী, জাগতিক মহাজাগতিক, দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ের তত্ত্ব কি করে তুলে ধরলেন? অশিক্ষিত একজন মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব? ছন্দ-রূপ-ভাষা শিক্ষা না করে মহাকাব্য তৈরি করা কি আশ্চর্য নয়? অর্থনীতির মাঝে হাবুডুবু না খেয়ে,–রাজনীতির বিপাকে না পড়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী না হ'য়ে চিরস্থায়ী এক বন্দোবস্ত সারা বিশ্বের জন্য ক'রে যাওয়া কি খেলো কথা? চিন্তার অবসান হ'য়ে যায়, মাথায় বুদ্ধি আসে না, জ্ঞানের সীমা পার হয়ে যায়, হযরতের এ অলৌকিক শক্তি দেখে। অমর, অক্ষয় এ বাণী যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর এক মহান সাধনার মাঝে। এক মহাশক্তি পিছন থেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন 'জগদ্গুরুর'–আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে। একদিনে নয়–দুদিনে নয় সুদীর্ঘ তেইশটি বছরের মাঝে এ শিক্ষা পেয়েছিলেন, এ মোজেজা হাতে নিয়েছিলেন। তাই হযরতের এ মোজেজা– 'কোরআন' ছিল অতুলনীয়। এর একটি সূরা বা বাক্যের মত কোন সূরা বা বাক্য আজও কেউ তৈরি করতে পারে নি। কেউ কোন দিন পারবেও না। কোরআন নিজেই এর সাক্ষি ঃ (২ ঃ ২৩)

"আমি আমার সেবকের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি যদি তোমরা তাহাতে সন্দিহান হও তবে তৎসদৃশ্য একটি সূরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।" (সূরা বকর–আয়াত ২৩)

"বল, যদি সমস্ত মানুষ ও জ্বিন এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় যে এইরূপ কোরআন তৈরি করিবে তথাপি তাঁহারা ইহার ন্যায় তৈয়ার করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।" (সূরা বনি ইসরাইল। আয়াত–৩৩)

হযরতের সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা এ কোরআন যা পানিতে পচে না, আগুনে পোড়ে না, মাটিতে বিলিন হয়ে যায় না। এ কোরআন মুছে যায় নি, মুছেও যাবে না অনন্তকাল–যতদিন এ বিশ্ব চলে ততদিনই টিকে থাকবে। এর চাইতে বড় মোজেজা আর কি হ'তে পারে?

এ মহাবাণীতে যে যত বেশি আকৃষ্ট হবে সে ততই ফললাভ করবে। এ বাণী রিসার্চ করে ও তাঁকে মান্য করে পথে অগ্রসর হলে পণ্ডিত মহাপণ্ডিত হয়, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী হয় আর সাধক মহাসাধক হয়। অদৃশ্য বস্তু এক নিমিষেই এ বাণীর গুণে চোখের সম্মুখে ঝল্‌সে উঠে, দূর নিকটে আসে, শত্রু আপন হয়, অজানা, অসম্ভব, জানা ও সম্ভবের বেড়াজালে ধরা পড়ে। 'তাসাউফ পন্থী' – মোমেন, ফকির-দরবেশ এর সাক্ষি বহন করে। এই সেই রসুলের মোজেজা যাকে ধরে আমরাও কারামতি দেখাতে পারি। ভূত, প্রেত, দেও, দস্যু, জ্বিন-পরী এ মোজেজাকে ভয় করে, মান্য করে ও সম্মান করে। সিংহ, বাঘ-ভাল্লুক, সাপ, বিচ্ছু, বোলতা, হাঙ্গর, কুমির এ বাণীর গুণে শক্তি হারায়, দৃষ্টি হারায়, ক্ষমতা হারায়। কবরের মহাশাস্তি, বিচার দিনের মহাবিপদ হতেও রক্ষা করবে এ মোজেজা। এ মোজেজাকে সম্বল করে হযরত বিশ্বের বুকে যেমন অক্ষয় কীর্তি রাখলেন তেমনি পারকালের মহাসম্মান, মহাপুরস্কার ও মহামর্যাদার অধিকারী হয়ে তাঁর উম্মতদের রক্ষা করবেন। ধন্য রসুল। ধন্য তোমার মোজেজা– 'আল-কোরআন'।

চলার পথে, প্রয়োজনের তাগিদে, স্বদেশে, বিদেশে, হযরত তাঁর জীবনের যে সব অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করেছেন, নিরাময় করেছেন, কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন সেগুলোর কিছু বর্ণনাই আমরা এখানে দেব। 'জগদ্গুরুর'–পরিচয়ে এসব ঘটনাও পাঠক মনে দাগ কাটবে, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় তাঁর প্রতি বিগলিত হবে, মুক্তির নেশায় সেই গুরুর উপদেশ মান্য করে সত্যের পথ ধরবে, অলৌকিক ঘটনা সমূহের প্রতি চিন্তা করে নিজ কৃতিত্বের অভিমান, আত্ম অহঙ্কার ও জ্ঞান বুদ্ধির কবর দিয়ে সেই নামেরই তছবীহ ধরবে এটাই আমরা কামনা করি।

রসুলের এ মোজেজা কোন যাদু নয়। এর প্রয়োজন ছিল। বিধর্মী ও কাফেরগন অনেক সময় হযরতকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আহ্বান করত, তাঁর ঐশী ক্ষমতা দেখাবার অভিপ্রায় জানাত। চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করা, খেজুর বৃক্ষের কান্না করা, বিষ মিশ্রিত খাদ্য- 'আমার মধ্যে বিষ আছে' বলে সাক্ষি দেওয়া, উটের কথা বলা ইত্যাদির পিছনে এগুলোই ছিল মোজেজার কারণ। এ ছড়া সাহাবী ও কর্মীবৃন্দের কষ্ট লাঘব, খাদ্যের সংস্থান করা ও বিশ্বাসের নিমিত্ত যে সব মোজেজা ছিল তাদের মধ্যে হযরতের অঙ্গুলী হতে সজোরে পানি প্রবাহিত হওয়া, সামান্য খাদ্যে বিপুল সংখ্যক লোককে ভোজন করান, বৃক্ষের চলাচল, মেঘ মালার ছায়াদান, প্রভৃতি অন্যতম। এসব গাঁজাখুরী কোন গল্প নয়, মুখরোচক কোন কাহিনী

pdf By Syed Mostafa Sakib

নয়, যাদুকরের ফাঁকিবাজী নয়। সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতেই রচিত। যুগ যুগ ধরে রসুলের এসব মোজেজা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ দেবে–আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করবে আর বিজ্ঞানীদের চিন্তা ও গবেষণার উপকরণ যোগাবে। চলুন আমরা এসব অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের কারন ও ফলাফল প্রমাণের মাধ্যমেই দেখি ও হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি।

সাহাবীদের মতে ঃ

১। হযরত বারায়া হ'তে বর্ণিত ঃ

"রসুল করিম (দঃ) আবু রাফের নিকট একদল লোক পাঠাইলেন। আব্দুল্লাহ-বিন-আতিক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। আব্দুল্লাহ-বিন-আতিক পরে বলিল,–'আমি আমার অসি তাহার উদরে এমনভাবে প্রবেশ করাইয়া দিলাম যে ইহা তাহার পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত ভেদ করিয়াছিল। তারপর আমি দেখিলাম যে তাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি। আমি দরজাগুলি খুলিতে খুলিতে একটি সিঁড়ির নিকট পৌছিলাম। যখন আমি পা রাখিতে ছিলাম, চাঁদের আলোক থাকা সত্ত্বেও আমি পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। আমার পাগড়ি দ্বারা তাহা বাঁধিয়া আমার সঙ্গীগণের নিকট গেলাম এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার নিকট সকল কথা জানাইলে তিনি বলিলেন– 'তোমার পা বাড়াইয়া দাও। আমার পা বাড়াইয়া দিলাম। তারপর তিনি ইহার ওপর হাত বুলাইলে ইহার পর আর কোন বেদনা রহিল না।' [বোখারী]

২। হযরত জাবের হতে বর্ণিত ঃ

আমরা খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটিতেছিলাম। একটি শক্ত পাথর পড়িয়া গেল। তাহা নবী (সঃ) নিকট আসিয়া বলিল, খন্দকে এই পাথরখানা বড়ই শক্ত পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন–আমি আসিতেছি। তিনি দাঁড়াইলে দেখা গেল তাঁহার পেটে এক খণ্ড পাথর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা কোন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া তিন দিন তথায় ছিলাম। রসুল করিম (দঃ) একটি কোদাল লইয়া একটি আঘাক দিতেই ইহা বালুর স্তুপে পরিণত হইল। আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বলিলাম–তোমার নিকট কি কিছু খাদ্য আছে? আমি রসুলুল্লাহ্‌কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখিতেছি। সে একটি ভাণ্ডে এক ছায়া আটা পাইল। আমাদের একটি কাল মুরগী ছিল। আমি ইহা জবাই করিয়া দিলাম এবং আমার স্ত্রী আটা পিষিতে লাগিল। তারপর একটি লৌহ পাত্রে মাংস রাখিয়া আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট আসিয়া তাহাকে গোপনে জানাইলাম। আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহর রসুল! আমরা মুরগী জবাই করিয়াছি এবং আমার স্ত্রী এক ছায়া আটা পিষিয়াছে। সুতরাং আপনি এবং আপনার সঙ্গে কয়েকজন আসুন।' রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, –"আমি না আসা পর্যন্ত তোমার লৌহ পাত্র কিছুতেই নামাইও না এবং তোমার আটা পিষিবার স্থানে রুটি তৈয়ার করিও না। তারপর তিনি আসিলে আমি পিষিবার যন্ত্র লইয়া আসিলাম। তিনি তাহাতে থুথু ফেলিয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, যে রুটি তৈয়ার করিতে জানে তাহাকে ডাক এং সে যেন তোমার সঙ্গে রুটি তৈয়ার করে। তাহারা সংখ্যায় এক হাজার ছিল। আমি আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে তাহারা সকলেই খাইয়া চলিয়া গেল কিন্তু আমাদের কড়াই তখনও চুলার ওপরেই তরকারি-সহ ছিল এবং আমাদের রুটি পিষিবার যন্ত্র পূর্বের ন্যায় রুটি তৈয়ার করিতে ছিল।" (বোখারী, মোসলেম)

৩। হযরত জাবের হ'তে বর্ণিত ঃ

"হোদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন লোকজন তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রসুলে করিমের সম্মুখে একটি পাত্র ছিল। তাহার পনি দিয়ে তিনি ওজু করিতে ছিলেন। এমন সময় লোকজন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনার পাত্রে যাহা আছে তাহা ব্যতীত আমাদের নিকট ওজু বা পান করিবার পানি নাই। তখন হযরত তাহার হাত পাত্রের ভিতর দিলে পানি তাহার অঙ্গুলিগুলির ভিতর দিয়া স্রোতের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তারপর আমরা পান করিলাম ও ওজু করিলাম। জাবেরকে জিজ্ঞাসা করা হইল– "আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন–আমরা যদি দশ হাজারও হইতাম ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। আমরা দেড় হাজার লোক ছিলাম।"

(বোখারী, মোসলেম)

৪। হযরত বারায়া বিন-আজেব হইতে বর্ণিত ঃ

"আমরা হোদায়বিয়ার যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে চৌদ্দশত লোক ছিলাম। হোদায়বিয়ায় একটি কুয়া ছিল। ইহার পানি নিশেষ হইয়া গেল। এক বিন্দু পানিও ইহাতে রহিল না। এই সংবাদ রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পৌছিল। তিনি ইহার নিকট আসিয়া ইহার পার্শ্বে বসিলেন এবং একটি পাত্র আনিতে বলিলেন। তিনি ওজু করিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিলেন এবং ওজুর পানি ইহার ভিতর ঢালিয়া বলিলেন, –'এক ঘণ্টা ইহা এইরূপ থাকুক। তারপর তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে পানি পান করিল এবং তাহাদের সঙ্গের প্রাণীদেরও পান করাইল। ইহার পর তাহারা চলিয়া গেল।" (বোখারী)

৫। হযরত ইমরান-বিন-হোসাইন হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমরা রসুলুল্লার (দঃ) সহিত এক সফরে ছিলাম। লোকজন তাঁহার নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করিলে তিনি হযরত আলীকে ডাকিয়া বলিলেন,–যাও এবং পানির সন্ধান কর। তাহারা গমন করিলে পানি পরিপূর্ণ দুইটি মশক বা বালতি-সহ একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল। তারা স্ত্রীলোকটিকে রসুলুল্লার (দঃ) নিকট লইয়া গিয়া উট হইতে নামাইলেন। হযরত একটি পাত্র আনিতে বলিলেন এবং মশকের মুখ হইতে উহাতে পানি ঢালিতে বলিলেন এবং উপস্তিত লোকদিগকে বলিলেন–'পানি পান কর'। বর্ণিত আছে ত্রিশজন লোক প্রাণ ভরিয়া পানি পান করিল। আমাদের সঙ্গে যত পাত্র ও ঘটি ছিল আমরা সমস্তই পানিতে পূর্ণ করিয়া রাখিলাম। আল্লাহর শপথ–আমাদের তখন সন্দেহ হইতেছিল যে মশকের ভিতরে প্রথমে যে পানি ছিল তাহার চাইতে বেশি পানি ইহাতে হইয়াছিল কিনা যখন এ পানি স্ত্রীলোকটির নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।"

(বোখারী ও মোসলেম)

৬। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সময় একবার অনাবৃষ্টির দরুণ লোকজন ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। যখন হযরত জুমার দিনে খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন তখন একজন গ্রাম্য আরববাসী উঠিয়া বলিল, – হে আল্লাহর রসুল! মালপত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় দিন কাটাইতেছে। আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। হযরত তাঁহার দুই হাত তুলিলেন। আকাশে তখন কোন মেঘ ছিল না। যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ–যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পর্বতের মত মেঘরাশি না দেখিলাম ততক্ষন পর্যন্ত তিনি তাঁহার হাত নামাইলেন না। তারপর যে পর্যন্ত বৃষ্টি তাঁহার দাঁড়িতে না পড়িল সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্যন্ত তিনি মেম্বর হইতে নামিলেন না। সেই দিন, তার পর দিন, তার পরের দিনের পরের দিন এমন কি অন্য জুম্মার দিন পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি পড়িল। সেই গ্রাম্য আরব এবং অন্য সবাই উঠিয়া বলিল– 'হে আল্লাহর রসুল! ঘর বাড়ি সব নষ্ট হইতেছে, ধন-সম্পত্তি ডুবিয়া যাইতেছে, আমাদের জন্য দোয়া করুন।' তখন হযরত পুনরায় হাত তুলে বললেন, –'হে আল্লাহ! আমাদের চতুর্দিকে এবং আমাদের উপরিভাগে নয়'। তারপর দেখা গেল যে তিনি যে দিকে ইশারা করিলেন ঠিক সেই দিকে মেঘগুলি চলিয়া যাইতেছে। মদিনা যেন একটি ঢাল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কানার উপত্যকায় একমাস পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেদিক হইতে যে আসিতে লাগিল সেই প্রচুর বৃষ্টির কথা বলিতে লাগিল।"

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ–

হযরত হাত তুলিয়া বলিলেন,–"হে আল্লাহ! আমাদের চতুর্দিকে এবং আমাদের উপরিভাগে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়-পর্বতে, শক্ত ভূমিতে, উপত্যাকয়, গহ্বরে এবং বৃক্ষাদির স্থানে বারিপাত কর। রাবি বলিয়াছে, এই মেঘগুলি তখন সরিয়া গেল এবং আমরা রৌদ্রে বেড়াইতে লাগিলাম।"

[বোখারী, মোসলেম]

৭। হযরত জাবের হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমরা রসুলে করিমের সহিত ভ্রমণ করিয়া একটি বিস্তৃত উপত্যকায় অবতরণ করিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রস্রাব করিতে চলিলেন। কিন্তু নিজকে পর্দার আড়াল করিবার কিছুই পাইলেন না। হঠাৎ উপত্যকার পাশে দুইটি চারাগাছ জন্মিল। হযরত একটি চারা গাছের নিকট গিয়া ইহার শাখা-প্রশাখা ধরিয়া বলিলেন–'আল্লাহর আদেশে আমাকে অনুসরণ কর।' বাধ্যগত উট যেমন উট বালকের অদেশ মানে তেমনি এ বৃক্ষটিও হযরতের আদেশ মানিল ও তাঁরই অনুসরণ করিল। যখন তিনি এই দুই চারাগাছের মধ্যবর্তী স্থানে আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, "আল্লাহর আদেশে আমাকে ঢাকিবার জন্য তোমরা একত্রিত হও। গাছ দুইটি একত্রিত হইল। আমি বসিয়া গুণ গুণ করিতে লাগিলাম। তারপর আমি তাকাইয়া দেখিলাম হযরত আসিতেছেন এবং দুইটি চারাগাছ তখন পৃথক হইয়া যার যার মূলের ওপর দাঁড়াইয়া রহিল।"

[মোসলেম]

৮। হযরত জাবের হ'তে বর্ণিত ঃ

"যখনই রসুলুল্লাহ (দঃ) খোতবা পড়িতেন মসজিদের স্তম্ভের ভিতর তিনি খেজুর গাছের গোড়াতে হেলান দিয়া বসিতেন। তৎপর মিম্বর নির্মিত হইলে তাহার ওপর তিনি দাঁড়াইলেন। খেজুর গাছের মূলের নিকট খোতবা পড়িবার সময় তাহা চিৎকার করিতে লাগিল এমনকি তাহা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হযরত নামিয়া মূলটি ধরিলে আবার একত্র হইল। তারপর ইহা বালকের ক্রন্দনের ন্যায় নীরবে শব্দ করিতে লাগিল। তারপর ইহা শান্ত হইল। হযরত বলিলেন-ইহা পূর্বে কোরআনের আয়াত শুনিত বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।" [বোখারী, মোসলেম]

৯। হযরত সালামাহ-বিন-আকওয়াহ হ'তে বর্ণিত ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি তাহার বাম হাত দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'তুমি ডান হাত দিয়া খাও।' সে বলিল, 'আমি পারিব না"। তিনি বলিলেন, 'তুমি পারিবে না?' অহঙ্কার ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাকে ইহা হইতে নিবারণ করিল না। রাবি বলিয়াছে–তৎপর তাহার হাত মুখ পর্যন্ত উঠাইতে পারিত না।" [মোসলেম]

১০। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"মদিনাবাসীগণ একবার সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন গোপনে আবু তালহার ঘোড়ায় চড়িয়া চতুর্দিকে দেখিয়া আসিলেন। ফিরিবার পর তিনি বলিলেন, আমরা তোমার এই ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পাইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে দৌড়ে এ ঘোড়াটিকে হারান যাইত না। অন্য বর্ণনায় তার পরদিন ইহাকে হারান যাইত না।" [বোখারী]

১১। হযরত জাবের হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমার পিতা ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছিলেন। আমি তাহার মহাজনকে তাহার ঋণের পরিবর্তে খেজুর গ্রহণ করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিল। তারপর আমি হযরতের নিকট আসিয়া বলিলাম–'ওহুদের যুদ্ধে আমার পিতা শহিদ হইয়াছে বলিয়া আপনি অবগত আছেন এবং ভারি ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। আমি আশা করি, মহাজনগণ যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে। তিনি আমাকে বলিলেন–'যাও এবং প্রত্যেক রকমের খেজুর এক কোণায় স্তূপ করিয়া রাখিয়া দাও। আমি তদ্রূপ করিয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম। তাহারা হযরতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার কাছে বেশি করিয়া তাগাদা করিতে লাগিল। হযরত তাহাদের এরূপ ভাব দেখিয়া বৃহৎ খেজুর স্তূপের ওপর বসিলেন এবং বলিলেন, 'তোমার মহাজনকে ডাক'। তিনি তাহাদিগকে মাপিয়া দিতে লাগিলেন,–এমনকি আমার পিতার দেনা আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করিলেন। আমার ভগ্নীদের খেজুর দিতে না পারিলেও আল্লাহ যে আমাকে পিতার দেনা পরিশোধ করিতে দিয়াছেন এজন্যই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যে খেজুর স্তূপের ওপর বসিয়াছিলেন আমি তাঁহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে তাহার একটি খেজুরও যেন কমে নাই।" (বোখারী)

১২। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"আবু তালহা উম্মে সোলায়মানের নিকট বলিয়াছিল–আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর কথা দুর্বল হইতে দেখিলাম এবং মনে করিলাম যে ক্ষুধার জন্য তাহার এরূপ হইয়াছে। সে তাহাকে বলিল, তোমার নিকট কি কিছু আছে? সে বলিল, 'হুঁ'। তারপর আটার কিছু রুটি তৈয়ার করল এবং বোরখার এক কোণায় বাঁধিয়া তাহা আমার মাথায় দিল এবং রসুলুল্লাহর (সঃ) নিকট পাঠাইল। আমি ইহা লইয়া গেলাম এবং রসুলুল্লাহকে দেখিলাম কতিপয় লোকসহ মসজিদের ভিতর বসিয়া আছেন। আমি তাহাদিগকে সালাম দিলে হযরত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– 'তোমাকে কি আবু তালহা পাঠাইয়া দিয়াছে?' আমি বলিলাম, 'হাঁ'। তিনি বলিলেন, 'খাদ্য সহ'? আমি বলিলাম 'হাঁ'। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন তাঁর সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা উঠ। তারপর তিনি চলিলেন এবং আমি তাহাদের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলাম এবং আবু তালহার নিকট গিয়া রসুলুল্লাহর আগমনের কথা বলিলাম। আবু তালহা বলিল, 'হে উম্মে সোলায়েম! হযরত তাঁহার সঙ্গীগণ-সহ আসিয়াছেন। আমাদের ঘরে তাহাদিগকে খাদ্য দেবার কিছুই নাই। সে বলিল, আল্লাহ ও রসুল উত্তম জানেন। আবু তালহা রসুলে করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'হে উম্মে সোলায়েম! তোমার নিকট কি আছে তাহা লইয়া আস। সে ঐ রুটি লইয়া আসিল। হযরতের আদেশ পাইয়া উম্মে সোলায়েম মাখন নিংড়াইয়া খাদ্য তৈয়ার করিল। তারপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, দশজনকে আন। অনুমতি পাইয়া দশজন ইচ্ছামত খাইল। তারপর দশজনকে অনুমতি দেওয়া হইল। এরূপে পর পর দশজন খাইবার অনুমতি পাইল। সমস্ত ইচ্ছামত খাইল। লোকদের সংখ্যা ৭০ বা ৮০ জন। [বোখারী ও মোসলেম]

মোসলেমের বর্ণনায় ৮০ জন। এরপর রসুলে করিম এবং বাড়ির অন্যান্য লোকজন। তারপর যাহা বাকি রহিল তাহা রসুলুল্লাহ হাতে লইয়া দোয়া করিলে পূর্বে যতটুকু খাদ্য ছিল আবার ততটুকু হইল।

১৩। উপর্যুক্ত বাণী হ'তে বর্ণিত ঃ

"জাওয়াতে থাকাকালীন আমি রসুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে ছিলাম। তাহার নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পেয়ালার ভিতর হাত দিলে তাহার অঙ্গুলী হইতে পানি বাহির হইতে লাগিল। লোকজন ওজু করিল।"

কাতাদাহ বলিয়াছে– 'আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম–তোমরা কতজন ছিলে? সে বলিল–তিনশত বা ততোধিক।'

[বোখারী, কুরাইশের মর্যাদা পরিচ্ছদ, হাঃ নং ৩০/৩২২]

১৪। আবদুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমরা তো মোজেজাকে কল্যাণের হেতু মনে করিতাম আর তোমরা উহাকে মনে কর ভয়ের কারণ। আমরা কোন এক সফরে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন পানির অভাব হইল। তিনি বলিলেন, 'একটু বাঁচা পানি তালাশ করিয়া আন। সাহাবীরা একটা পাত্র আনিল। উহাতে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি ঐ পাত্রে নিজ হাত রাখিয়া বলিলেন, 'আস, এই পবিত্র ও মঙ্গলময় পানির কাছে এবং এই বরকত খোদার তরফ হইতে আসিয়াছে।' আমি দেখিলাম রসুল (দঃ)-এর অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে। এবং আমরা খাদ্যের তছবিহ পড়া শুনিয়াছি যখন উহা খাওয়া হইত।"

[সহীহ বুখারী (তজরীদ)। কুরাইশদের মর্যাদা পরিচ্ছদ। হাঃ নং ৩১/৩২৩]

১৫। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ

"এক খ্রীষ্টান মুসলমান হইয়া সূরা বকর ও আল্-ইমরান পড়িল এবং নবী (দঃ)-এর জন্য ওহি লিখিতে লাগিল। তারপর আবার খ্রীষ্টান হইয়া বলিতে লাগিল–'মুহাম্মদ শুধু জানে যাহা আমি তাহাকে লিখিয়া দিয়াছি।' তারপর খোদা তাহাকে মৃত্যু দিলেন এবং তাহার লোকেরা তাহাকে দাফন করিল কিন্তু ভোরে দেখা গেল মাটি তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিল, 'ইহা মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীদের কাজ; কেননা সে তাহাদের হইতে ভাগিয়া আসিয়াছিল। তাহারা কবর খুড়িয়া আমাদের বন্ধুকে বাহিরে ফেলিয়াছে।' এইবার তাহারা গভীর গর্ত করিয়া তাহাকে উহার মধ্যে রাখিয়া দিল। পরের দিন ভোরে দেখিল, মাটি তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিল, 'ইহা মুহাম্মদ ও তাঁহার সাহাবীদের কাজ। তাঁহারা কবর খুড়িয়া তাহাকে বাহিরে ফেলিয়াছে। কেননা সে তাহাদের হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল।' এইবার তাহারা যথাসম্ভব গভীর গর্ত করিয়া উহার মধ্যে তাহাকে রাখিল। কিন্তু ভোরে দেখা গেল মাটি তাহাকে বাহিরে ফেলিয়াছে। তখন তাহারা বুঝিল, উহা মানুষে করে নাই এবং ফেলিয়া রাখিল তাহাকে।"

[সহীহ বুখারী (তজরীদ)–তর্জমা, আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ৪২/৩৩৪]

১৬। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ

'নবী (দঃ) বলিলেন, 'তোমাদের ফরাস আছে?' আমি বলিলাম, 'ফরাস আমাদের কোথা হইতে আসিবে?' তিনি বলিলেন–'তবে দেখ, শীঘ্রই তোমাদের ফরাশ হইবে।' তাই আমি আমার স্ত্রীকে বলি–সরাও তোমার ফরাশ আমাদের নিকট হইতে। আর তিনি বলেন, 'নবী (দঃ) কি বলেন নাই, শীঘ্রই তোমাদের ফরাশ হইবে?' তখন আমি থাকিতেই দেখিতে পাই উহা।'

[সহীহ বুখারী তজরীদ–পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ৪৩/৩৩৫]

১৭। সা'দ-বিন-মুয়ায হ'তে বর্ণিত ঃ–

তিনি উমাইয়া বিন-খলফকে বলিলেন, "আমি মুহাম্মদ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি–'তিনি তোমাকে হত্যা করিবেন।' উমাইয়া বলিল, 'আমাকে?' সা'দ বলিলেন–'হ্যা'। উমাইয়া বলিল, 'কসম খোদার, মুহাম্মদ যখন কথা বলেন, মিথ্যা বলেন না।' খোদা তাহাকে হত্যা করেন বদরের যুদ্ধে।"

[পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ৪৪/৩৩৬]

১৮। আবদুল্লা-বিন-মসউদ বলিয়াছেন ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সময় চাঁদ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন– "তোমরা সাক্ষি থাক।" টীকা* A দেখুন]

[পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ৪৮/৩৪০]

টীকা – *A

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল–যে সব ঘটনা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছিল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রের প্রাণেই দাগ কেটেছিল–আল-মেরাজ ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উপরে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেছি সেগুলো বিচার করে বিজাতি ভাইয়েরা বেশি আশ্চর্যান্বিত হবেন না। তাঁরা হয়ত বলবেন যে হযরত সোলায়মান, হযরত মূসা, হযতর ঈসা (আঃ)–প্রত্যেক নবীই এমন সব অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। আমরা বলব–হাঁ–প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ বিশেষ ক্ষমতা দান করেছিলেন যে ক্ষমতার বলে তাঁরা বাধ্য করেছিলেন অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানবকে সুপথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্তার দিকে তাদের মন কেন্দ্রীভূত করতে। কিন্তু সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করে সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছিতে পারেন নি। আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎলাভ করতেও পারেন নি। এ ঘটনা একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল আকাশের সূর্যকে দাঁড়িয়ে রাখতে, চাঁদকে দ্বি-খণ্ডিত করতে।

চাঁদের বিভক্ত হবার কথা কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে এই বলে ঃ–

"এবং সেই সময় সন্নিকটবর্তী হইতেছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।"

(৫৪ ঃ ১। সূরা কমর)

সহি হাদিস সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় অবস্থানকালে এ ঘনটা সংঘটিত হয়েছিল। অবিশ্বাসীরা বিশেষ করে আবু জেহেল পূর্বোক্ত নবীদের ন্যায় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে হযরতকে অনুরোধ করে। এ অনুরোধে হযরত কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এরপর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। নামায শেষে আকাশের চাঁদকে লক্ষ্য করে তর্জনীর ইশারায় দ্বি-খণ্ডিত হবার নির্দেশ দেন। চাঁদ তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হয়ে দু'অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ আবু কাবিস পর্বত এবং অপর অংশ নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে দৃশ্যমান হতে থাকে। আরব ও পার্শ্ববর্তী বহু দেশের সাধকবৃন্দ এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং হযরতকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ

"যখন খয়বর জয় হইল, নবী (দঃ)-কে একটি বকরী উপহার দেওয়া হইল, তখন নবী (দঃ) আদেশ দিলেন, 'এখানে যেসব ইহুদী আছে তাহাদের আমার সম্মুখে একত্র কর।' এবং একত্র করা হইল তাহাদের তাঁহার সম্মুখে। তারপর তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিব: তোমরা আমাকে সত্য সত্য জবাব দিবে কি?' তাহারা বলিল, 'হাঁ'। তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা রিলেন, 'কে তোমাদের পিতা?' তাহারা বলিল, 'অমুক'। তিনি বলিলেন, 'মিথ্যা বলিয়াছ তোমরা-তোমাদের পিতা 'অমুক'। তাহারা বলিল, 'সত্যই বলিয়াছেন আপনি।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা আমাকে সত্য জবাব দিবে কি? যদি আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি কিছু?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়'-আবুল কাসিম। এবং যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি তো জানিবেন আমাদের মিথ্যা; যেমন আপনি জানিয়াছেন আমাদের পিতা সম্বন্ধে।' তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহারা দোজখী?' তাহারা বলিল, 'আমরা কিছুকাল উহাতে থাকিব। তারপর আপনারা আমাদের স্থানে যাইনে।' তখন নবী (দঃ) বলিলেন, 'তোমরাই লাঞ্ছিত হইয়া থাক সেখানে; কসম খোদার, আমরা যাইব না তোমাদের স্থানে কখনও।' তারপর তিনি বলিলেন, 'তোমরা আমাকে সত্য জবাব দিবে কি?' যদি আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি আরো কিছু?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই হে আবুল কাসেম।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি বিষ দিয়াছ এই বকরীতে।' তাহারা বলিল, 'হাঁ'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসে তোমরা উত্তেজিত হইয়াছিলে- ইহাতে?' তাহারা বলিল, 'আমরা চাহিয়াছিলাম-যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা মুক্তি পাইব। আর যদি আপনি নবী হন, তবে ইহাতে অনিষ্ট করিবে না আপনার।"

[সহীহ বুখারী-জিহাদের মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদ, তর্জমা-পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ১৩৭/১৬৭]

২০। হযরত আবু হোরইরা হ'তে বর্ণিত ঃ

'তাবুকের যুদ্ধের সময় লোকজনের ভীষণ খাদ্যের অভাব পড়িল। হযরত ওমর বলিলেন, 'হে আল্লাহর রসুল! যাহাদের নিকট অতিরিক্ত খাদ্য আছে তাহাদের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করুন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। তারপর তিনি মশক আনিয়া রাখিতে বলিলেন এবং অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিলেন। কেহ এক মুষ্টি খাদ্যশস্য আনিল, কেহবা একখণ্ড রুটি আনিল। এসব মশকের ভিতর রাখা হইল। এরপর হযরত বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা থালা পূর্ণ করে খাদ্য লও। সবাই যার যার খাদ্য থালায় ভর্তি করিয়া লইল। একজন সৈনিকের থালাও বাকি রহিল না। এরপর তারা ইচ্ছামত পেট ভরিয়া খাইল। কিছু খাদ্য অবশিষ্টও রহিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রসুল। এমন কোন বান্দা নাই যে নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস লইয়া আল্লাহর সহিত দেখা করিলে তাহাকে বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিবেন।'

[মোসলেম]

২১। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সঙ্গে জয়নবের বিবাহ হইল। বিবাহের দিন আমার মাতা উম্মে সোলায়েম খেজুর, ঘি ও মধু লইল এবং হায়েজ তার সঙ্গে খাবার তৈয়ার করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিল। তারপর আমাকে বলিল, 'হে আনাস ইহা রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে বল আমার মা আপনার নিকট ইহা পাঠাইয়া দিয়োছে-এই বলিয়া সালাম জানাইয়াছে- 'হে আল্লাহর রসুল! আপনার জন্য আমাদের নিকট হইতে এই সামান্য উপহার।' আমি মায়ের এই কথাগুলি রসুলুল্লাহকে (দঃ) বলিলাম। তিনি তখন বলিলেন, 'ইহা রাখিয়া দাও।' তারপর আমাকে বলিলেন, 'যাও অমুক অমুককে ডাকিয়া আন। এছাড়া তোমার সঙ্গে আরও যাদের দেখা হয় তাদেরও লইয়া আস।' যাহাদের নাম তিনি বলিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে যাহাদের দেখা হইয়াছিল আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। লোকে ঘর ভর্তি হইয়া গেল। লোকসংখ্যা প্রায় তিনশত। আমি তৎপর হযরতকে ঐ খাদ্যের ওপর হাত রাখিতে দেখিলাম। তিনি আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে দোয়া করিলেন। তারপর দশ দশজন করিয়া ডাকিলেন এবং তাহাদের ঐ খাদ্য হইতে খাইতে বলিলেন। খাবার সময় তাহাদিগকে বলিলেন, 'আল্লাহর নাম স্মরণ কর এবং তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা খাও।' তাহারা ইচ্ছামত পেট ভর্তি করিয়া খাইল। একদল খাইবার পর আর একদল আসিল। এইভাবে সমস্ত লোকেই খাইল। খাওয়া শেষ হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, 'হে আনাস! ইহা সরাইয়া লও।' আমি তখন পাত্রটি সরাইলাম। আমি জানিনা যখন আমি ইহা রাখিয়াছিলাম তখন ইহাতে বেশি খাদ্য ছিল না যখন সরাইয়াছিলাম তখন বেশি ছিল।" [বোখারী-মোসলেম]

২২। হযরত জাবের হইতে বর্ণিত ঃ

"এক যুদ্ধে আমি হযরতের সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন এক পরিশ্রান্ত উটের পিঠে ছিলেন। উটটির আর চলার ক্ষমতা ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন- 'তোমার উটের কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'ইহা পরিশ্রান্ত হইয়াছে।' হযরত তখন পিছনে গিয়া ইহাকে ধাক্কা দিয়া দোয়া করিলে। তারপর ইহা অন্যান্য উটের সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল। তিনি আমাকে বলিলেন,—'তোমার উটকে তুমি এখন কিরূপ দেখিতেছ?' আমি বলিলাম,—'আপনার দোয়ার বরকতে ইহা এখন দ্রুতগামী চলিতেছে।' হযরত তখন বলিলেন, 'এক ওকিয়া মূল্যে কি তুমি ইহাকে বিক্রয় করিবে?' আমি এই শর্তে উহা বিক্রয় করিলাম যে মদিনা পর্যন্ত আমি ইহার পিঠে চড়িয়া যাইব। যখন রসুলে করিম (দঃ) মদিনাতে পৌঁছিলেন, তখন আমি উটটি লইয়া তাঁহার নিকট আসিলাম। হযরত ইহার মূল্য দিলেন এবং ইহা আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।" [বোখারী -মোসলেম]

২৩। হযরত আলী হ'তে বর্ণিত ঃ [তিরমিজী]

"আমি রসুলুল্লাহর (দঃ) সহিত মক্কাতে ছিলাম। আমরা তাহার একপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কোন পর্বত বা বৃক্ষের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই যাহা না বলিয়াছিল- 'তোমার ওপর সালাম, হে আল্লাহর রসুল।' (আচ্ছালামো আলায়কুম ইয়া রসুলুল্লাহ-পাঠকবৃন্দ অন্তত একবার পড়ুন)

২৪। হযরত আবু মূসা হ'তে বর্ণিত ঃ

"আবু তালেব সিরিয়াতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। কোরেশদের সম্ভ্রান্ত কয়েকজন লোকের সঙ্গে হযরতও ছিলেন। যখন তাহারা একজন সন্ন্যাসীর নিকট অবতরণ করিল এবং সমস্ত জিনিসপত্র নামাইল তখন সন্ন্যাসী তাহাদের নিকট আসিল। ইতিপূর্বে যদিও তাহারা এ সন্ন্যাসীর নিকট দিয়া যাইত কিন্তু তবুও সন্ন্যাসী তাহাদের নিকট কোনদিন আসে নাই। যখন লোকজন জিনিসপত্র নামাইতেছিল তখন সন্ন্যাসী তাহাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করিল। তারপর সে হযরতের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিল এবং বলিল-'ইনি দুনিয়ার ভিতর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক। ইনি বিশ্ব প্রভুর রসুল। আল্লাহ তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলস্বরূপ পাঠাইয়াছেন।'

কোরেশদের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–তোমাকে কে এই সংবাদ দিল। যখন তোমরা উপত্যকা হইতে নামিয়া আসিতেছিলে তখন দেখিলাম এমন কোন বৃক্ষ বা পাথর নাই যাহা সেজদায় পড়িয়া যায় নাই এবং তাহারা নবী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য সেজদা দেয় না। আমি তাহাকে এজন্যও চিনিতে পারিলাম যে তাঁহার কাঁধের মাংসপিণ্ডের নিচে আতাফলের ন্যায় নবুয়তের চিহ্ন আছে। তারপর সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের জন্য খাদ্য তৈয়ার করিল। তাহাদের নিকট খাদ্য লইয়া যখন সে আসিল তখন বলিল, তাহাকে পাঠাও যিনি মেষ পালক ছিলেন। যখন তিনি (হযরত) আসিতেছিলেন তখন একখণ্ড মেঘ তাহার ওপর ছায়া দিতেছিল। এরপর যখন তিনি লোকজনের নিকট আসিলেন তখন একটা বৃক্ষের ছায়াতলে তাহাকে দেখিলেন। যখন তিনি (হযরত) বসিলেন বৃক্ষ তাঁহার জন্য এক পার্শ্বে ছায়া দান করিল। সন্ন্যাসী বলিল-বৃক্ষের ছায়া তাহার জন্য এক পার্শ্বে চলিয়া যাইতেছে–লক্ষ্য কর। তারপর সে বলিল–আমি তোমার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনাদের ভিতর কে তাহার অভিভাবক? তাহারা বলিল, 'আবুতালেব'। সে হযরতের সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব তাহাকে বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। আবুবকর ও বেলালকেও তাহার সঙ্গে পাঠাইল। সন্ন্যাসী তাহাকে পিঠা ও তৈল ভক্ষণ করিতে দিল। (তিরমিজী)।

২৫। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"মেরাজের রাত্রিতে 'বোরাককে' লাগাম ও জ্বিন দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া হযরতের নিকট আনা হইল। কিন্তু তিনি সহজে ইহার ওপর চড়িতে পারিলেন না। (বোরাক খুব ভয় পাইতেছিলেন)। তখন জিব্রাইল ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন মুহাম্মদের সঙ্গে এরূপ করিতেছ? আল্লাহর নিকট তাঁহার চাইতে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আর কোন ব্যক্তি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে নাই। তারপর দেখা গেল বোরাকের শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইতেছে।" (তিরমিজী)।

২৬। হযরত এবনে–আব্বাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"একজন বেদুঈন আরব হযরতের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমি কিরূপে চিনিতে পারিব যে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল?' হযরত বলিলেন, যখন আমি এই খেজুর গাছ হইতে এই খেজুরকে ডাকি এবং ইহা সাক্ষি দেয় যে আমি আল্লাহর রসুল।' তারপর হযরত একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া ডাকা মাত্র ইহা খেজুর গাছ হইতে হযরতের নিকট আসিয়া পড়িল। খেজুরটিকে চলিয়া যাইবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহা গাছের ওপর চলিয়া গেল। আরব লোকটি ইহা দেখিয়া বিশ্বাস করিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল।" (তিরমিজী)

২৭। হযরত আবুল আলা হ'তে বর্ণিত আছে ঃ

"ছামোরাহ-বিন জুনদব বলিয়াছে, আমরা হযরতের সঙ্গে ছিলাম এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর পর খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিলাম–দশজন উঠিল দশজন বসিল এইরূপে। আমরা রসুলকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম –'কে সাহায্য করিতেছে?' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করিতেছ? উপরে হাত দিয়া দেখালেন– "ঐ স্থান ব্যতীত কেহই সাহায্য করে না।"

(তিরমিজী)

২৮। হযরত আব্দুল্লাহ-বিন-আমর হ'তে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) ৩১৫ জন সাহাবী লইয়া বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং আল্লাহর নিকট হাত তুলিয়া মোনাজাত করিলেন।

'হে আল্লাহ! তাহারা পদাতিক। তুমি তাহাদিগকে চালাও। হে আল্লাহ্! তাহারা একরূপ উলঙ্গ–তুমি তাহাদিগকে বস্ত্র দাও। তাহারা ক্ষুধার্ত–তুমি তাহাদিগকে খাদ্য দাও।'

আল্লাহ তাহাদিগকে জয়ী করিলেন এবং তাহাদের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না যে একটি বা দুইটি উট না লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এছাড়া খাদ্য ও বস্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছিল। (আবু দাউদ)

২৯। হযরত জাবের হইতে বর্ণিত আছে ঃ

খাইবারের অধিবাসীণী এক ইহুদি নারী ছাগলের মাংস পাক করিয়া ইহার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিল এবং হযরতকে খাইতে দিল। হযরত রাঙের মাংস হইতে এক খণ্ড খাইতেছিলেন। অন্যান্য লোকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের বলিলেন, খাইও না হাত উঠাও।' এরপর সেই ইহুদি রমণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ইহার সঙ্গে বিষ মিশাইয়াছ?' সে বলিল, 'কে আপনাকে এ সংবাদ দিল?' হযরত বলিলেন, 'আমার হাত এ সংবাদ দিয়াছে।' রমণীটি স্বীকার করিয়া বলিল, 'হ্যা'–আপনি যদি আল্লাহর নবী হন আপনাকে ইহা অনিষ্ট করিতে পারিবে না আর যদি নবী না হন তবে আপনার নিকট হইতে আমরা নিরাপদ হইব।' রসুলুল্লাহ (দঃ) রমণীটিকে কোন শাস্তি না দিয়াই ক্ষমা করিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত লোক ঐ মাংস খাইয়াছিল তাহারা মারা গেল।' [আবু দাউদ]

৩০। হযরত আবু হোরাইরা হ'তে বর্ণিত ঃ

আমি কিছু খেজুর লইয়া রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, 'হে আল্লাহর রসুল! ইহার বরকতের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। হযরত বলিলেন, খেজুরগুলি একটি শস্যের থলিয়ার ভিতর রাখ। যখনই তুমি খাইতে ইচ্ছা কর তোমার হাত ইহার মধ্যে দিবে এবং বাহির করিয়া আনিবে কিন্তু ইহা বিছাইয়া দিও না। আমরা এত এত ওয়াছাক আমার নামে ঐ খেজুর গ্রহণ করিয়া নিজে খাইতাম এবং অন্যান্যদের খাওয়াইতাম। থলিয়াটি আমার কোমর হইতে পৃথক করিয়া রাখি নাই হযরত ওসমানের হত্যার দিনে ইহাকে পৃথক করা হইয়াছিল।' [তিরমিজী]

৩১। হযরত মা'ন-বিন-আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত ঃ–

'আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি-আমি মসরুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে রাত্রিতে জ্বেনগণ কোরআন শুনিয়াছিল তাহাদের সংবাদ রসুলুল্লাহকে কে বলিল! সে বিলল, 'তোমার পিতা আব্দুল্লাহ -বিন-মসউদ আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন–একটি বৃক্ষ তাহাদের আগমন সংবাদ দিয়াছে।'

[বোখারী–মোসলেম]

৩২। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমরা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে হযরত ওমরের সঙ্গে ছিলাম। আমরা নূতন চাঁদ দেখিতে চেষ্টা করিলাম। আমার দৃষ্টিশক্তি তীব্র ছিল·তাই আমি উহা দেখিলাম। আমি ছাড়া অন্য কেহই দেখিতে পায় নাই। আমি হযরত ওমরকে বলিলাম, 'আপনি কি উহা দেখেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই?' ওমর বলিলেন, আমি শীঘ্রই ইহা দেখিব। ইহা আমার শয্যাতে শয়ন করিবে। তারপর তিনি বদর যুদ্ধে শহিদদের সম্বন্ধে বলিতে লগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) গতকল্য বদরে কাফেরদের ভিতরে যাহারা নিতহ হইয়াছিল তাহাদের স্থান দেখাইয়া বলিতে ছিলেন–আল্লাহর ইচ্ছায় আগামীকল্য এই স্থানে অমুক নিহত হইবে। ওমর বলিলেন, 'যিনি তাহাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ, হযরত যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সেই স্থানচ্যুত হয় নাই। তাহাদিগকে একটি কুয়ার ভিতর একজনের ওপর আর একজনকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে অমুকের পুত্র অমুক। যাহা আল্লাহ এবং তাহার নবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা সত্য পাইয়াছ? আল্লাহ আমাকে যাহা ওয়াদা করিয়াছেন, আমি কি তাহা সত্য পাইয়াছি? হযরত ওমর বলিলেন, 'হে আল্লাহর রসুল! যে দেহে জীবন নাই তাহা কিরূপে কথা বলিবে।" হযরত বলিলেন,

"আমি যাহা বলি তোমরা তাহা ঐ কবরবাসীদের চাইতে বেশি শুনিতে পাও না–তবে আমার নিকট তাহাদের উত্তর দেবার ক্ষমতা নাই।"

[মোসলেম ও সহীহ বুখারী]

৩৩। হযরত জাবের হ'তে বর্ণিত ঃ

"এক ব্যক্তি খাদ্য ভিক্ষা করিতে রসুলে করিমের নিকট আসিল। তিনি তাহাকে অর্ধেক ওয়াছাক আটা দিলে লোকটি তাহা খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার স্ত্রী ও তাহার অতিথিগণও তাহা খাইতে লাগিল। যখন সে ইহা ওজন করিতে লাগল তখন তাহা বন্ধ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট সে গমন করিলে তিনি বলিলেন–'যদি তুমি তাহা ওজন না করিতে, তুমি তাহা সব সময় খাইতে পারিতে এবং ইহা তোমাদের জন্য বরাবর চলিত।"[মোসলেম]

৩৪। হযরত ইলাহা-বিন-মোররাহ হ'তে বর্ণিত ঃ

"তিনটি বিষয় আমি রসুলে করিম (দঃ)-এর ভিতর দেখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করার সময় আমরা একটি উটের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম। উটটি পানি বহন করিতেছিল। যখন উটটি রসুলুল্লাহকে (দঃ) দেখিল তখন একটি ক্রন্দন শব্দ করিয়া ইহার বোঝাটি নামাইয়া দিল হযরত তখন উটটির নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–'এই উটের মালিক কোথায়?' মালিক আসিলে তাহাকে তিনি বলিলেন– 'আমার নিকট ইহা বিক্রয় কর।' সে বলিল, 'হে আল্লাহর রসুল! ইহা আপনাকে বরং দান করিয়া দিতেছি। এই উটটি ছাড়া অন্য কিছু আমার ঘরে নাই।' হযরত বলিলেন, 'যখন তুমি এইরূপ বলিলে তখন আমি ইহা ক্রয় করিব না–তবে উটটি আমার কাছে ইহার অধিক পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত খাদ্যের অভিযোগ করিয়াছে।'

তারপর আমরা সফর করিতে করিতে একস্থানে নামিলাম। হযরত ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটি বৃক্ষ তখন মাটি ভেদ করিয়া হযরতকে ছায়া দিতে লাগিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘুম হইতে উঠিবার পর গাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই কথা যখন আমি তাঁহাকে ঘুম হইতে উঠিবার পর বলিলাম–তিনি বলিলেন, এই গাছটি ইশ্বর প্রভুর অনুমতি লইয়া আল্লাহর রসুলকে সালাম দিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি ইহাকে অনুমতি দিলেন।

আমরা এক জলাশয়ের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম। একজন স্ত্রীলোক তাহার জ্বিনগ্রস্ত এক ছেলে লইয়া তাহার নিকট আসিল। হযরত তাহার নাক ধরিয়া বলিলেন–'যাও, কেননা আমি আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ। তারপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। যখন আমরা ফিরিলাম– তখন ঐ জলাশয়ের পার্শ্ব দিয়ে গেলাম। হযরত ঐ বালকটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীলোকটি বলিল-যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন তাহার কৃপায় আমি বালকের মধ্যে আর সন্দেহজনক কিছু পাই নাই।" [শরহি সুন্নত]

৩৫। হযরত ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"একজন স্ত্রীলোক তাহার পুত্রকে হযরতের নিকট আনিয়া বলিল– 'হে আল্লাহর রসুল! আমার পুত্রকে জ্বিনে আছর করিয়াছে এবং সকালে-বিকালে খাবার সময় ইহা আছর করে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার বুকের পর হাত বুলাইয়া দোয়া করিলেন। সে তখন বমি করিল এবং কাল কুকুরের ন্যায় কি যেন তাহার পেট হইতে বাহির হইয়া গেল।" [দারিমী]

৩৬। হযরত আনাস হ'তে বর্ণিত ঃ

"যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের অত্যাচারের ফলে ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত কলেবরে বসিয়াছিলেন তখন জিব্রাইল আসিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে আমরা আপনাকে মোজেজা দেখাইব? রসুলুল্লাহ বলিলেন, 'হাঁ'। জিব্রাইল তাঁহার পিছনের একটি বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া বিলেন, 'ইহাকে ডাকুন।' হযরত বৃক্ষটিকে ডাক দিলে ইহা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিব্রাইল বলিলেন, 'ইহাকে ফিরিয়া যাইতে বলুন।' হযরত ইহাকে আদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন–ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার আমার পক্ষে যথেষ্ট।" [দারিমী]

৩৭। এবনে ওমর হ'তে বর্ণিত ঃ

"আমরা রসুলুল্লাহর সহিত সফরে ছিলাম। একজন মরুবাসী আরব অগ্রসর হইয়া আমাদের নিকট আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কি বলিবে–আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই, তাহার কোন শরিক নাই এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসুল।' লোকটি বলিল, 'আপনি যাহা বলেন তাহা কে সাক্ষ্য দিবে?' হযরত বলিলেন–এই বৃক্ষ। তারপর হযরত উপত্যকার পার্শ্বে থাকা অবস্থায় বৃক্ষকে ডাকিলে ইহা মাটি ভেদ করিয়া রসুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি তিনবার ইহাকে সাক্ষ্য দিতে বলিলেন—বৃক্ষটি তিনবার এই সাক্ষ্য দিয়া ইহার পূর্বের স্থানে চলিয়া গেল।" [দারিমী]

৩৮। হযরত আবু হোরাইরা হ'তে বর্ণিত ঃ

"একটি নেকড়ে বাঘ ছাগলের পাল হইতে একটি ছাগল ধরিল। রাখাল ইহা বাঘটির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল, বাঘটি তখন একটি উচ্চস্থানে উঠিল এবং এক জায়গায় বসিয়া নিচে রাখালের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আল্লাহ আমার জন্য যে রিজিক দিয়েছিলেন সেটাই আমি লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি তাহা কাড়িয়া লইলে।' রাখালটি বলিল, 'বড়ই আশ্চর্য! হে আল্লাহ! আমি আজকে যাহা দেখিলাম ইতিপূর্বে আর কখন এরূপ বাঘকে কথা বলিতে দেখি নাই।' বাঘটি বলিল, 'ইহা হইতেও আশ্চর্য ঐ ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

যিনি এই দুই গিরিপথের মধ্যবর্তী খেজুর বৃক্ষের ভিতরে আছেন। তিনি পূর্বে কি ঘটিয়াছে তাহা তোমাকে বলিবে এবং তোমার পরে কি ঘটিবে তাহাও তোমাকে বলিবে। রাখালটি একজন ইহুদি ছিল। সে তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট জানাইল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত তাহার কথা সত্য বলিয়া মানিয়া নিলেন এবং বলিলেন, 'মহাপ্রলয়ের পূর্বে আলামত হইবে। শীঘ্রই একটি লোক বাহির হইবে। তাহার স্ত্রী তাহার অনুপস্থিতিতে কি কি কাজ করিয়াছে ইহা তাহার লাঠি ও জুতা বলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত সে ঘরে ফিরিবে না।"

৩৯। হযরত উনাইসা হ'তে বর্ণিত ঃ

"রসুলুল্লাহ (দঃ) একদিন জায়েদকে পীড়িত অবস্থায় দেখিতে যান। তিনি জায়েদকে দেখিয়া বলিলেন, তোমার অসুখের জন্য দুঃখ নাই কিন্তু আমার অবর্তমানে তোমার কি দশা হইবে অন্ধ হইয়া। জায়েদ বলিল–আমি সওয়াবের আশা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া থাকিব। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তখন বলিলেন, তাহা হইলে তুমি বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রসুলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুর পর সে অন্ধ হইয়া গেল। তারপর আল্লাহ তাহার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় দিলে জায়েদের মৃত্যু হইল।" [বয়হাকী]

৪০। হযরত হিজাম-বিন-হিশাম হ'তে বর্ণিতঃ–

যখন হযরতকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিল তখন তিনি মদিনাতে মোহাজের হইয়া আসিলেন। তিনি, আবুবকর, আবুবকরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আমের এবং তাহাদের পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ লাইসি উম্মে মা'বাদের তাঁবুর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহার নিকট হইতে মাংস ও খেজুর ক্রয় করিবার জন্য চাহিলেন। কিন্তু মা'বাদের নিকট তাহারা কিছুই পাইলেন না। লোকজন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁবুর পার্শ্বে একটি ছাগল দেখিয়া 'হে উম্মে মা'বাদ, এই ছাগল কে আনিল?' সে বলিল, 'ইহার দল হইতে ইহাকে দুগ্ধ দোহনের জন্য আনা হইয়াছে।' রসুলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার দুগ্ধ আছে?' সে বলিল–অনেক কষ্টের পর যদি কিছু পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন–'এ থেকে আমাকে দুগ্ধ দোহনের অনুমতি দেওয়া হইবে তো?' বলা হইল–যদি দুধ থাকে তাহলে আপনি দোহন করে নিন। হুজুর (দঃ) বিসমিল্লাহ পড়ে বকরীর স্তনের ওপর হাত রাখতেই স্তন দুধে ভর্তি হয়ে গেল। বড় একটি বর্তনী ভর্তি করে দুধ দোহন করা হল। প্রথমে এ দুধ উম্মে মা'বদকে পান করানো হলো। এরপর সঙ্গী-সাথী যারা ছিল আট-দশ ব্যক্তি পূর্ণ তৃপ্তিতে এ দুধ পান করল। এবং সবশেষে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও পান করলেন। পুনরায় বর্তনী ভর্তি করে দুধ দোহন করে ঐ ছাগীর মালিকা উম্মে মা'বদকে দান করলেন। সে এ দানে খুশি হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। বিকেলে তার স্বামী আবু মা'বুদ বাড়ি ফিরে এসে এসব ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় এবং রসুল (দঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর হাত ধরে মুসলমান হয়। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মদিনায় প্রস্থান করে।"

[সংগৃহীত–মেশকাত ও বিশ্বনবী ও তার সার্বজনীন আদর্শ–সম্পাদনায় মুহাম্মদ হারুন–জমিল মাদ্রাসা, বগুড়া]

হযরতের মোজেজার সংখ্যা কত ছিল তা কেউ বলতে পারবে না সঠিকভাবে। তবে

বিভিন্ন সূত্র হতে এ যাবৎ যা বিভিন্ন গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা সাত হাজার সাতশ'। বিভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে পাঠকবৃন্দের সম্মুখে মাত্র কয়েকটি 'মোজেজা' তুলে ধরলাম। অদৃশ্য বিজ্ঞানের এ একটি বাস্তব নিদর্শন যা রসুল (দঃ) মানব সম্প্রদায়কে দেখিয়েছেন। চিন্তাশীল পাঠক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সবাই এ ঘটনাসমূহ বিচার ক'রে বলতে বাধ্য হবেন সর্বগুণে গুণান্বিত এ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)–যিনি সৃষ্টিকুলের সেরা, জগদ্গুরু, নবী সম্রাট, প্রশংসিত প্রশংসাকারী আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা, বিশ্ব জাহানের অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক তাঁর ওপর রইল আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং প্রাণের নিগূঢ় স্থান হতে উচ্চারিত বাণী।

'ইয়া নবী সালাম আলায়কা।
ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা।
ইয়া রসুল সালাম আলায়কা।
সালম তুল্যা আলায়কা।'

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের অদৃশ্য বিজ্ঞান–৪র্থ খণ্ড এখানেই শেষ করলাম। অনেক ভুল-ক্রটি হয়েছে এজন্য সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী বই লেখার জন্য সবার দোয়া একান্তভাবে কামনা করি। খোদা হাফেজ।

পরিশিষ্ট

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) সিরিজ (১ম হতে ৪র্থ খণ্ড) লিখে শেষ করলাম। লেখবার মত কোন জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাষা, ভাব আমার ছিল না। অলক্ষ্যে কে যেন সাহস জুটাল, ভাষা দিল, রিসার্চ করার প্রেরণা জোগালো। তাই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনায় যা পেয়েছি তাই গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছি। সফলকাম কতটুকু হয়েছি জানি না। তবু গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে, আনন্দে চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে–এই কথা ভেবে যে আমার কলম সার্থক হয়েছে ঐ একটি নাম লিখতে ও প্রমাণ করতে–**'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)'**। জানি না বিশ্বের কোন লেখক এই টাইটেল দিয়ে আমার নবীজীর পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছেন কি না। যার বাণী অমর, অক্ষয়, চিরঞ্জীব তাঁকে সাধারণ চিন্তাবিদ বলা চলে না। আল্লাহ্ নিজে তাঁর ভাষায় বার বার যেখানে বলেছেন–"আমি তোমাদের জন্য একজন বৈজ্ঞানিক প্রেরণ করছি, সেখানে আমরা অশিক্ষিত নবী বলে তাঁর বৈজ্ঞানিক বাণীসমূহ চাপা রাখতে পারি না। তাঁর বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হবে যতদিন এ বিশ্ব চলে। আমি শুধু পথ দেখালাম। আমার পর জন্মলাভ করুক বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও তত্ত্ববিদ পণ্ডিতসমূহ, যাঁরা যুগ যুগ ধরে এ মহামানবের বাণীসমূহ প্রচার করবেন বিজ্ঞান ও দর্শনের সূত্র দিয়ে।

'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)' পুস্তকের একটি পরিচ্ছদ লিখতে বাকি রইল–**'ধর্ম বিজ্ঞান'**। লিখতে পারব কিনা জানি না। কেননা আষাঢ়ের পাগলা জোয়ার যেমন সারা বছর থাকে না

অল্প কিছুদিন পরই ভাটা পড়ে–তেমনি আমার দেহ-মন ভেঙ্গে গেছে। ভাটা পড়েছে চিন্তায় ও মানসিকতায়। অবশ্য এ বিষয়টির ওপর অনেক সুধী ব্যক্তিই অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন। তাই এ পরিচ্ছেদের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে হাত বাড়িয়েছি লিখতে–**'মুক্তির পথ'** এবং **'বেহেশত-দোজখ'**। জানি না আল্লাহ আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করবেন কি না। সবার দোয়া প্রার্থী।

আমার দায়িত্ব ছিল লেখা। প্রচারের দায়িত্ব আমার নয়। এ কথা প্রার্থনার মাঝে প্রায়ই বলে থাকি। তাই আল্লাহ নিজ হাতেই প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর নির্বাচন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠমত প্রকাশক, ধর্মপ্রাণ মনীষী, সুহৃদ বন্ধু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি জনাব আবুল কালাম মল্লিককে 'মালিক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।' তিনি সহৃদয়বান হয়ে আমার ১০ খনা বই যা বাংলাদেশ থেকে প্রায় দু-যুগ ধরে চলে আসছে–প্রকাশ করার অনুমতি নিয়েছেন। ইতিমধ্যে **'বিজ্ঞান না কোরআন?'**–বইটি ভারতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রচারিত হচ্ছে। কত গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে এর মধ্যে পাঠকবৃন্দ চিন্তা করুন। তাঁর মত হৃদয় নিয়ে আপনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ুন বইগুলো হাতে হাতে তুলে দিতে। পুরস্কার হিসাবে ছাত্র-শিক্ষক, কৃতিত্বের অধিকারী, বিবাহিত যুগল সম্প্রদায়কে দিয়ে আপনি ধন্য হোন। পরকালের মহাপুরস্কারে আপনিও পুরস্কৃত হবেন। এটাই আমার কামনা, চাওয়া ও পাওয়া।

দেখুন এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য কি বাণী রেখে গেছে। তিনি বলেছেন ঃ "আমার কথা প্রচার কর লোকদের মধ্যে–উহা একটি বাণীই হউক না কেন। আর যদি বনি ইস্রাইলদের (তৌরাতের ঘটনা) বর্ণনা কর তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যে কেহ আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিবে সে যেন নিজের স্থান অনুসন্ধান করে দোজখে।"[১]

pdf By Syed Mostafa Sakib

টীকা-১ । [আল হাদিস-সহীহ-বখারী-(তজবীদ), তর্জমা-আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ]। হাঃ নং-৯৭/৬৮]